নিরীক্ষা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

—চার টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭নং
ভীম ঘোষ লেন, কলিঃ—৬ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

করকমলে

নিবেদন

নিরীক্ষা কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষভাবে দেখার অভিধা আছে তাহাই এখানকার সব লেখাগুলির সাধারণ ধর্ম। দেখার বিষয়বস্তু একেবারে নির্দিষ্ট নাই,—চোখ মেলিয়া আশপাশে তাকাইয়া দেখা—ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি—দেশ-গাঁ, লোকজন—যাহা চোখে পড়ে। দেখার বিষয়-বস্তুর মধ্যে যেমন কোনও কঠিন নির্দেশ নাই—লেখার ভঙ্গির মধ্যেও তেমনই কোনও বাঁধাধরা রীতি নাই। বিভিন্নকালে বিভিন্ন মেজাজ-মর্জিতে রচিত এই লেখাগুলি—প্রকাশিতও বিচিত্রপ্রকৃতির সাময়িক পত্রে। শুধু 'বাঙলার সংস্কৃতি' লেখাটি মূলতঃ আমার একটি মৌখিক ভাষণ, শ্রীপ্রবোধরাম চক্রবর্তী, এম্, এ কর্তৃক অনুলিখিত—এবং সেই অনুলেখন অবলম্বনে আমাকর্তৃক পুনর্লিখিত।

বইখানি সযত্নে প্রকাশ করিয়া 'মিত্র ও ঘোষে'র শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষ আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, ঠিক অনুরূপভাবে যদি তাঁহারা পাঠক-সাধারণেরও শ্রদ্ধাভাজন এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া উঠিতে পারেন তবেই আমার সন্তোষের পরিপূর্ণতা।

৯৮।৪ রসা রোড, কলিকাতা-২৬
আষাঢ়, ১৩৬২

বিনীত
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

শিব-দর্শনে

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। বক্সা পাহাড়ে চলিয়াছি। বক্সা স্টেশন হইতে পাহাড় পাঁচ মাইল পথ। তিন মাইল পার্বত্যবনপথ, বাকি দুই মাইল খাড়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। স্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই মনে হয়, বহুদিনের অতিপরিচিত সংসারটাকে যেন পিছনে ছাড়িয়া ফেলিয়া আসিলাম। দুই পাশে একটানা পাহাড়ি গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে, কিছুদূর পর্যন্ত ঘন-বিন্যস্ত গাছ, তারপরে অন্ধকার। চারিদিকে একটি নিবিড় স্তব্ধতা, তাহারই উপরে দুপুরের রোদ কেমন ঝিলমিল করিতেছে।

যতদূর চলি কদাচিৎ জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ, যে দু'এক জনের সঙ্গে দেখা হয় তাহারাও পার্বত্য ভুটিয়া। মাঝে মাঝে দু'একটি কাঠবিড়ালের দেখা মেলে, ফোলান পুচ্ছটি উচ্চে নাচাইয়া গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো চোখে পড়ে দু'একটা পার্বত্য পাখী।

পাহাড়ের পথে যখনই আমি চলিয়াছি, ইহার একটা বিশেষ প্রভাব সমগ্র সত্তার উপরে অনুভব করিয়াছি। পরিচিত জগতের দৈনন্দিন জীবনটিকে ঘিরিয়া দেহ-মনের উপর নিরন্তর আবরণ জমা হইতেছে, সে আবরণ ভালতে-মন্দতে সুন্দরে-কুৎসিতে মিলিয়া আমাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই অজানা নির্জন পাহাড়ী পথে দেহ-মনের এই পুঞ্জীভূত আবরণটি কেমন যেন আপনা আপনিই খসিয়া পড়িয়া যায়; এই আবরণের অন্তরাল হইতে আমার যে রূপটি বাহির হইয়া আসে, তাহাই যেন আমার বিশুদ্ধ সত্তা। সেই বিশুদ্ধ সত্তাটিকে এখানে

অতি গভীর করিয়া পাওয়া যায়, চারিদিকে ছড়াইয়া-পড়া আমিটি ঘনসম্বদ্ধ হইয়া একান্ত কাছের এবং একান্ত আপনার হইয়া ওঠে। এখানে যে নিজেকে শুধু গভীর করিয়াই পাওয়া যায় তাহাই নহে, এখানে নিজেকে বড় করিয়া পাওয়া যায়। এখানে চারিদিকে যাহা কিছু সকলই বড়। বড় বড় গাছগুলি বড় বড় শাখা লইয়া একটানা আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে, ছোট ছোট গাছগুলির বড় দুর্দশা, কেমন প্রাণ-মরা এবং মন-মরা হইয়া শীর্ণ এবং রুক্ষ হইয়া গিয়াছে; এখানে লতা যে ক'টি দেখা যায় তাহারা মৃদু হাওয়ায় 'দোদুল-দোলে'র লতা নয়,—বলিষ্ঠ প্রাণশক্তিতে তাহারা বনস্পতিগুলির শাখাবাহু বেষ্টন করিয়া আছে; ফুলগুলি বড় হইয়া ফোটে, বড় বড় পশুপাখী বড় করিয়া ডাকে—ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে ঝিল্লীর রবও অনেক বড় করিয়া কানে আসিয়া পৌঁছায়।

নিজের এই বিশুদ্ধ এবং মহৎ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে বিশ্ব-জীবনের সহিত একটা নিগূঢ় যোগ অতি সহজ হইয়া আসে। এখানে মনে হয়, এই গাছগুলি—এই পশুগুলি—এই পাখীগুলি—এরা যেমন করিয়া পৃথিবীর বুকে এক প্রাণ-দেবতার নিত্যকালের প্রকাশ—আমিও তেমনই। পায়ের নীচে রহিয়াছে যে পৃথিবী তাহার অণুতে-পরমাণুতে লীন হইয়া রহিয়াছে কি অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি! এই অন্তরীক্ষের বাতাস—উর্ধ্বলোক হইতে ক্ষরিত এবং পৃথিবীর বুকে সপ্তরঙে বিচ্ছুরিত আলো-কণিকার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে কি এক মহাপ্রাণ! সেই পাগল প্রাণ-দেবতার এক রুক্ষ ধূসর ক্ষ্যাপাটে মূর্তি এই পাহাড়—এই বনানী।

ধীরে ধীরে পথ চলিতেছি। কোন তাড়া নাই, কারণ পৌঁছনটাই আজ বড় নয়—পথ চলাটাও বেশ। ক্ষণে ক্ষণে প্রখর রোদে মাথা তাপিয়া উঠিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে আবার গাছের ছায়ার শীতল স্পর্শ লাভ

করিতেছি। সঙ্গে কয়েকটি ভুটিয়া সঙ্গী জুটিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে অসুবিধা হইল না কিছুই, কারণ তাহারা চলিতে চলিতে বেশী কথা বলে না। আমাদের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিল, আমরা 'কলকাত্তা কা বাবু', এবং একান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দুইটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কলিকাতায় যথেষ্ট ভাত পাওয়া যায় কি না এবং কলিকাতায় 'স্বদেশী বাবু' আছে কি না। এই দুইটি প্রশ্নেরই গভীর অর্থ আছে। প্রথম প্রশ্নের তাৎপর্য এই—এই সকল ভুটিয়ারা এই সকল পাহাড়ী দেশে এখন পর্যন্তও আদিম বন্যজীবনই যাপন করিতেছে ; এখনও এখানকার আশেপাশের কোন বড় পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া থাকিলে মনে হইবে, পাহাড়ের ঐ উচ্চদেশে গাছপালা এবং পশুপাখী ব্যতীত আর কিছুই নাই ; কিন্তু হঠাৎ হয়ত চোখে পড়িবে, অনেক উচ্চদেশে পাহাড়ের গায়ে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটি অস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাগিয়া উঠিতেছে,—তখন বুঝিতে হইবে, ওখানে নিশ্চয়ই একটি ভুটিয়া পরিবারের আস্তানা আছে। এই সব পাহাড়ের দুর্গম জুলিপথে গাছপালার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ যখন একটি অর্ধাবৃত বা পশুচর্মাবৃত ভুটিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন মনে কেমন একটা বিস্ময় জন্মে ; মনে হয় এখানে এই সময়ে একটি বাঘ-ভালুকের সহিতও দেখা হইতে পারিত বা অন্য কোন জীবজন্তুর সহিতও দেখা হইতে পারিত। এখনও শিকার-লব্ধ পশু-পাখীর কাঁচা-পোড়া মাংস তাহাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু বক্সা পাহাড়ে সরকারী এবং বে-সরকারী নানা প্রকারের জনবসতি স্থাপিত হইবার পর হইতে ইহাদের সংস্পর্শে ভুটিয়ারা ভাত খাইতে শিখিয়াছে। পাহাড়ে তাহারা চাউল সহজে পায় না ; নিজেরাও পাহাড়ে জন্মাইয়া লইতে পারে না,—অতএব লোকালয় হইতে এই দুর্লভ বস্তুটিকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। তাহাদের আদিম অভাবহীন জীবনে এই নূতন অভাবটি বেশ তীব্র

হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং জীবন-ধারণের উপজীব্য হিসাবে এই বস্তুটি সম্বন্ধে তাহারাও বেশ সচেতন এবং কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির তাৎপর্য এই, ব্রিটিশ সরকারের ব্যবস্থায় কারাগারে নির্বাসিত 'স্বদেশী বাবু'র প্রাচুর্যই বক্সা পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য; অন্ততঃ একটি নবগঠিত শহরের এই বিশেষ ধর্মটিই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সমধিক, তাই এই নাগরিক বৈশিষ্ট্যটি সর্বনগরেই বিরাজমান কি না এ-সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল অতি স্বাভাবিক।

এতক্ষণে দূরে পাহাড় চোখে পড়িল। কখনও গাছপালায় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে, কখনও স্পষ্ট চোখে পড়িতেছে। শুনিলাম, আর খানিক দূর আগাইয়া গেলেই 'সান্তারাবাড়ি'—সেখান হইতে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিতে হইবে। সহসা পাহাড়ের গায়ে এবং উপরে দু'একখানা মেঘ দেখা দিল, আরও কয়েকখানি। চলিতে চলিতে পাহাড় আবার বনের আড়ালে ঢাকা পড়িল। কিন্তু আস্তে আস্তে চারিদিক কেমন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, দু'একবার যেন গুড়্ গুড়্ আওয়াজ কানে গেল। হাঁটিবার বেগ বাড়াইয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বেগও যেন বাড়িয়া গেল। সহসা যেন বজ্রগম্ভীর স্বর শুনিলাম; সে স্বর আকাশ হইতে মনে হইল না; মনে হইল এ-স্বর এই বনের। ছেলেবেলা শুনিয়াছি, পর্বতে পার্বত্য দেবতা শিবের বাস; তাঁহার বাসভূমির বহির্দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ভূতগণকে বজ্রনির্ঘোষ রবে জানায় তাঁহার শাসন, সর্ববিধ চপলতা হইতে অরণ্যবাসিগণকে করে সাবধান। একি সেই নন্দীর নির্দেশ?

বজ্রধ্বনি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আকাশে বাতাসে এতক্ষণে একটা প্রকাণ্ড শোঁ শোঁ রবের আলোড়ন জাগিয়াছে। বনের ফাঁক দিয়া আবার পাহাড় চোখে পড়িল। এতক্ষণে কালো কালো মেঘগুলি জটার মতন পাহাড়ের উচ্চ শিখরটিকে জড়াইয়া ধরিতেছে, বাতাসের

আলোড়নে সেগুলি যেন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইতেছে, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত তরুরাজিতে কাহার যেন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে,—আরক্ত অপাঙ্গ হইতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে, শোঁ শোঁ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে একটা ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস। সত্যই কি পাহাড়ে ভৈরব-দেবতা মহাদেবের বাস ?

এতক্ষণে বৃষ্টি নামিয়া গিয়াছে। দৌড়াইয়া গিয়া সান্তারাবাড়ি পৌঁছিলাম। সেখানে পাহাড়ে উঠিবার পথে একটি সশস্ত্র রক্ষীদের আড্ডা—আর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তিন চারিটি ভুটিয়া পরিবারের বাস। ঘরগুলি কাঠের, এবং নীচের মাটি হইতে বেশ খানিকটা উঁচুতে, কাঠের পাটাতনের মেঝে। বন্য পশুর ভয়েই ঘরগুলি এইরূপ। বিশেষ করিয়া বন্য হাতীগুলি নাকি যখন-তখন আসিয়া আগে বেশ উপদ্রব করিত। কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া পাটাতনে উঠিতে হয়।

আমরা দৌড়াইয়া যে ঘরখানির বারান্দায় গিয়া আশ্রয় লইলাম তাহার ভিতরে একটি মাত্র প্রৌঢ়া ভুটিয়া-রমণীকে দেখিতে পাইলাম। কিছুদিন আগে তাহার স্বামী মারা গিয়াছে ; সন্তান নাই, তাই একাই আছে। আর কোথায় কে আছে জানিবার বা বুঝিবার সুযোগ পাইলাম না। সঙ্গের ভুটিয়ারা দু'একখানি ছাড়া-ঘরে গিয়া দৌড়াইয়া আশ্রয় লইল।

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ নাই। আকাশের অবস্থা ক্রমেই ভারী হইয়া উঠিতেছে,—এত কালো ভার আর বহন করিবার তাহার শক্তি নাই,—তাই প্রবলধারে অজস্রভাবে ভাঙিয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেখিতে দেখিতে বর্ষণমুখর সমস্ত নির্জন অন্ধকার দেহ-মনকে ঘিরিয়া ফেলিল, একটু একটু করিয়া পৃথিবীর অন্যসব রূপ যেন ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম,

এই এক অজ্ঞেয় মূর্তিতেই যেন তাহাকে চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি—এই এক ভীষণা শ্যামা মূর্তিতে!

বর্ষা একেবারে আর থামিল না, তবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাতাসের বেগটা যেন আস্তে আস্তে কমিয়া আসিল, ধারার বেগও কমিল। ঘর হইতে বাহিরে নামিলাম; দেখিলাম ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভুটিয়ারা কোথা হইতে কলাপাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে এবং পাহাড়ে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহসে ভর করিয়া তাহাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রথমে ছোট্ট একটি পুল পার হইয়া খাড়া পাহাড়ের পথ ধরিলাম। খানিক দূর অগ্রসর হইবার ভিতরে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তবু ভুটিয়াদের সঙ্গে পথ চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তবে একটা গভীর এবং অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা কেমন ছম ছম করিতেছে। চলিতে চলিতে দেখিলাম, মাঝে মাঝে এক একটি শিলাখণ্ড শিখরের আকৃতিতে অনেক উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে; খানিকটা অংশ ধ্বসিয়া যাওয়ায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; নীচে কতদূরে যে কি তাহা দেখিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। এগুলিকে এমন খাড়া খাড়া করিয়া এখানে সেখানে কে পুঁতিয়া রাখিয়াছে! উল্টিয়া পড়িয়া কখন কি সর্বনাশ ঘটাইবে কে জানে? ধূসর বিভূতি-ভূষণ ভৈরব দেবতার এইগুলিই কি ত্রিশূল? এক প্রহরের অবিরল বর্ষার ফলে পাহাড়ের গুহায় গুহায়—ফাঁকে ফাঁকে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে—আর চারিদিক হইতে শতভঙ্গিতে তাহার পতনধ্বনি সমগ্র পর্বতটিকে গম্ভীর মন্দ্রে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও সঙ্কীর্ণ গুহাপথে বেগে ধাবিত উপল-ব্যাহত জলরাশির তাণ্ডব-নৃত্য—গম্ভীর ববম্‌-ধ্বনি, কোথাও পর্বতগাত্রে উচ্ছিয়মান জলরাশির বিচিত্র ডমরুনাদ। ভৈরবের সন্ধ্যারতিতে কি পর্বতদেশ এমন করিয়াই শব্দায়মান হইয়া ওঠে?

সন্ধ্যার পরে পাহাড়ের লোকালয়ে পৌঁছিলাম। বিছানাপত্র একটি ভুটিয়া কুলিদ্বারা পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, দেখিলাম সবই ভিজিয়া গিয়াছে, গায়ের কাপড় জামাও ভিজা। পাহাড়ে সেদিন শীত বেশ কন্‌কনে। কিন্তু সহৃদয় অতিথির দাক্ষিণ্যে সহজেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইলাম, একটা ঘন অন্ধকার এবং অজ্ঞাত রহস্যের আচ্ছন্নতার ভিতরেই রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। 'স্বদেশীবাবু'দের বাসঘরগুলি পরিত্যক্ত রহিয়াছে। এই 'স্বদেশীবাবু'দের জন্য পাহাড় কাটিয়াই একটা খেলার মাঠ তৈয়ারী করা হইয়াছে (ইহা 'স্বদেশী-বাবু'দের আমলের পূর্বের কিনা আমার সঠিক জানা নাই), সেই খেলার মাঠের পাশে বসিয়া আছি, কিছু দূরে উত্তরে একটি সমুন্নত গিরিশিখর। চারিদিক জুড়িয়া এই প্রভাতে কি গভীর প্রশান্তি—কি প্রসন্নতা! উত্তরের সেই সমুন্নতশির গিরিরাজ আজ ধ্যানস্থ যোগিবর। ধূসর-বিভূতি-ভূষণ যোগক্লিষ্ট কঠোর দেহখানি ঘিরিয়া কি গম্ভীর মহিমা! যোগাসনে বদ্ধদেহ স্থির অচঞ্চল,—'অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'! অনেকক্ষণ বসিয়া দেখিলাম—অপলকভাবে নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া দেখিলাম—নিজের শ্বাসের শব্দকেও সংহত করিয়া লইলাম।

কতক্ষণ পরে চোখ ফিরাইলাম সেই গিরিশিখরের নিম্নদেশে; আশ্চর্য! নিম্নভাগে দক্ষিণপাশে রহিয়াছে কেমন শ্যামল মাঠ। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই হঠাৎ দেখিলাম, পাহাড়ের কোন্ ফাঁক দিয়া প্রভাত-সূর্যের খানিকটা আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেই মাঠের উপরে। এইবার স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম; যোগিবর ধ্যানস্থ মহাদেবের পাদদেশে মা পার্বতীর হাসি। পৌরুষ ধূসর শিবের সম্মুখে প্রাতঃস্নাতা গৌরবর্ণা পার্বতীর সেকি অপরূপ রূপ! যাহাকে কাল ঝড়ের অন্ধকার

সন্ধ্যায় ভৈরবী কালী মূর্তিতে দেখিয়াছিলাম, এই ত সেই মায়ের কাঞ্চন-বিভা! একদিকে আত্মস্থ জ্ঞানমাত্রতনু নিশ্চল নির্বিকার মহাদেব—আর একদিকে জীবধাত্রী অন্নপূর্ণা গৌরী। কতশক্তি অন্তর্লীন এই গৌরী-দেহে—নিত্য তাহার প্রকাশ অন্নে ও প্রাণে!

আবার চোখ ফিরাইলাম গিরি-শিখরে। দেখিলাম, এতক্ষণে কোথা হইতে একখানি শুভ্র বঙ্কিম মেঘ ভাসিয়া আসিয়াছে, আস্তে আস্তে সে গিরির চূড়া-সংলগ্ন হইল। এইবারে বুঝিলাম, শিবের চূড়ায় চন্দ্রকলা! হ্যাঁ—এই দেবতাই ত 'চন্দ্রশেখর',—এই দেবতাই ত বিভূতি-ভূষণ 'যোগীশ্বর'!

অথাতঃ কুলি-জিজ্ঞাসা

'অথ' শব্দ এখানে বিস্ময়ার্থে প্রযুক্ত। বিস্ময়ের কারণ দেখা—নিরাসক্তভাবে দেখা—অর্থাৎ দেখার আনন্দেই দেখা। দ্রষ্টা কখনও ভোক্তা হয় না, তাই এ দেখার পর্যবসান শুধু একটা চিত্তের ভারহীন বিস্ময়ে ; সেই বিস্ময়ের আবার পর্যবসান একটা আত্ম-রতির উদ্বোধে—তাহার পরিণতি ঈষৎ আনন্দে। সেইটুকুরও প্রয়োজন দেখা যায় বহুবার মানুষের জীবনে, 'অতঃ' কথাটির ইঙ্গিত সেই দিকে।

বিষয়ালম্বন এখানে কুলি, যাহারা সাধারণতঃ মোট বহে—মাথায় করিয়া, ঘাড়ে করিয়া, হাতে করিয়া,—রেলওয়ে বা ষ্টিমার স্টেশনে—পথে-ঘাটে—হাটে-বাজারে। 'জিজ্ঞাসা' এখানে চরিত্রালোচন অর্থে—আলোচন এখানে 'ঈষৎ দর্শন' অর্থ বহন করিতেছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এত পদার্থ ছাড়িয়া আমার এই কুলি-জিজ্ঞাসার মূলে আমার আশৈশব একটা প্রবল দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা। কি কারণে জানি না, আমার দেশভ্রমণের ইচ্ছার সঙ্গে কুলি-চরিত্রের একটা গভীর ভাবানুষঙ্গ আমি মনের ভিতরে সর্বদাই লক্ষ্য করি। এক্ষেত্রে প্রথমে মনে ভাসিয়া ওঠে বিশেষ একটি স্থানের কথা, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরে আসে একটা দীর্ঘ গতি। কিন্তু সে গতি একটানা নয়, মাঝে মাঝে কেমন একটি ছেদ, সেই ছেদের ফাঁকে ফাঁকে রেলিং-ঘেরা শানে-বাঁধান বা লাল-কাঁকর-বিছান কতগুলি স্থান—তাহার ভিতরে ছেঁড়া লাল, নীল বা কালো কুর্তিগায়ে হাক-ডাক ছাড়িয়া কিল-বিল করিতে থাকে অস্পষ্ট কতগুলি ছায়া-মূর্তি। ইহাদিগকে ভালবাসি কি ভয় করি, সে কথা আজও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না, তবে এইটুকু সত্য যে, বেড়াইতে

যেমন ভাল লাগে, মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া ইহাদিগকে দেখিতেও তেমনই ভাল লাগে।

তবে এ-বিষয়ে আমার নিজের একটা সহজাত দুর্বলতা আমি অনেক-দিন পূর্ব হইতেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলাম। কুলি-চরিত্র বিষয়ে আমি সর্বদাই একটু বেশী মাত্রায় রোম্যান্টিক—অর্থাৎ বেশ খানিকটা দূর হইতেই দেখিতে ভাল লাগে, তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সর্বদাই এড়াইয়া চলিয়াছি। ভ্রমণ বিষয়ে আমি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-নিরপেক্ষভাবে কম্বল-লোটা-কৌপীনধারিগণের দলভুক্ত। অনেক লোককে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, দেখিয়া মনে হইয়াছে যেন চলন্ত সংসার। রাশীকৃত লট্‌পট্‌ লইয়া এমনই আঁটসাট বাঁধিয়া চলিয়াছেন যে তাঁহার গৃহবাস এবং শকটবাসের ভিতরে কোথাও কোন পার্থক্য নাই। পথ-যাত্রার এই আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া নিজেও অনেক সময়ে লুব্ধ হইয়াছি এবং বারান্তরের জন্য অনেক কিছু কল্পনা করিয়া বেশ একটা অগ্রিম আনন্দও লাভ করিয়াছি। কিন্তু সহসা যখন এই প্রত্যেকটি লট-পটের পিছন হইতে একটি একটি করিয়া দন্তবিকশিত বা ভ্রূকুঞ্চিত ছায়ামূর্তি আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত এবং দেবতার চতুষ্পার্শ্বস্থ অসংখ্য উপদেবতার ন্যায় প্রচুর 'বাং-চিং', দর-দস্তুর এবং খবরদারীর ঝামেলা আমার চারিদিকে ভিড় করিতে থাকিত, তখন আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের লঘু বাষ্প নিমেষে কোথায় উবিয়া যাইত এবং আমার সমস্ত দেহমনে একটা শির্ শির্ শীতকম্প-করা জরজ্বর ভাব অনুভব করিতাম। এই জন্যে আমার আদর্শ ভ্রমণ হইল একেবারে নিরুপাধি ভ্রমণ। এই নিরুপাধিত্বের ক্ষতি-পূরণ অনেক নাকের জলে চোখের জলে দিতে হইয়াছে, ঘরে পরে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কোথাও হন্তদন্ত হইয়া মরিয়া আধখানা হইয়া পৌঁছিয়াই আবার মায় চণ্ডীপাঠ ইস্তক জুতা সেলাই সকলই নিজেকে সমাধা করিতে হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে

আবার "চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে" ঠিক সেইভাবেই নীরবে মুখ বুঁজিয়া থাকিতে হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি মোটের উপরে আমার ঝোঁক ছিল মোট-বর্জন—অপারগ পক্ষে মোট-সঙ্কোচনের দিকে।

ইহার কারণরূপে একটু পূর্ব ইতিহাসও যে একেবারে না ছিল এমন নহে। শুধু দু' একটি নমুনা বলিতেছি। দেড় দিনের পথ অতিক্রম করিয়া একবার হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌছি। গাড়ীতে অকথ্য ভিড়, সুতরাং অনাহার এবং অনিদ্রা। তাহাতে আবার মদ্‌বিধ জীবের পক্ষে একান্তরূপে অজ্ঞাত কোন কারণে গাড়ী পৌছিয়াছে পাক্কা দুই ঘণ্টা বিলম্বে, অর্থাৎ বেলা এগার ঘটিকার স্থানে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক ঘটিকার সময়। গাড়ী পৌছিবা মাত্র একটি কুলি আসিয়া 'আইয়ে বাবু' বলিয়া আগাইয়া দাঁড়াইল, ভাবখানা এমন যে, সে যেন বহুদিন ধরিয়া আমার জন্যই ঐ স্টেশনের উপরে প্রখর গ্রীষ্মের রোদ মাথায় করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল,—ভ্রমণক্লান্ত আমার খানিকটা কষ্ট-লাঘব-করারূপ মহৎ ব্রত ছাড়া তাহার জীবনের অন্য আর কোন ব্রতই নাই। আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া একান্ত স্বগণের ন্যায় সে আমার মালগুলি অতি যত্ন সহকারে প্ল্যাটফর্‌মে নামাইয়া লইল। নীচে নামিয়া আমি বলিলাম, চল এইবারে। সে জিজ্ঞাসা করিল, কত মিলবে? আমি বলিলাম, যাহা 'রেট'—অর্থাৎ দস্তুর, তাহাই মিলিবে। উত্তরে সে একটু হাসিয়া যাহা বলিল তাহার মর্মার্থ এই যে, দুনিয়ায় 'রেট্' বলিয়া কোন জিনিস নাই, কত দিব ঠিক ঠিক না বলিলে সে মাল এক চুলও নড়াইবে না। মধুর রস সহসা কিঞ্চিৎ তিক্ততায় পরিবর্তিত হইল ; ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলাম,—কত চাই বল না। সে বলিল, এক টাকার এক পয়সা কমেও যাইবে না। আমার চক্ষুত একেবারে চড়ক গাছ। সব মাল একত্রিত করিয়া বিশ-পঁচিশ সেরের বেশী ওজন হইবে না, এইটুকু মাল শুধু স্টেশন

পার করিয়া দিতেই এক টাকা। আমি আর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত না হইয়া অপর একটি কুলি ডাকিলাম। সে আসিয়া মাল ধরিতেই পূর্ববর্তী কুলি ধমক দিয়া বলিল,—'ভাগ যাও, এ আঁমার মাল'। এখানে 'আমার মাল' শব্দের অর্থ 'আমাকর্তৃক একবার স্পৃষ্ট মাল'। কিন্তু কোনও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কোন মাল মুহূর্তের জন্য একবার ছুঁইয়া রাখিতে পারিলেই যে তাহার উপর কতখানি অধিকার জন্মায়, আমার জীবনে সেই দিনই প্রথম এই বৃহৎ সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। বস্তুতঃ আমি অনেক চেষ্টা করিয়া—অনেক বেশী পয়সার লোভ দেখাইয়াও দ্বিতীয় কোন কুলি যোগাড় করিতে পারিলাম না। পূর্ববর্তী কুলিটি প্রেতের মতন আমার মাল ক'টি ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অপর যে সব কুলিকে ডাকিলাম সকলেই এক কথা বলিয়া গেল, 'সকেগা নেহি, বাবু।' আমি তখন বলিলাম,—'তবে মাল ছাড়, আমার মাল আমি নিজেই নিয়ে যাব।' কিন্তু কাহার মাল সে কাহাকে ছাড়িবে? একবার যে সে ছুঁইয়া দিয়াছে! রোদের তাপে এবং মনের তাপে সমস্ত শরীর তখন কাঁপিতেছিল, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। এমন নাছোঁড়বান্দা বিপদে জীবনে খুব কম পড়িয়াছি। অসহায়ের সহায় দয়াময় দেবতার তখন যেন দয়া হইল, পার্শ্ববর্তী একটি ভদ্রলোকের রূপে যেন তিনি সশরীরে আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন। ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমি সকরুণ কণ্ঠে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি চোখ টিপিয়া আমাকে ইসারা করিলেন, পরে কুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত চাও তুমি'? কুলিরাও আবার মানুষ চেনে; আমার পার্শ্ববর্তী লোকটির দিকে দু'একবার তাকাইয়া কেমন যেন একটু দমিয়া গেল, বলিল,—'দিজিয়ে বারো আনা, চলিয়ে।' আমি কিছু বলিলাম না, পাশের ভদ্রলোক বলিলেন—বেশত, দেব বারো আনাই, চল। তার পরে ভদ্রলোক আমার সাথে সাথেই চলিলেন, কুলিটিও মালসহ চলিল।

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সেই ভদ্রলোকের নির্দেশে কুলিটি কালীঘাটের বাসে আমার মালটি তুলিয়া দিল। আমি ব্যাগ হইতে বারো আনা পয়সা দিতে উদ্যোগ করিতেই ভদ্রলোক ঠেলিয়া আমাকে বাসের ভিতরে তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—'আপনি উঠুন মশায়, আমি পয়সা দিতেছি।' কুলিটি তখন যেন একটু বেগতিক দেখিল, 'জলদি করিয়ে, জলদি করিয়ে', বলিয়া বারবার তাগিদ দিতে লাগিল; ভদ্রলোকও যেন জলদি জলদি পয়সা দিবেন বলিয়া ব্যাগের সন্ধানে জামা কাপড় খুঁজিতেছিলেন। এই করিতে করিতেই বাসটি ফস্ করিয়া ছাড়িয়া দিল; ভদ্রলোক পকেট হইতে একটি দু'আনি ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। কুলিটি দু'আনাটি উঠাইতে উঠাইতে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছিল সে সকল সুমধুর সম্ভাষণ আর কানে পৌঁছিল না, আমি শুধু মনে মনে ভাবিতেছিলাম, 'শমনদমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম!'

এই মাল ছুঁইয়া দিবার প্রসঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িতেছে। স্টীমারে আসিয়া খুলনায় পৌঁছিয়াছি,—কলিকাতাগামী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরিব। স্টীমার জেটিতে ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, রেসের ঘোড়া পাল্লা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে যেমন করিয়া অদম্য বেগকে সংহত করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই রূপ ঝাঁকে ঝাঁকে কুলি স্টীমারে উঠিবার সিঁড়ির দুইপাশে রুদ্ধবীর্য হইয়া বসিয়া আছে, একটি ছড়ি হাতে একজন সর্দার তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সহসা বাঁধ-ভাঙা জলের মতন সবগুলি কুলি যেন একসঙ্গে হুড়মুড় করিয়া স্টীমারের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, মুহূর্তমধ্যে একটা দারুণ বিপর্যয়, তুমুল কোলাহল। আমি শান্তভাব ফিরিয়া আসিবার আশায় নীরব এবং নিশ্চল হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিলাম। গোলমালটা একটু থিতাইয়া পড়িতে দুইদিকে মোড় ফিরিয়া দেখিলাম, দুইপাশে দুইটি মূর্তি আমার একটি বাক্স এবং বিছানা ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে; এ

বলিতেছে আমি আগে ধরিয়াছি, ও বলিতেছে আমি আগে ধরিয়াছি। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই একে অপরকে বাক্য দ্বারা ভয় দেখাইল, অপরে দেহ দ্বারা ভয় দেখাইল; একজনে মাল মাথায় তুলিল, অপরে মাল টানিয়া নামাইয়া দিল, অপরে আবার মাল মাথায় তুলিতে পূর্বজন তাহার পিঠে দারুণ এক কিল বসাইয়া দিল; তার পরে মাল রাখিয়া কিছুক্ষণ দু'জনে হাতাহাতি। আমি বেচারা ইহার ভিতরে যাহা কিছু বলিতেছি বা যাহা কিছু করিতেছি, তাহাকে উভয়ের কোন জনই কোনও রূপ আমলেই আনিল না। কিছু পরে অপেক্ষাকৃত দুর্বল যে সে কিছু পিছু হটিল, কিন্তু একেবারে ভাগিল না। কারণ এতক্ষণে ষ্টীমারের প্রায় সব লোকই চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং মাল আর নাই। সে আমাদের পিছু পিছুই আসিল, এবং জল হইতে স্থলে উঠিয়া আবার পিছন হইতে আমার মালগুলি টানিয়া ধরিল; আবার কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল পূর্ববর্তী ঘটনার পুনরভিনয়। কিন্তু এবারে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমার হাতের ছাতাটির বাঁট উঁচু করিয়া ধাইয়া গেলাম। সে এবারে পলাইয়া গেল বটে, কিন্তু আমি যতক্ষণে মাল লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হইয়াছি, ততক্ষণে গাড়ীর 'গার্ড' মনানন্দে বংশীধ্বনি করিতে করিতে এবং সবুজ নিশান উড়াইতে উড়াইতে গাড়ী ছাড়িয়া রওনা হইয়া গিয়াছেন। আমি পুরা চৌদ্দ ঘণ্টাকাল স্টেশনে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম।

এ সম্বন্ধে আরও একদিনের একটি বিচিত্র এবং করুণ অভিজ্ঞতা আছে। কাটিহার লাইন দিয়া উত্তরবঙ্গের পার্বতীপুর জংসনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, দার্জিলিং মেল ধরিয়া কলিকাতায় যাইব। একটি কুলি আসিয়া মাল নামাইয়া রাখিয়া রাত্রির অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত কাছাকাছি তাহার আর কোন চিহ্নমাত্রও মিলিল না। জানি, কুলিরা এমনই করিয়া থাকে, আবার যথাসময়ে শ্রীমূর্তির দর্শন

মিলিবে। কিন্তু দার্জিলিং-এর গাড়ী হুড়মুড় করিয়া আসিয়া গেল, কিন্তু শ্রীমূর্তির আর দর্শন নাই। সব কুলিই নিজের নিজের মাল গাড়ীতে তুলিতে ব্যস্ত, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। গাড়ীতেও যাহা ভিড়, তাহার বর্ণনা পদ্য ব্যতীত ছন্দোহীন সঙ্গীতহীন গদ্যে সম্ভবই নহে। দারুণ শীতের রাত্রি, দারুণতর প্রমাদ গণিতে লাগিলাম। সহসা দেখি খোশমেজাজেই আমার কুলিটি অতি নাটকীয় ভাবে আসিয়া দর্শন দিল। আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়াই সে বলিল :—'বাবু, ঘাবড়াও মৎ, ঠিক তুলে দেব, একটু শক্ত হতে হবে।' বলিয়াই সে আমার বাক্স-বিছানা একটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া 'আইয়ে বাবু' বলিয়া ছুটিল। অন্ধ নিয়তির পশ্চাদ্‌গামী অসহায় মানুষের মতন আমিও ছুটিতে লাগিলাম। সহসা একটি কামরার কাছে সে থামিয়া দাঁড়াইয়া মাল রাখিল এবং বলিল,—'পহেলে আপকো জানালাসে ঘুসা দেঙ্গে'। আমার কোন মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই সে আমাকে কাঁধে তুলিয়া জানালার ভিতর দিয়া গাড়ীর মধ্যে অর্ধেকটা 'ঘুসাইয়া' দিল ; কিন্তু গাড়ীর অন্তর্বর্তী যাঁহারা তাঁহারাই বা কর্তব্যে বিরত থাকিবেন কেন ?—তাঁহারাও দু'তিনজনে মিলিয়া আমাকে 'ঘুষাইয়া' দিতে আরম্ভ করিলেন। আমি একান্ত অসহায়ভাবে চ্যাঁচাইয়া উঠিলাম ; তাহার ফলে কুলি একটুও পশ্চাৎপদ হইল না বটে, কিন্তু ভিতরের ভদ্রমহোদয়গণ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইলেন। সেই সুযোগে কুলি আমাকে সম্পূর্ণটাই গাড়ীর ভিতরে 'ঘুসাইয়া' দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশপূর্বক কিঞ্চিৎ বখ্‌শিসের জন্য হাত বাড়াইল। ঘুষির বেদনায় এবং বহুস্থান ছড়িয়া যাইবার বেদনায় প্রথমটা আমি ভয়ানক চটিয়াই গেলাম ; ভাবিলাম কোন কঠিন বস্তু হাতে পাইলে উহার ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে এক আঘাত করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভাবিয়া দেখিলাম, গাড়ীর যাহা অবস্থা, তাহাতে এই

পন্থা ব্যতীত আমার আর গাড়ীতে উঠিবার অন্য পন্থাও ছিল না,—তখন হাত বাড়াইয়া কুলিটাকে কিছু বখ্‌শিসও দিলাম।

পাছে দেনা-পাওনা লইয়া বাক্‌-বিতণ্ডা এবং মুখ-খিঁচানি এবং শেষ পর্যন্ত খিস্তির দায়ে পড়িতে হয়, এই জন্যে আমি বরাবরই কুলির যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহার অন্ততঃ দেড়গুণ পয়সা প্রথমেই সপ্রেমে নিবেদন করিতাম। কিন্তু পয়সা দেওয়া মাত্রই দেখিয়াছি, পাওনাদার মহাশয় আমার প্রদত্ত পয়সা দেখিবামাত্র জিভ কাটিয়া চোখ-মুখের এমন একটি ভাব করেন, যেন আমার মত ভদ্র সন্তানের পক্ষে এইরূপ গর্হিত কাজ জগতে কেউ আর কখনো করে নাই। এইজন্য কুলিকে পয়সা দিবার সময় যত নিকটবর্তী হইতে থাকে, আমি ততই আমার সারা দেহমনে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকি ; সেই ক্ষণটি অল্পে অল্পে ভালয় ভালয় কাটিয়া গেলেই আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়।

কিন্তু কেবল এক তরফা আলোচনায় সুবিচার হইবে না। আমাদের ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি, কোথাও গমনের ব্যপদেশে দু'হাত দিয়া কাজে অকাজে পয়সা ছড়াইতে যাহাদের বাধে না, কুলির পয়সা দিবার সময়ই তাহাদের মাথায় সংসারের যত হিসাববোধ, যত প্রকারের ন্যায়বোধ অতিমাত্রায় উগ্রভাবে নাড়া দিয়া ওঠে। যেখানে রিক্সায় কাজ চলিয়া যায়, সেখানে ট্যাক্সি হাঁকাইতে পয়সার হিসাব আসে না ; দিনমজুর কুলিটি চারি আনার পয়সার স্থানে আর এক আনা পয়সা বেশী মাগিলেই মেজাজ তিরিক্ষি হইয়া যায় এবং সেই তিরিক্ষি মেজাজের প্রকাশ ঘটে চোস্ত গালাগালিতে। চাহিয়া না পাইলেই জোর-জবরদস্তিতে বা ফন্দি-ফিকিরে পয়সা আদায়ের স্পৃহা জাগে। আমাদিগকে অযথা ঠকাইয়া নিল বা জোর-জবরদস্তিতে পয়সা আদায় করিয়া লইল ইত্যাদি কত কথাই না আমরা কতদিন যাবৎ যুক্তি এবং উষ্মা সহযোগে প্রচার

করিয়া আসিলাম; কিন্তু কই, তাহাদের ময়লা-ছেঁড়া কুর্তিটি আজ পর্যন্তও ত একটু পরিষ্কার হইবার বা আস্ত হইবার সুযোগ পাইল না।

একদিনকার এক শেঠজীর কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে। শেঠজী কিছু নিষিদ্ধ ভারী মাল একটি বাক্সে করিয়া পশ্চিমে যাইতেছিলেন। স্টেশনে একটি কুলি করিয়া কুলির মাথায় বাক্স চাপাইয়া দিলেন। বাক্স মাথায় করিয়া ভারে কুলি ত একেবারে ভুমড়াইয়া পড়িবার অবস্থা। বলিল,—"রাম রাম শেঠজী, এত ভারী—কি চিস্ আছে?" শেঠজী চুপি চুপি বলিলেন,—"আরে গোল করিস্ নি বাবা, বখ্ শিস্—বুঝলি ভাইয়া, বেশ বখ্‌শিস্ মিলবে।" বখ্‌শিস্ পাইলে কুলিরা জান কবুল করিতে পারে; অতএব কুলিটি সোজা হইয়াই গেট্ পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সাধ্য কি? গেটে যাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা এক একজন ক্ষুদে সর্বজ্ঞ; কোন্ বাক্সের অভ্যন্তরে কি পদার্থ সযত্নে লুক্কায়িত থাকে, তাহা বুঝিয়া লইবার একটা সহজাত বৃত্তি লইয়াই বিশেষভাবে ইহাদের জন্ম। ঠিক ধরিয়া ফেলিলেন, কুলির মাথার উপরে একবার হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—'ক্যা চিজ হ্যায়'? পিছন হইতে শেঠজী বলিলেন, 'কুছ নেহি হুজুর—কুছ নেহি'; বলিতে বলিতেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ন্যায় শেঠজী গেট্-রক্ষকের প্রায় দেহলগ্ন হইয়া পড়িলেন, অল্পক্ষণে অনেক কথা হইয়া গেল,—কিছু মুখের ভাবগদগদ অস্ফুট ধ্বনিতে, কিছু কিঞ্চিৎবিলসিত অর্থবান্ হাসিতে—কিছু চোখে চোখে; শেঠজী পকেট হইতে ফস্ করিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া গেট্-রক্ষকের হাতে গুঁজিয়া দিলেন, "রাম রাম শেঠজী" বলিয়া অভিবাদন সহকারে গেট্-রক্ষক গেট্ ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু আকাশে যেমন দুষ্টগ্রহ অনেক, স্টেশনেও তেমনি দুষ্টলোক অনেক। শেঠজীর চট্‌পট্ মবলক দশটি টাকা উপঢৌকন একটি স্টেশন-বিহারী পুলিশের লোকেরও চোখে পড়িয়াছে। তিনিও বুঝিলেন, বাক্সটিতে চিজ বহুৎ আছে, আর এক

ধাক্কায় আরও কিছু মিলিতে পারে ; অতএব তিনিও আগাইয়া শেঠজীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এবারে শেঠজীর মুখে অপ্রসন্নতা দেখা দিল। প্রথম কিস্তির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, দ্বিতীয় কিস্তিটা কিঞ্চিৎ জবরদস্তি মনে হইল। কিন্তু বাক্সে শেঠজীর চিজ অনেক, অতএব মনে দুর্বলতাও অনেক, অগত্যা পাঁচ টাকার নোট আর একখানি বাহির করিয়া দিলেন। পাঁচ টাকার নোট দর্শনে পুলিশের লোক অপমানে খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, এক মিনিট পূর্বেই তিনি শেঠজীর শ্রীহস্তে আস্ত দশ টাকার নোট দেখিয়াছিলেন। পাঁচ টাকার নোটখানি যেন তিনি দেখিতেই পান নাই, এইভাবে বলিলেন,—'বাক্স খুলিতেই হইবে, আমি দেখিব।' বৈষয়িক লোক শেঠজী আর ঘাঁটাঘাঁটি ভাল মনে করিলেন না, দশটি টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়াই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিতে করিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। এইবারে কুলির পালা ; শেঠজীর মেজাজ ভাল নাই, জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া বসিয়া রহিলেন। কুলি ডাকিল, 'হামারা পয়সা' ? তিরিক্ষি মেজাজে শেঠজী জবাব দিলেন,—'দেতা হ্যায় ভাইয়া, দেতা হ্যায়, হাম লোগ ভাগতা নেহি।'—বলিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে তিন আনার পয়সা বাহির করিয়া দিলেন। কুলি বলিল, 'এ ক্যা হোতা হ্যায়, শেঠজী' ? শেঠজী আরও ক্ষেপিয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠ চড়াইয়া নিজের ভাষায় বলিলেন,—'তবে কত দেব ? একটা মোটের জন্য কত চাই।' কুলি বলিল,—'এক মোট ? তিন মোটকা ভার হ্যায় ইস্‌মে।' শেঠজীর মেজাজের তাপ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল ; জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—'চুপ রও বেয়াদব, বহুৎ বাৎ মৎ করো।' কুলিও ভড়কাইবার লোক নয় ; এখন চলিতে লাগিল বিবাদ-বিতণ্ডা আধ ঘণ্টার উপরে, শুধু হাতাহাতিটাই বাদ রহিল। গাড়ীর অন্য লোক অস্থির হইয়া উঠিল,—তাহারা মধ্যস্থ হইয়া বলিল, গরিব আদমিকে আর দু'এক আনার পয়সা দিয়া মিটাইয়া

ফেলাই ভাল। শেঠজী গম্ভীর হইয়া তাহাদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি দিতে দু'এক আনা কেন, অনেক বেশীও পারেন, কিন্তু নীতির দিক হইতে তিনি এই জিনিসটা মোটেই পছন্দ করেন না। এই লোকগুলি চোর-ঠগ্-ডাকাত—জবরদস্তি করিয়া নিরীহ যাত্রিদিগকে হয়রানি করিয়া মারে,—ইহাদিগকে আস্কারা দিতেই নাই। ইতিমধ্যে ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,—কুলিটি কিছু লইবে না বলিয়া গাড়ীর বাহির হইয়া গেল,—শেঠজী তখন তিন আনার পয়সার সহিত পরম দাক্ষিণ্য সহকারে আর এক আনা পয়সা যোগ করিয়া প্ল্যাটফরমে ফেলিয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার নীতি রক্ষা করিলেন।

অনেক রকম কুলি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক রকম সিদ্ধান্তে পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখিয়াছি কোন শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধেই কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো চলে না। একদিন একটি যুবক কুলি একটি একান্ত দরিদ্র বৃদ্ধাকে 'বুড়ী মাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া যেরূপ আস্তে আস্তে হাতে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহার কাছে যেন বিকাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। আলোচনাকে আর দীর্ঘ না করিয়া আমি আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া শেষ করিতেছি।

মথুরা হইতে কলিকাতায় আসিব। মথুরা হইতে জি, আই, পি, গাড়ীতে হাথরাস আসিয়া সকাল রাত্রে তুফান মেল ধরিতে হইবে। কিন্তু জি, আই, পি গাড়ীর বেগ অনেক সময় গোরুর গাড়ীর ঠিক পরবর্তী সংস্করণকে মনে করাইয়া দেয়। গাড়ী হাথরাস পৌছিতে অনেক বিলম্ব করিল। আমরা মেল ধরিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিলাম; কিন্তু গাড়ী স্টেশনে পৌছিতেই একটা কুলি বলিল, —মেল গাড়ী এখনও এই গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, জলদি জলদি দৌড়াইয়া গেলে হয়ত গাড়ী পাওয়াও যাইতে পারে। আমি আমার

সামান্য জিনিসপত্রটুকু কুলির মাথায় দিয়া সত্য সত্যই চোঁচা দৌড় দিলাম এবং সত্য সত্যই গিয়া গাড়ী পাইলাম। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া বসিতে গিয়াই মনে পড়িল, আগের গাড়ীতে বসিবার জন্য যে কম্বলটি বিছাইয়া লইয়াছিলাম তাড়াহুড়ায় তাহা আর আনা হয় নাই। মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। কম্বলটা একে যেমন খুব দামী, তাহাতে অতি প্রিয়জনের দেওয়া। দেখিলাম গাড়ী তখনও দাঁড়াইয়া আছে, কুলিটাও চলিয়া যায় নাই। কুলিকে ডাকিয়া কম্বলটার কথা বলিলাম, এবং বলিলাম কম্বলটা আনিয়া দিতে পারিলে এক টাকা বখ্‌শিস দিব। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল এবং সত্য সত্যই কম্বলটা লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে যখন আসিয়াছে, তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু দেখিলাম, সে কম্বলটি লইয়া গাড়ীর সঙ্গেই দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আমি জানালা হইতে মুখ বাড়াইতেই সে কম্বলটা ছুঁড়িয়া গাড়ীর ভিতরে ফেলিয়া দিল; আমিও গাড়ীর বাহিরে একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিলাম। অত বহুমূল্যের কম্বলটি সে কেন আত্মসাৎ করিল না, কেন জি, আই, পি গাড়ী হইতে লইয়া ফিরিয়া আসিল, আসিয়া আবার অমন করিয়া দৌড়াইয়া চলন্ত গাড়ীতে কেনই বা ছুঁড়িয়া দিল—সে কথাটা আমি একা একা মনে মনে অনেকদিন ভাবিয়াছি, আজও ঠিক করিতে পারি নাই।

অবিশ্বাস্য সত্য

তখন আমরা স্কুলে পড়ি। সে-জীবনে সমস্ত বৎসরের ভিতরে যে দিবসগুলি উজ্জল হইয়া মনে ঘোরা ফেরা করিত তাহার ভিতরে দুইটি বিশেষদিন ছিল, বারোয়ারী কালীপূজার পরবর্তী দু'পালা যাত্রাগানের দুইটি দিন। শীতের শেষরাত্রে যাত্রাগান শেষ করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ি ফিরিতাম—ঈষৎ সাড়া দিয়া দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতাম অপরাধীর ন্যায়—জোরে ধাক্কা দিতে সাহস হইত না। পরে অবশ্য শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া লইতে হইত কড়া বকুনির ঝাঁজে।

এই বারোয়ারী কালীপূজার সহিত জড়িত হইয়াছিল আমাদের গাঁয়ের আরেকটি ধর্মানুষ্ঠান—সেটি বারোয়ারী নারায়ণের অভিষেক। পাড়ার যত বাড়ির যত গৃহদেবতা—অর্থাৎ ছোট বড় এবং মাঝারী অসংখ্য শালগ্রামশিলা এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ—সব একত্রিত হইত একস্থানে—পরে হইত তাঁহাদের অভিষেক। এই অনুষ্ঠানটির প্রতিও আমাদের আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। যে বয়সের কথা বলিতেছি, সে-বয়সটা দেবতায় ভক্তি এবং তাঁহার প্রসাদের প্রতি আন্তরিক অনুরক্তির ভিতরকার সূক্ষ্ম প্রভেদটা গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল না। মোটের উপরে সমস্ত পাড়ার ভিতরে হৈ চৈ—মাথায় গামছা-বাঁধা ব্যস্ত-সমস্ত পুরুতঠাকুরদের এ-বাড়ি সে-বাড়ি গমনাগমন—জাঁক-জমক, প্রসাদের প্রাচুর্য—সমস্ত জড়াইয়া এ উৎসবটিও বেশ স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সকল আয়োজনের ভিতরে একটা ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল—এবং সেই ব্যবস্থার নিগূঢ় কারণটি জানিবার

জন্য একটি অনিবার্য কৌতূহল আমার বালক মনকে নাড়া দিতেছিল,—কিন্তু সে-বয়সটা ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত কোন বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন বা বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার পক্ষেও প্রতিকূল ছিল,—অতএব কৌতূহল-চরিতার্থ করণের নিমিত্ত কলা-কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হইল। তামাকু-পিয়াসী এক প্রৌঢ় পুরোহিত ঠাকুরকে নিতান্ত অযাচিত ভাবেই এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিলাম; সেই তামাকুর ধোঁয়া বঙ্কিমগতিতে পুরোহিতের ব্রহ্মরন্ধ্রের আশে পাশে বিচরণ করিয়া যখন তাঁহার মেজাজের ভিতরে বেশ একটা সরসতার আমেজ আনিয়া দিল, সেই সুযোগে চাপা গলায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ঠাকুর মহাশয়, শালগ্রামশিলা এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহগুলি দু'খানা আসনে পৃথক্ পৃথক্ সাজান হইয়াছে কেন?' প্রশ্ন শুনিয়া তিনি তামাকুতে সজোরে টান দিলেন,—যুগপৎ নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—'এক আসনে বামুনদের নারায়ণ, আরেক আসনে বৈদ্য-কায়েতদের নারায়ণ।' আমি বলিলাম 'কেন—তাঁহারা সকলে একত্র বসিতে পারেন না?' জবাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'বামুন, বৈদ্য, কায়েত কখনো এক আসনে বসে—? একত্রে খায়?' আমরা পাড়া-গাঁয়ের ছেলে, আর কিছু না জানিলেও এ-জিনিসটা ভালভাবেই জানিতাম; কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ ঠাকুরেরও যে কখন বামুন, বৈদ্য এবং কায়েতের ছোঁয়া লাগিয়া জাত-ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে সে খবরটা জানিতাম না।

এই ঘটনার পর হইতে আমাদের সকল পূজা-পার্বণে আমি ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের ক্রিয়া-পদ্ধতি একটু বিশেষ-ভাবে নজর করিয়া দেখিতাম। সামনের দুর্গা পূজার সময় যে তথ্যটি কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায় একটি প্রকাণ্ড আবিষ্কার রূপে আমার কাছে প্রকট হইয়াছিল তাহা এই যে, আমাদের দুর্গা-প্রতিমাকে আমাদের পুরোহিত পূজা করেন বটে, কিন্তু আমরা জাতিতে বৈদ্য বলিয়া তিনি আমাদের

প্রতিমাকে কখনও প্রণাম করেন না। আমি ছাড়িবার পাত্র নহি—পুরোহিত ঠাকুরকে ধরিলাম; তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-বীর্যে পৈতাটি তুলিয়া কানে জড়াইলেন এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতির নামে সঙ্কল্পিত হইয়া যে প্রতিমার প্রাণ-প্রাতষ্ঠা হয় আমি ব্রাহ্মণের বংশধর হইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে পারি না। খোঁজ করিয়া জানিলাম, ইহা আমাদের ঠাকুর মহাশয়েরই উগ্রব্রাহ্মণ্য-তেজের পরিচয় নয়, ইহাই আমাদের হিন্দু-সমাজের সাধারণ নিয়ম।

আরও একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। পুরোহিত ঠাকুর ঘরের ভিতরে বসিয়া পূজা করিতেছেন,—আমরা বিশ-পঁচিশ জন লোক বারান্দায় বসা। আমাদের পাশেই এক কোণে বসিয়াছিল আমাদের ঢুলী। পূজা শেষ করিয়া পুরোহিত ঠাকুর শালগ্রামশিলা লইয়া বাহিরে নামিতেছিলেন,—আমরা সেই বিশ-পঁচিশ জন লোক সহজাত বৃত্তিতে সমস্বরে চিৎকার করিয়া ঢুলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—'বাইরে যাও—বাইরে যাও'—। আমাদের সমবেত চীৎকারের ফলে বেচারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া একেবারে হুমড়ি খাইয়া ঢোলসহ বাহিরে পড়িয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর নির্বিঘ্নে ঠাকুর-দেবতা লইয়া চলিয়া গেলেন। পুরোহিত চলিয়া গেলে আমি চাহিয়া দেখিলাম ঢুলী যেখানে বসিয়াছিল, তাহারই পাশে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছে আমাদের কুকুরটি,—তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সবচেয়ে আজ মজা লাগিতেছে আরেকটা ঘটনা স্মরণ করিয়া; ইহার পরদিনই আমাদের গ্রামে হিন্দুদের একটি মহাসভা বসিয়াছিল—এবং সেখানে জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণপুত্রকে দেখিয়াছিলাম খোশ মেজাজে এই জগা ঢুলীর গলা ধরিয়া আলাপ করিতে—'জগা, তোরা আমরা ভাই ভাই—সবাই আমরা হিন্দু—তোর ভোটটা আমাকে দিস্ যেন।'

যে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিলাম, বড় বড় ধর্ম সংস্কারক-গণের চোখে ইহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমার চোখে ইহারা প্রকাণ্ড 'কিঞ্চিৎকর'রূপে জাগিয়া মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। জানি ইহার সমর্থনে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিতে বেগ পাইতে হয় না; তাহার কারণ, সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থমধ্যে (তাহা যে যুগে যাহা দ্বারাই লিখিত হোক না কেন) আমাদের যে 'অ-শাস্ত্র' কোন্‌খানি তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই গবেষণাসাপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্র-বচন মাথায় রাখিয়াও একটা কথা সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে হইতেছে,—যে ধর্মপদ্ধতি ভগবানে ভক্তি শিখাইতে গিয়া মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখায়, তাহা কখনও মানুষের ধর্ম নহে। আর মানুষের ভিতরে জাতিভেদ থাকা উচিত কি-না তাহা লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে, কিন্তু ভগবানের বা ভগবদ্বিগ্রহেরও জাতিভেদ থাকা উচিত কিনা তাহা লইয়াও যদি বিতর্ক ওঠে তবে বুঝিতে হইবে জাতিভেদের সমাজ-ব্যবস্থা আজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে এবং সে আমাদের জাতির জীবনী-শক্তির মূলে কঠিন আঘাত হানিয়াছে।

প্রহার-প্রকরণম্

সেদিন একটি শিশু-শিক্ষার্থীর নিকট শুনিতেছিলাম, বিদ্যালয়ে প্রহার সাধারণতঃ তিন প্রকারের ; উত্তম, মধ্যম এবং অধম। সামান্য একটু পড়াশুনা না পারিলে, বা অল্প-স্বল্প গোলমাল করিলে, ক্লাসে কিঞ্চিৎ দেরী করিয়া ঢুকিলে শিক্ষক মহাশয়ের যে চোখ-রাঙানি, বকুনি, ধমকানি বা উত্তেজিত ভাবে হস্ত-পদ সঞ্চালন, শিরশ্চালন প্রভৃতি উহা উত্তম প্রহারের পর্যায়ভুক্ত। ইহার সহিত নাতিবলপূর্বক কর্ণস্পর্শন, কেশাকর্ষণ, গণ্ডমর্দন প্রভৃতিকেও উত্তম শ্রেণীর ভিতরেই গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আবার একটা সূক্ষ্ম মাত্রার প্রশ্ন রহিয়াছে। যেমন কর্ণস্পর্শন বা গণ্ডমর্দনের ফলে যদি দেহের ঐ ঐ প্রদেশের কোন বৈবর্ণ্য লক্ষিত হয় তবে তাহা উত্তমের পর্যায় অতিক্রম করিয়া মধ্যমের পর্যায়ে আসিয়া প্রবেশ করিল।

মধ্যম প্রহারে সর্বদাই গুরুশিষ্যের ভিতরে একটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের প্রশ্ন থাকে ; দূরে দূরে বসিয়া এ জিনিস সাধিত হইবার নহে। অপরাধের মাত্রাধিক্যের অনুপাতে চড়, কিল, ঘুষি, দুই চারিটি বেত্রাঘাত এই মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল জিনিসই যখন স্বতন্ত্র ভাবে আপতিত না হইয়া শ্রাবণের কালোমেঘবর্ষণের মতন ঘন পশলায় দেখা দেয় তখনই তাহা মধ্যম শ্রেণী হইতে অধম শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

এই ত গেল সাধারণ ব্যবস্থা। অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে প্রহারেরও একটি অসাধারণ প্রকার লক্ষিত হয়, তাহাকে বলা যাইতে পারে 'ধমাধম'। এই 'ধমাধমে'র স্বরূপটি অতি জটিল ; শিশু-শিক্ষার্থীটি ঠিক তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিতেছিল না ; তবে তাহার বর্ণনা এবং ভাবভঙ্গি হইতে যাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম তাহার

সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ এই ;—পূর্বোক্ত তিন প্রকারের প্রহার যখন কোনও মাত্রার প্রশ্নকে গ্রাহ্য না করিয়া একটা প্রচণ্ড বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখনকার সেই মাত্রাবর্জিত মিশ্র প্রহারবিধিকে বাঙলাদেশের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ 'ধমাধম' আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিয়ম ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি সম্যক্ ওয়াকিফ-হাল নহি ; কিন্তু সহজাতভাবেই মনে হয়, সব বিষয়েই অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের যখন একটা বৈশিষ্ট্যের গর্ব করিয়া থাকি তখন এ ব্যাপারেও বোধ হয় আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। বর্তমানে অবশ্য আমাদের সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে যেমন অনেক সংস্কারের প্রবর্তন করা হইয়াছে, শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রহার-বিধি সম্পর্কেও এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই একটা সংস্কার দেখা দিয়াছে। গ্রাম্য পাঠশালা প্রভৃতিতে পূর্বকালে আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক যে প্রহার-বিধি প্রচলিত ছিল আমাদের শৈশবে, নবযুগের নবসংস্কারের প্রবর্তনের পূর্বে ক্রমেই তাহা ক্ষীণায়মান হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আমরা অনেক দেখিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি—শুনিয়াছি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি, অশরীরী ছায়ামূর্তির ন্যায় তাহা যেন এখনও ক্ষণে ক্ষণে শুধু মানসিক নয়—একটি শারীরিক বিক্রিয়া উৎপাদন করে।

আমরা যখন পাঠশালায় পড়ি তখন গুরু মহাশয়গণের দাপট কিছুটা কমিয়া আসিয়াছে। কতগুলি নিত্যপ্রযুক্ত শাস্তির কথা আমরা দিদিমা-পিসিমার নিকটে বহুবার সাগ্রহে শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই নাই। সতীদাহ-প্রথা নিবারিত হইবার পরও বহুদিন যাবৎ শিক্ষার নামে এই সকল প্রহার-প্রথা বাঙলাদেশের পল্লীতে প্রচলিত ছিল; আমাদের কিছু পূর্বে এগুলি অপ্রচলিত হইয়া

পড়িয়াছিল। এই সকল শাস্তিবিধির ভিতরে একটি প্রসিদ্ধ বিধি ছিল অপরাধী বালককে উলঙ্গ করিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া তাহার গায়ে বোলতার বাসা ভাঙিয়া দেওয়া। বোলতায় যাহাতে যথেচ্ছ হুল ফুটাইতে পারে সেইজন্য অপরাধীকে প্রথমে নিরাবরণ করিয়া লওয়া হইত; পলাইয়া যাহাতে আত্মরক্ষা না করিতে পারে সেইজন্য পা দুইটি বাঁধা হইত, হস্ত দ্বারা যাহাতে বোলতা বিতাড়ন না করিতে পারে সেই জন্যে হাত বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এই শাস্তিরই মৃদুতর রূপ ছিল বোলতার পরিবর্তে পূর্বোক্ত অবস্থায়ই 'লাসা'র (বড় লাল পিঁপড়া) বাসা গায়ে ভাঙিয়া দেওয়া। পরবর্তী কালে ইহারই সভ্যতর রূপ দেখা দিয়াছিল গায়ে নানাপ্রকারের বিছুটি পাতা ঘষিয়া দেওয়া।

আমরা আমাদের পাঠশালায় অপরাধী বালককে দিয়া নানাপ্রকারের পশু তৈয়ারী করিবার রীতি প্রচলিত দেখিয়াছি। এই সকলের ভিতরে প্রসিদ্ধ ছিল কচ্ছপ করিয়া রাখা। প্রণালীটি ছিল অনেকখানি এইরূপ —অপরাধীকে উবু ভাবে বসাইয়া প্রথমতঃ তাহার দুইখানি হাত দুই হাঁটুর ভিতর দিয়া উঠাইয়া লইয়া দুই কান স্পর্শ করান হইত। এই অবস্থায় বালকটির আর নড়িবার চড়িবার শক্তি থাকিত না; তখন গুরু মহাশয় তাহাকে ধাক্কা দিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিতেন; বালকটি কচ্ছপাকৃতি হইয়া পড়িয়া থাকিত। কখনো কখনো এই অবস্থায় রৌদ্রের ভিতরে লইয়া গিয়া সূর্যমুখী করিয়া ফেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল।

অপরাধী বালককে শূকরাকৃতি করিয়া শাস্তিদানের একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহার নাম ছিল 'শূয়োর-ডুলি' করা। দুর্বিনীত কোন ছাত্র অনেকদিন পাঠশালা কামাই করিলে এই 'শূয়োর-ডুলি' পদ্ধতিতে তাহাকে পাঠশালায় ধরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা ছিল। যে সকল শক্তিশালী বালক এই কাজের জন্য গুরুমহাশয় কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া

প্রেরিত হইত, তাহাদের পরিচয় ছিল 'গুরু মহাশয়ের পিয়াদা'। সক্রিয় কর্মী হিসাবে নহে, নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে একবার এইরূপ একটি পিয়াদা-পার্টির অনুগমন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি। আমরা খাওয়া-দাওয়া করিয়া যথাসময়ে পাঠশালায় গিয়াছি। দিনটি আমার নিকট খুব স্মরণীয় এই কারণে, সেদিন আমার 'ফলা' ছাড়িয়া 'নামে' উঠিবার কথা; অর্থাৎ ফলা লেখাটা রপ্ত হইয়া যাইবার পরে ফলা-সংযুক্ত বিবিধ নাম লিখিবার সুযোগ পাইব। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা এই, এতদিন তালপাতায় লিখিবার রীতি ছিল, আজ নাম লিখিব কলাপাতায়। তালপাতায় লেখা অপেক্ষা কলাপাতায় লেখা যে কতখানি বেশী মর্যাদাসূচক তাহা আজও বলিতে পারি না; কিন্তু বৈচিত্র্য বটে। সেও কি কম লাভ?

পাঠশালা আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরেই খালের ওপারের বামুন বাড়ির এক মধ্যবয়সী পিসিমা সাক্ষাৎ কামাখ্যা-মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিলেন। আমরা ইহাতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিছু কিছু ঠাকুমা-পিসিমা বিবিধ অভিযোগ লইয়া প্রায় রোজই আসিয়া দেখা দিতেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের সকল বক্তব্য শেষ করিয়া সাধারণতঃ গুরুমহাশয়ের উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে একটা মন্তব্য প্রায় সকলেই করিতেন। মন্তব্যটি এই,—"শুধু প্রাণে মারিবেন না, কিন্তু হাড় আর মাংস ভাগ করিয়া দিবেন।" গুরু মহাশয়কে বেশী কথা না বলিয়া শুধু সম্মতিসূচক একটি হাস্য করিতে দেখিতাম।

আজিকার অভিযোগ ছিল একটু গুরুতর ধরণের। একটি বিশেষ বালক (নামটি আজও গোপন করিয়া যাইতেছি) শুধু যে আজ আট দশ দিন যাবৎ পাঠশালা কামাই করিয়া বড়শি দ্বারা পুঁটি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে তাহাই নহে, পিসিমার চার গাছি পৈতা জোর করিয়া লইয়া গিয়া সে বড়শির সুতারূপে ব্যবহার করিতেছে; বর্তমানে সে

স্বচ্ছন্দে এবং সানন্দে অপরের পুকুর পাড়ে পুঁটিমাছ ধরিতেছে এবং ইহা লইয়া অপরের সহিত একটা ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত করিতেছে। অভিযোগকারিণীর আরও বক্তব্য এই যে, গুরুমহাশয় নিশ্চয়ই তাঁহার পদের উপযুক্ত নন, নতুবা এইরূপ ব্যাপার কি করিয়া সম্ভবপর হইতেছে।

অভিযোগের বিবরণ শুনিয়া গুরুমহাশয় প্রথমতঃ কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিলেন, পরে একটু পালোয়ান গোছের সাত-আটটি ছেলেকে ডাকিয়া কাছে লইয়া নানাপ্রকারের ফন্দি-ফিকিরের উপদেশ সহকারে তাহাদিগকে অভিযুক্ত ছেলেটিকে পাঠশালায় হাজির করাইবার ভার দিলেন। আমিও গুরুমহাশয়ের অনুমতি লইয়া দলটির অনুগমন করিলাম। যতদূর মনে পড়ে, দলটির ভিতরে আমিই ছিলাম বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রথমশ্রেণী দ্বিতীয়শ্রেণীর পড়ুয়াগণের ভিতরেও তখন বার-তের বৎসর বয়স্ক বালক তিন চারিটি ছিল। তাহারাই মোড়ল হইয়া চলিল।

পাছে আসামী আমাদের অভিযানের কথা টের পাইয়া পশ্চাদ্দুয়ার দিয়া পলায়ন করে এই জন্য আমরা সদলবলে সহসা তাহার বাড়িতে প্রবেশ করিলাম না,—আসামীর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য একটি ছেলেকে নেহাৎ একটা গোবেচারার ভাব ধারণ করাইয়া গুপ্তচররূপে বাড়ির ভিতরে পাঠাইয়া দিলাম; অপর সকলে খালপাড়ের একটা বৃদ্ধ জাম গাছের বাহির-হইয়া-পড়া শিকড়গুলির উপরেই বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল, আসামী পাড়ার আর একটি বালকের সহিত একত্রিত হইয়া পুকুর পাড়ে শুকনো কলার পাতা দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া বাঁশের কঞ্চি দ্বারা তৈয়ারী ছিপগুলির বাঁকা গাঁটগুলি সোজা করিতেছে। আর কথা নাই,—হিট্‌লারের ঝটিকা-বাহিনীর ন্যায় বিদ্যুদ্‌গতিতে অগ্রসর হইয়া পুকুরের চারি পাড় দিয়া আসামীকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। প্রথমে সে হাতের ছিপগুলি লইয়াই তাড়া করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পরে আমাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া

পিছাইয়া গেল। পরক্ষণেই তাহার মাথায় কি বুদ্ধি আসিল, ছিপগুলি ফেলিয়া রাখিয়া সহসা সে আমাদের বেড়াজাল ভেদ করিয়া বাড়ির ভিতরে পলাইয়া গেল। আমরাও দৌড়াইয়া গিয়া চারিদিক হইতে ভিতর বাড়ি ঘিরিয়া ফেলিলাম। বাড়িতে তখন পুরুষ মানুষ কেহ ছিলেন না, মেয়েরা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সমর্থন আমাদের দিকে।

কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়া গেল। আসামীটি ব্রাহ্মণ, পিয়াদাদলের ভিতরে আমরা যাহারা ছিলাম, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণেতর। মুহূর্তের ভিতরে এই তথ্যটি লক্ষ্য করিয়া সে চোঁচা দৌড় দিয়া গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং সেখানে ভাতের হাঁড়িটি স্পর্শ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একে গুরু পুরোহিতের বাড়ি, তাহাতে রান্নাঘর—তাহাতে আবার ভাতের হাঁড়ি ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মহা বিপদ মানিলাম। কিন্তু পিয়াদাগণের ভিতরেও ধুরন্ধরের অভাব ছিল না, তাহারা ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া হাত গলাইয়া ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। আসামী চালে হারিল; সে রান্না ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। আমাদের ভিতরে একটি ছেলে তাহাকে ধরিতে গেলেই সে তাহার হাত কামড়াইয়া দিয়া ছাড়াইয়া পলাইল। কিন্তু সে বুঝিল পলাইয়া সে বেশী দূর যাইতে পারিবে না;—এবারে তাই দৌড়াইয়া গিয়া ঝুপ করিয়া পুকুরের জলে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরকার দুই তিনটি ছেলেও লাফাইয়া জলে পড়িল; কিন্তু তাহাকে ধরে সাধ্য কি? সে এক ডুবে পুকুরের ওপারে যায়, আর এক ডুবে আবার অপর দিকে যায়। আবার আরম্ভ হইল ঢিল ছোঁড়া। ডুব দিয়া জলের নীচে আর কতক্ষণ থাকিবে? মাথা তুলিলেই ঢিল! অনেকক্ষণ সে এই ভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিল, পুকুরের কাদামাটি এবং ঝিনুক ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সে ঢিলের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু একা পারিবে কেন? শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া সে আত্মসমর্পণের

অভিপ্রায় জানাইল, এবং কূলে উঠিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। বিজয়োল্লাসে পিয়াদার দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; তাহার হাত দুইটি বাঁধিল, পা দুইটি বাঁধিল—তাহার ভিতর দিয়া একটি লম্বা বাঁশের লাঠি ঢুকাইয়া দিয়া চারিজনে তাহাকে 'শূয়োর-ডুলি' করিয়া লইয়া চলিল। এ যেন সত্যই বন্য বরাহ শিকার! পথে পথে ছেলের দল গান ধরিল,—

গুরুমশাই গুরুমশাই আর করিব কি?
বেত-বুনে শূয়োরটাকে হাজির করেছি।

আমার মনটা কেমন দমিয়া গেল, এই উল্লাসে আমি যেন যোগ দিতে পারিতেছিলাম না; আমি আস্তে আস্তে পিছন হইতে সরিয়া পড়িলাম। সুতরাং ইহার পরবর্তী অধ্যায়টি প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করিতেছি, মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন পাঠশালায় বসিয়াই খবর পাইলাম, সেই পুকুরেই সেই ছেলেটি স্নান করিবার সময় পায়ে কাপড় জড়াইয়া ডুবিয়া মরিয়াছে। আজও তাহার বাঁশের লাঠিতে ঝোলান দেহটি, তাহার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলি, তাহার ঝুলিয়া-পড়া রক্তিম মুখখানি আমার স্মৃতিকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিতেছে।

একটু বড় হইয়া যখন উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে পড়ি, তখনকার একদিনের কয়েকটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন বিদেশী; তিনি স্কুল-বাড়িতেই থাকিতেন, ঐখানেই নিজে রান্না-বান্না করিয়া খাইতেন। একদিন তিনি হাঁড়িতে ভাত চাপাইয়া দিয়া ভাত ফুটিবার অবসরে সন্ধ্যা-আহ্নিকটা সারিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন, এদিকে আমাদের ক্রীড়োন্মত্ত কোলাহল ক্রমেই বিধিবহির্ভূত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা দেখিলাম, খাটের সহিত মশারি টাঙ্গাইবার বাঁশ হইতে একখণ্ড বাঁশ হস্তে শিক্ষকমহাশয় আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হইলেন এবং কোনও বাক্য প্রয়োগ না করিয়া সেই

বংশ-প্রয়োগেই আমাদিগকে সংযত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এই শিক্ষক মহাশয়ই আমাদের 'ড্রিল মাষ্টার' ছিলেন। একদিন তিনি ড্রিল করাইবার জন্য আমাদিগকে মাঠে নামাইলেন। আমরা তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়াই অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা রকমের কুচকাওয়াজ করাইতে লাগিলেন। জিনিসগুলি আমাদের বড়ই ভাল লাগিতেছিল, আর যতই ভাল লাগিতেছিল ততই আমরা নিজেরা ঐরূপ করিবার জন্য অধৈর্য হইয়া পড়িতেছিলাম। আমাদের কখন করাইবেন ইহার জন্য উতলা হইয়া বারবার শিক্ষক মহাশয়কে উত্যক্ত করিতে লাগিলাম। আমাদের কোলাহলে আর বেশীক্ষণ কাজ করিতে না পারিয়া তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা ক্লাসে যাও—তোমাদিগকে ক্লাসে বসিয়া আজ নতুন রকমের ড্রিল করাইব!' আমরা হল্লা করিয়া লাফাইতে লাফাইতে ক্লাসে ঢুকিলাম। তিনি ড্রিলের ভঙ্গিতেই আমাদিগকে একটার পর একটা আদেশ দিতে লাগিলেন। প্রথম আদেশ দিলেন,—'যে যাহার জায়গায় দাঁড়াও', পরে—'যে যাহার বেঞ্চিতে বস', পরে—'যে যাহার বেঞ্চিতে দাঁড়াও।' আমরা মহানন্দে একটার পর একটা আদেশ পালন করিয়া যাইতেছি, এবং পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় অধীর হইয়া উঠিতেছি। তিনি তারপরে আদেশ দিলেন,—'একটু একটু করিয়া বস; আবার একটু একটু করিয়া দাঁড়াও',—আমরা সোল্লাসে আদেশ পালন করিয়াই যাইতেছি। তারপরে তিনি আর একবার 'একটু একটু করিয়া বস' আদেশ দিয়া অর্ধপথে বলিলেন,—'এইবারে থাম।' আমরা সহসা এদিক ওদিকে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, ক্লাসশুদ্ধ ছেলে বেঞ্চির উপরে 'নাড়ু গোপাল' হইয়া আছি!

এইবারে সকলের মনে একটু সংশয়ের ছায়াপাত হইল। দেখি, এ আদেশের আর কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না সংশয় ক্রমে প্রত্যয়ে

পরিণত হইল। বুঝিলাম, দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন, ইহা শাস্তি। আমাদিগকে সেইভাবে রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মনে হইল তিনি বোধহয় ভাত খাইতে বা এইরূপ কোন কাজে গিয়াছেন, অনেক দিনই তিনি এরূপ করেন। কিন্তু পনর বিশ মিনিট পরে যখন তিনি ফিরিলেন তখন দেখিলাম তাঁহার হাতে কিঞ্চিদধিক এক ফুট মাপের অনেকগুলি বাঁশের কঞ্চি; আগাটা একটু ছুঁচালো করা। তিনি আমাদের সকলের পেছনেই ঐরূপ একখানি কঞ্চি লাগাইয়া দিয়া গেলেন; আমরা এই কাজের অর্থ সম্যক্ অবগত ছিলাম। অর্থাৎ যদি বসিবার চেষ্টা করি, কঞ্চির খোঁচা খাইব, উঠিবার চেষ্টা করিলে কঞ্চি পড়িয়া যাইবে,—সপাং করিয়া পায়ে বেত পড়িবে। অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া আমাদের ভিতরে একটি বালক আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; দেখিলাম সে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাইল। ইহাই মুক্তির একমাত্র উপায় বুঝিতে পারিয়া আমরাও সমস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম; শিক্ষকমহাশয় দয়ার্দ্র হইয়া নহে কতকটা একটা অস্বস্তি বোধ করিয়া সেদিনকার মত আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

শাস্ত্রে পড়িয়াছি পৃথিবীতে পাপের ভার বেশী হইলে ভগবান তাঁহার ঊর্ধ্বধাম হইতে নিম্নে অবতাররূপে অবতরণ করেন। বুদ্ধদেব এইরূপ একবার অবতীর্ণ হইয়া 'পশুঘাত' দর্শনে সদয়হৃদয় হইয়া যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়াছেন। বাঙলা দেশের এই 'শিশুঘাত' দর্শনে সদয়হৃদয় হইয়া শিক্ষা-বিধির নিন্দা করিবার জন্য ভগবান তাঁহার কোন অবতারকে পাঠান প্রয়োজন মনে করিলেন না কেন?

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সত্যরূপ

ছেলেবেলা শুনিয়াছি পাতালে বাসুকি মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে—তাহাতে হয় প্রকাণ্ড সব ভূমিকম্প,—তাহাতে কত দেশ ভাঙে কত দেশ গড়ে, যাহারা উপরে ছিল নীচে নামিয়া আসে, নীচের জিনিস উপরে চলিয়া যায়—এমনিতর সব ওলট পালট। তখন ভাবিতাম, বাসুকি মাথা নাড়ে তাহার খেয়ালে, পিছনে কোন যুক্তি নাই। এখন যখন পৃথিবীর ইতিহাস একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন কোনটাকেই আর নিরর্থক খেয়াল-খুশী মনে হয় না, বাসুকির কিছুকাল পরে পরে মাথা নাড়ানর ভিতরে ইতিহাসের সুন্দর একটি ছন্দোসূত্র পাওয়া যায়।

একটা প্রকাণ্ড ওলট-পালট দেখা দিয়াছে ভারতবর্ষের বুকে আজ দশ বার বৎসর ধরিয়া। এই ওলট-পালটের ধাক্কা প্রথম আসিয়া লাগিয়াছিল বিদেশের কূল হইতে, ইহাকে বহন করিয়া আনিয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাহির হইতে আগত এই প্রবল আঘাত আমাদের দেশ ও জাতির বুকের উপর দিয়া শুধুমাত্র একটা অন্ধ স্টীম রোলারের মতন আমাদিগকে পিষিয়াই দিয়া যাইত যদি আমরা এই বিরাট আলোড়নের অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করিতে না পারিতাম এবং সমস্ত জাতিটাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে না পারিতাম। এই আলোড়নের পথেই আসিয়াছে এত শীঘ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা—তাহার সঙ্গে আসিয়াছে ভারত-বিভাগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রীতিকর এবং অপ্রীতিকর ঘটনা সমূহ। ইহার ভিতরে আমরা রুদ্রের রোষ-মূর্তি দেখিয়াই বিমূঢ় হইয়া গিয়াছি,

এই রুদ্র ভ্রূকুটির পশ্চাতে যে কল্যাণতম মুখ রহিয়াছে তাহাকেও আজ বরণ করিয়া লইতে হইবে।

আলোচনার ক্ষেত্রকে আরও অনেক ছোট করিয়া লওয়া যাক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলা দেশকে ভাগ করা হইয়াছে। তাহাতে দেশে আসিয়াছে অধিকতর অশান্তি—জীবনের ক্ষেত্রে একান্তভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে লক্ষ লক্ষ নরনারী। এদের দুঃখ-দুর্দশা এবং তাহার ফলে জাতীয় জীবনের গ্লানির দিকটাকেই আমরা নানাভাবে বিশ্লেষণ করিতেছি এবং তাহাকে ফলাও করিয়া দিনের পর দিন প্রকাশ এবং প্রচার করিতেছি। এই সকল দুঃখ দৈন্য বিপর্যয় কিছুই অস্বীকার করিবার নয়; ইহার ফলে রাষ্ট্রিক, আর্থিক এবং সামাজিক যে সকল পরিবর্তন দেখা দিতেছে তাহার প্রত্যেকটা দ্বারা ব্যক্তিগতভাবেই হয়ত আমরা নিরন্তর আহত হইতেছি। কিন্তু তথাপি এই বিপর্যয়কে অবিমিশ্র অমঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

আমরা পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘটনাটাকে যখনই ভালমন্দ বলিয়া বিচার করিতে যাই তখনই আমাদের মনের মধ্যে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দু থাকে, সেই কেন্দ্রবিন্দুটির অবলম্বনেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ভালমন্দের আলোচনা চলিতে থাকে। এই কেন্দ্রবিন্দুটিতে রহিয়াছে মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজটি এবং সেই মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজটিকে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি তথা ভারতীয় জাতির সহিত এক করিয়া লই; ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজটিতে যত ভাঙন ধরিতেছে আমরা ততই আশঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ততই কৃষ্ণরূপ আমাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই মনোবৃত্তিটি আজকালের একেবারে নূতন একটা জিনিস নয়। গত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া আমরা দেশ বলিতে বা জাতি বলিতে এই বিশেষ সম্প্রদায়টির কথাই মনে করিতাম; এত দিনের

রাজনৈতিক বোধের ভিতরেই এইখানে আমাদের প্রকাণ্ড একটা জড়তাকে আমরা শুধু বরদাস্ত করিয়াই আসি নাই, তাহাকে নানাভাবে ইন্ধন দিয়া পোষণ করিয়া আসিয়াছি। আজ তাই রাজনৈতিক বুদ্ধি বদলাইলেও রাজনৈতিক সংস্কার বদলাইতেছে না, তাই মুখে যেই যাহা বলি, মনের ভিতরে রক্তস্রাবী কাঁটার আঁচড় অনুভব করি।

ইতিহাসের সুষ্ঠু আবর্তনের জন্য কালের প্রবাহের ভিতরে এই মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজের জীবনে এতবড় একটা রূঢ় ধাক্কা একান্ত সঙ্গত এবং সেই জন্যই অনিবার্য ছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্বে বলিয়াছি, মধ্যবিত্ত হিন্দু জীবন আমাদের রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু; ইহার কারণ সাম্প্রতিক পাঁচ সাত বছরের কথা ছাড়িয়া দিলে, গত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া এই বিশেষ সম্প্রদায়টিই আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ধর্ম, রাষ্ট্র, আর্থিক-ব্যবস্থা এবং সমাজ-ব্যবস্থা সকলই মুখ্যতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে এই বিশেষ সম্প্রদায়টিকে কেন্দ্র করিয়া। সুতরাং জাতীয় জীবনে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়ন করিতে সর্বপ্রথমে একটা প্রকাণ্ড নাড়া দিবার প্রয়োজন ছিল এই মধ্যবিত্ত জীবনে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সকল পরিবর্তন—বিশেষ করিয়া পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা এই মধ্যবিত্ত জীবনে একটি যুগান্তকর নাড়া দিয়াছে। সে নাড়ার ভিতরে মরিবার দিকটা যতখানি বড় হইয়া আমাদের চোখে পড়িয়াছে, গড়িবার দিকটা তেমন করিয়া চোখে পড়িতেছে না।

নিজে আমি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মানুষ, সুতরাং নিজেকে দিয়াই সব কথা বিচার করিতেছি। আমাদের বর্তমান কালের হিন্দুধর্মের কথা নানাভাবে মনকে নাড়া দিয়াছে। ইহার পশ্চাতে যত বড় ঐতিহ্য এবং দার্শনিকতত্ত্বই থাক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নিরন্তর আমার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে। একথা

সংস্কারবিহীন ভাবে পদে পদে মনে হইয়াছে, আমাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান সমূহ একটা বলিষ্ঠ জাতি গঠন করিবার পক্ষে কতদিক হইতে কত রকমে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া কত রকমের চেষ্টা চলিয়াছে এই ধর্মের সংস্কারের, কিন্তু এ অচলায়তনের ভিতরে যেন যথোপযুক্ত পরিবর্তন আসিতেছিল না। ঠিক সেই একই কথা সমাজ-ব্যবস্থার দিক দিয়া, একই কথা আর্থিক ব্যবস্থার দিক দিয়া। আশ্চর্য, দেখিয়াছি যেখানে যত আলোচনা করিয়াছি, নিজেদের অন্তঃসার-শূন্যতার কথা, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের একান্ত কৃত্রিমতার কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, পরিবর্তনের কথা পুনর্গঠনের কথা সকলেই মুখে বলিয়াছেন, কিন্তু যেখানে যেটুকু নাড়া দিবার চেষ্টা করা যাইত সেখান হইতেই ক্ষত বিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। এই অষ্টপাশের বন্ধন হইতে জাতির মুক্ত হইবার কোন সুদূর সম্ভাবনাও চোখে পড়িত না। বিজ্ঞজনের নিকটে ধীর মন্থর গতিতে জাতির সংস্কার ও পরিবর্তনের কথা অনেক শুনিয়াছি, যে গতি দেখিয়াছি তাহাতে চলিবার সম্ভাবনা দেখি নাই, ঝিমাইয়া পড়িবার আয়োজনই দেখিয়াছি। এই অষ্টপাশকে খসাইয়া ফেলিবার জন্য একটা প্রবল ধাক্কার প্রয়োজন আছে একথা বহুবার মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি ; তাই এই আঘাতে যতখানি রক্তাক্ত হইয়াছি, ততখানি বিমূঢ় এবং নিরাশ হই নাই।

বড় বড় চিকিৎসকগণের একটি সুন্দর চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়াছি। বহুদিনের পুরাতন রোগীকে ঔষধ দিয়া দিয়া চিকিৎসক নিজেই যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন তিনি রোগীর জন্য এক নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করেন। এই ঔষধের কাজ কোন বিশেষ রোগকে সারান নহে, ইহার কাজ রোগীর স্তিমিত প্রাণ-প্রবাহের ভিতরে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সমগ্র দেহে একটা নূতন স্পন্দনের সৃষ্টি করা। যদি অবশ অঙ্গে একবার

নূতন প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চারিত করা যায় তবেই আশা হয় এখন ঔষধে কাজ করিবে। আমাদের জাতীয় জীবনেও তেমনই একটা তীব্র ক্রিয়াশীল ঔষধের প্রয়োজন ছিল, যে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান করিবে না, সে শুধু সমগ্র জাতিকে নূতন করিয়া প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে; এই প্রাণধর্মের উজ্জীবনের পরেই আসিবে সব সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই দেখিতেছি, আমাদের উপরে ক্রমান্বয়ই আসিতেছে আঘাত—দুর্ভিক্ষের আঘাত, হিংস্র হানাহানির আঘাত, জাতি, ধর্ম, সমাজ হইতে চ্যুত হইয়া জীবন-সংগ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে ছিটকাইয়া পড়িবার আঘাত। এই আঘাতগুলি আসিবার পূর্বেও আমরা বাঁচিয়াছিলাম, কিন্তু সে বাঁচা পরের আওতায় এমনই অনুগৃহীত এবং তৎফলে সঙ্কুচিত বাঁচা যে, সে বাঁচার জন্য আমাদের কোন প্রয়াসের দরকার ছিল না; ধ্বনিহীন, বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন একটা নিরুপদ্রব নিস্তরঙ্গ একটানা বাঁচা। কিন্তু এই আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত জাতীয় জীবনে আর কিছু না হোক, আমরা একটা নূতন বাঁচার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাভ করিয়াছি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সেই বাঁচার কোন সম্ভাবনা নাই; তাই সবদিক হইতে আঘাতও যত ঘন এবং তীব্র হইয়া আসিতেছে, নিজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিবার বাসনাও ততই দুর্জয় হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তি-জীবনের যত অশ্রু রক্ত এবং দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়াই সে আসুক, জাতীয় জীবনে ইহাকেই বরণ করিতে হইবে প্রথম লাভ বলিয়া।

তারপরের লাভ ঐ অচলায়তনের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা নড়া-চড়া আনা। যে মধ্যবিত্ত জীবনের ধারাটিকে কিছুতেই তাহার বহুদিনের খাত হইতে অন্যত্র একটু মাত্রও সরাইয়া দেওয়া যাইতেছিল না, এই কয়েকটি বৎসরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে একটা আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্তনকে এতদিন

আমরা কথায় চাহিয়াছি, শিখান বুলির মতন বহুবার তাহাকে সভায় শোভাযাত্রায় আবৃত্তি করিয়াছি, কিন্তু তাহার বাস্তব রূপের কোন ধারণা ছিল না আমাদের মনের মধ্যে। আমাদের পাখি-সুলভ আবৃত্তির ফলে এই সত্য কোনদিন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিবে না বুঝিয়াই হয়ত রুদ্র বিধাতা তাহাকে এত রূঢ় বাস্তব করিয়াই সহসা আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন।

ছোট দৃষ্টান্ত লইয়া কথা বলা যাক, বড় সত্যকে বুঝিতে বোধহয় তাহাতেই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিবে। একজন গ্রাম্য পুরোহিত ব্রাহ্মণের কথা আমার মনে পড়িতেছে। তিনি শিক্ষাসম্পন্নও নন, সংস্কারসম্পন্নও নন, তেমন বিত্তসম্পন্নও নন, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত দেখিয়াছি, যে-গ্রামে তাঁহার বাস সে-গ্রামের তিনিই মোড়ল; সমাজের বিধিব্যবস্থা পাঁতিপত্র সকলই তাঁহার হাতে। গ্রামের শিক্ষাসম্পন্ন এবং বিত্তসম্পন্ন লোকদিগকেও দেখিতাম, তাঁহারই পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহারই নির্দেশ গ্রহণ করিতেন। আমার মনে সংশয় এবং বিরক্তি ছিল, কারণ আমার বিচারে সমাজের যে স্থান তিনি অধিকার করিয়া আছেন, তিনি নিজে তাহার কোন দিক হইতেই যোগ্য নন; সমাজে তাঁহার যে স্থান তাহা তাঁর জন্মলব্ধ। এই জন্মলব্ধ বিশেষ সুযোগ এবং মর্যাদাকে আমরা আজ সবক্ষেত্রেই অস্বীকার এবং অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিয়াছি, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই রীতিরই প্রাধান্য। তারপরে সেই ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়াছি, তেমন শ্রম কিছুই করেন না; গ্রামে এবং আশেপাশে যে ক' ঘর শিষ্য-যজমান রহিয়াছে তাহাদের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ব্যবস্থা করিয়া এবং আশীর্বাদ বিতরণ করিয়াই বেশ দুধে-মাছে তাঁহার দিন চলিয়া যাইত। শুধু তাহাই নয়, গ্রামে বিপদে-আপদে চড়া সুদে অল্প টাকা সংগ্রহ করিতে হইলেও এইখানেই ছিল তাহার ব্যবস্থা। সমস্ত জিনিসটি কাঁটার মতন আমার

মনে বিঁধিত; যোগ্যতা এবং পরিশ্রম ব্যতীত একটা মধুর উপায়ে সমাজের এই যে শোষণ তাহা বন্ধ করা সমাজের তরফ হইতে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতাম, প্রতিকারের উপায় দেখিতাম না। তাহার 'বামনালী'র প্রতাপে ধর্ম ও জাতির নামে সমাজ-জীবনের ভিতরে যে কতবড় একটা কৃত্রিমতা এবং তাহার ফলে যে কতবড় একটা অসাম্য এবং অবিচার রহিয়াছে তাহাই আমার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আজ একবার পূর্ববঙ্গে গিয়া ঘুরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, এই বামুন ঠাকুর একটু একটু করিয়া সমাজের তাহার ন্যায্য স্থানে কি করিয়া নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি আজ ডাইনে বাঁয়ে নম-মুসলমান লইয়া একই বেঞ্চে কেমন ডাব্বা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে ফুডকমিটির মিটিংএ জমিয়া উঠিয়াছেন, হাটে হাটে কেমন করিয়া তামাক-তেল-গুড় লইয়া ব্যবসা জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি সমস্ত জিনিসটিকে একটি প্রতীকভাবে গ্রহণ করিতে বলিতেছি, তাহা হইলেই বর্তমান বিপর্যয়ের স্বরূপটি বোঝা যাইবে। আজ পূর্ববঙ্গের যত মধ্যবিত্ত হিন্দু ভিটা-মাটি ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বস্তি-জীবন গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই মধ্যবিত্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা কোন হিন্দুরাজত্বের আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। সরকারী বেসরকারী সাহায্যের প্রাচুর্য ইহাদিগকে সমাজের আরও অনেক নিম্নস্তরে নামাইয়া দিবে এবং সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের ভিতরের সক্ষম সম্প্রদায় ইতিমধ্যে মাথা উঁচু করিয়া সমাজের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পশ্চিম বঙ্গের যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই সুযোগে রামরাজত্বের স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিতেছেন তাঁহাদের আশা এবং নেশা ভাঙ্গিতেও খুব বেশী দিন সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত-বিভাগ এবং বঙ্গ-বিভাগের ফলে আমাদের রাষ্ট্রজীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে তাহাকে শুধু একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে না দেখিয়া যদি

সংস্কারমুক্তভাবে দেখিতে শিখি তবে হয়ত স্বীকার করিব, এই জিনিসগুলি আপনাতে আপনি যতই মন্দ হোক, সমগ্র জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে ইহাদের দান হয়ত একেবারে নগণ্য নয়। আমরা সমগ্র জাতিটিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে শুধু রাষ্ট্রে নয়, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম আমাদের সাম্প্রতিক চরম দুঃখ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া সেই সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের সম্ভাবনাই হয়ত আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিপর্যস্ত হিন্দুর সত্যকার সমস্যা কি

বাঙালী-হিন্দুর বর্তমান সম্বন্ধে অনেক মনীষী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা আরও ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক আরও অনেক কারণ থাকিলেও বঙ্গ-বিভাগকেই বাঙালীর ভাগ্যে বিধাতার নিদারুণতম অভিসম্পাত বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে। এই বঙ্গ-বিভাগ এবং তাহার ফলে হিন্দুর ভাগ্য-বিপর্যয়ের একটা সাম্প্রদায়িক রূপ আছে; কিন্তু ইতিহাসের নিরপেক্ষ দ্রষ্টার কাছে ইহার একটি গভীর বিপ্লবাত্মক রূপও রহিয়াছে।

আজ এ-কথাটা সর্বজন-স্বীকৃত না হইলেও বহুজন-স্বীকৃত যে বড় বড় বিপ্লবের মূলীভূত কাবণ থাকে সমাজ-ব্যবস্থার অসাম্যে এবং এই সমাজ-ব্যবস্থার অসাম্যেরও মূল কারণ হইল আর্থিক ব্যবস্থার অসাম্য। আমার মনে হয়, বাঙালী হিন্দুর ক্রম-বিপর্যয়ের ভিতরে বিপ্লবের এই মূল সত্যটি অনেকখানি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে; সেই জন্যই আমাদের বিপর্যয় এবং তাহার পিছনকার অর্থনৈতিক কারণের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী-হিন্দুর বিপর্যয়ের রূপটি খুব স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে; পূর্ববঙ্গে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদেরও বিপর্যয়, পশ্চিমবঙ্গে যাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদেরও বিপর্যয়। এই বিপর্যয় বা বিপ্লবের ভিতরে অর্থনৈতিক কারণের যে কতখানি প্রভাব তাহা সর্বাপেক্ষা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল সেই দিন যে-দিন দলে দলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ সাতপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য কোনও প্রতিবেশী প্রদেশে চলিয়া আসিতেছিল। ইহার ভিতরে একটা অংশ আসিয়াছিল প্রত্যক্ষ দাঙ্গার ফলে; সমূহ

প্রাণনাশের ভয়ে। কিন্তু আর একটি বড় অংশ দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ফলে না হইলেও এদিক-ওদিক চলিয়া গিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। আমি যে বিপ্লবের কথা বলিয়াছি—ইহার সবটা জুড়িয়া সেই বিপ্লবের রূপ। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কারণের সহিত আর্থিক কারণ কিভাবে অঙ্গাঙ্গি-রূপে জড়িত ছিল নিম্নে তাহারই একটি বিস্তৃত চিত্র দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি এখানে বাঙালী হিন্দুর অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার মনে হয় সমগ্র বাঙলা-দেশের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দুর আর্থিক কাঠামোই ইহার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ; সেই কারণেই আমার আরও বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক কারণের সহিত যে অর্থনৈতিক কারণ যুক্ত হইয়া পূর্ববঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে সে বিপ্লবের ঢেউ পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে বিপর্যস্ত করিয়াই শেষ হইবে না, তাহার অগ্রগতি অতি ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। মুখ্যতঃ একটা বিশেষ কালের বিশেষ বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যে-সব তথ্যের আলোচনা করিয়াছি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিক তাহার ভিতরেই গণ-বিপ্লব এবং ইতিহাসের ক্রম-বিবর্তনের কিছু কিছু শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ইতিহাসের আবর্তনে বঙ্গরঙ্গ ভূমির পর্দাটি সরিয়া গেলে সহসা একদিন দেখা গেল, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ; ধূম যেরূপ বহ্নির প্রমাণ, পশ্চিমবঙ্গ—বিশেষতঃ কলিকাতা এবং তাহার শহরতলীর মধুচক্র সকল ঘিরিয়া পূর্ববঙ্গবাসিগণের ক্রমবর্ধমান কল-গুঞ্জনই সেইরূপ এই চাঞ্চল্যের প্রমাণ। অন্তরে যাহার যাহাই থাক না কেন, মুখে আমরা অনেকেই এই চাঞ্চল্য-প্রসূত পলায়নী মনোবৃত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলাম। এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে কেহ কেহ অকারণ ভীরুতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, কেহ কেহ সকারণ অদূরদর্শিতা

বলিয়াছি, কেহ কেহ গড্ডালিকা-মনোবৃত্তি বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছি। কাহারও কাহারও হৃদয়ে আবার এরূপ একটা ভাবও ছিল, 'অ-জাতীয় পরিবেশ' হইতে যাহারা বীরের মতন 'জাতীয় পরিবেশে' চলিয়া আসিতে চায় তাহারা চলিয়া আসুক, যাহারা অপারগ তাহারা আবার বীরের মতন সংগ্রাম করিয়াই পূর্ববঙ্গে সশরীরে অবস্থান করুক! এই গতি এবং স্থিতি উভয় জুড়িয়াই যে একটা অখণ্ড বীরত্ব কি ভাবে অনুস্যূত থাকিতে পারে অজ্ঞ জনসাধারণ সেই গভীর রহস্যটির মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই, ফলে তাহারা পূর্ব-পশ্চিম জুড়িয়া একটি বৃহৎ দোলায় নিরন্তর দুলিয়া দুলিয়া আরামের বদলে শ্রান্তি লাভ করিয়াছে।

গম্ভীর গঙ্গাতীরে বসিয়া পঙ্কিল পদ্মাতীরের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক গবেষণা করিয়াছেন; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয় তবে এই গবেষণা হইতে যে নির্গলিতার্থটি উপদেশ এবং মন্তব্যাদি রূপে প্রকাশিত হইতেছিল তাহাতে পূর্ববঙ্গের পিত্ত-প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত আর বিশেষ তেমন কিছু ঘটিতেছিল না। গভীরমূল ক্ষতের উপরিভাগে অতিশয় উৎসাহসহকারে খানিকটা প্রশান্তিকর প্রলেপ জোরে জোরে ঘষিয়া দিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়, এ ক্ষেত্রেও অনেকখানি সেই জাতীয় ফলই ফলিতেছিল।

বাহির হইতে আমরা অনেকেই মনে করিয়াছি পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের বিপর্যয় পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার ফলে একটা আকস্মিক বিপর্যয় মাত্র; একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হইবার দরুণ সমাজ-জীবন আর্থিক-জীবন এবং রাষ্ট্র-জীবন নিষ্পেষিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া এই আশঙ্কাকে একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই, আশঙ্কার সম্মুখে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ নিজেদের এতখানি অসহায় বোধ করিয়াছিল কেন? সম্ভাবিত বিপদের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইবার

সঙ্কল্প না লইয়া অধিকাংশ লোকই পলায়নের সুযোগ খুঁজিয়াছে কেন? ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে যাঁহারা অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছে তাঁহারা সম্ভাবিত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সাহস পাইল না কেন? এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর মনে আসে তাহাতেই প্রতীতি জন্মে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের জীবনে নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড একটা দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল।

আরও ভাবিবার বিষয় এই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববঙ্গে আনাচে-কানাচে সর্বত্রই যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে হয় না। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, পূর্ববঙ্গের পল্লীর কোন কোন অঞ্চল ঘুরিয়া আমাদের এ কথা মনে হয় নাই যে, পল্লীবাসী হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিবেশিগণের ভিতরে বহুদিনকার সম্বন্ধের এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহাতে একে অপরের বৈরিতাভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে। পূর্বে তাহারা প্রতিবেশী রূপে যেরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত দৈনন্দিন জীবনে জড়িত ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। অনেক সময় শান্তিসভা বা মিলনসভার সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়া মনে হইয়াছে, সভা ডাকিব কাহাদের জন্য? যাহারা দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে অতি সহজভাবেই একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে হঠাৎ নূতন করিয়া মিলন-সভা ডাকিয়া তাহাদের ভিতরে অমিলনটাকে খোঁচাইয়া তুলিয়া লাভ কি? কিন্তু মজা এই, এই সাম্প্রদায়িক মিলন সত্ত্বেও এই সকল সুদূর পল্লী অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসি-গণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দেশত্যাগের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এসব স্থানের অধিবাসিগণের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলে দেখা যাইবে, যাহারা নানা কার্য-ব্যপদেশে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া আস্তানা গাড়িতে পারিয়াছে, লোকে তাহাদিগকে বিধাতার বিশেষ

নির্বাচিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছে; যাহারা আসিয়া ঘাটে মাঠে বাটে তাঁবু খাটাইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছে তাহাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে বাহিরে যেই যত সন্দেহ প্রকাশ করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে অনেকেরই যেন ইহাতেও একটা সায় রহিয়াছে, এবং পারিলে হয়ত তাহারাও এই পথের পথিক হইবে; বাদবাকি যে দল এদিকে আসিতে একেবারেই অক্ষম তাহারা হয় নীরবে নিজদিগকে হতভাগ্য বলিয়া ধিক্কার দিতেছে, নতুবা বড় গলায় গাল পাড়িবার চেষ্টায় আছে। আশা করি বলিয়া দিতে হইবে না যে ইহার সবগুলিই একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতার লক্ষণ।

আমাদের মনে হয়, এই পলায়নী মনোবৃত্তির কারণ সন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আর্থিক জীবনের একটা বিরাট বিপর্যয়। বঙ্গবিভাগ এবং পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা আর্থিক জীবনের সেই বিপর্যয়কেই একটা শোচনীয় পরিণতি দান করিয়াছে; আমরা এই প্রত্যক্ষ নিমিত্তটাকেই একমাত্র হেতুর আসনে বসাইয়া সমস্ত সমস্যার বিচার করিতে বসি।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই আর্থিক বিপর্যয়ের কথা উঠিলেই আমরা একবাক্যে একটি কথা বলিতে শিখিয়াছি—ইহা পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল। আমরা যাহারা আর একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে চাই তাহারা আর একটু পিছনে ফিরিয়া বলি, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী দশ বৎসরের লীগ-শাসনের ফলেই হিন্দুগণের এই আর্থিক বিপর্যয়। কিন্তু আমাদের ব্যাধি এবং তাহার কারণ এত সহজ এবং এত অল্পকালের মনে হয় না। এই আর্থিক বিপর্যয় পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার তিন চারি মাসের ভিতরেই ঘটে নাই—লীগ শাসনের দশ বৎসরের মধ্যেও ঘটে নাই—কোন আকস্মিক রাজনৈতিক কারণেও ঘটে নাই; এই বিপর্যয় ঘটিয়াছে যুগধর্মের ধীরমন্থর আবর্তনে, বিবিধ প্রতিক্রিয়াশীল

সামাজিক শক্তির নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সেই বিপর্যয় ঘটিতেছে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া। জাতীয় জীবনের আবর্তনের ভিতরে যে বিপর্যয়ের বীজ উপ্ত ছিল, গত দশ বৎসরের একটা বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সর্বশেষে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠারূপ একটি একান্ত অপ্রত্যাশিত বিরাট পরিবর্তন সেই বিপর্যয়কে নানাভাবে সাহায্য করিয়া বর্তমান পরিণাত দান করিয়াছে

এই কথাটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। পূর্ববঙ্গের হিন্দু বলিতে এখানে আমরা বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের কথাই বলিতেছি ; আর্থিক জীবনে বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহারাই সর্বাপেক্ষা বেশী—এবং বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গাড়িতেছে মুখ্যতঃ ইহারাই। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক বিপর্যয় ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে বছর পঁচিশেক আগে হইতে—আর তাহাদের বাস্তু-ত্যাগের সমস্যাও আজিকার নয়, ইহাও আরম্ভ হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পূর্ব হইতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আজ আমরা একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সমস্যাটি আজ এত বড় করিয়া চোখে পড়িয়াছে, স্বকীয় ধীরমন্থর রূপে এতদিন সে আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়াই চলিয়াছে। বহুদিনের ধাক্কাটা আজ কেন্দ্রীভূত হইয়া অসহনীয়রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে পাকিস্তানের ধাক্কায়।

পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটি বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই একটা জিনিস চোখে পড়ে, পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ ; এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-সম্পদ্ গড়িয়া ওঠে নাই, এমন কি কোন খনিজ সম্পদ্ও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ (এখানে পূর্ববঙ্গ বলিতে

পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কথাই বলিতেছি)। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানকার অধিবাসিগণের আর্থিক জীবনের বনিয়াদ মুখ্যতঃ কৃষি-সম্পদের উপরে স্থাপিত। কিন্তু যে উপায়-পদ্ধতিতে পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুগণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক সেই উপায়পদ্ধতিতেই তাহারা আস্তে আস্তে ভূমি-সংস্রবহীন হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে গোড়ায়ই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক বনিয়াদে একটা কৃত্রিমতা এবং তাহার ফলে একটা দুর্বলতা দেখা দিল; অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের জাতীয় জীবনের আর্থিক ভিত্তির সহিত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক ভিত্তির যোগ রহিল না। ভূমি-সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায়টি যদি পূর্ববঙ্গে শিল্প-সম্পদ গড়িয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলেও সে পূর্ববঙ্গে শিকড় গজাইতে পারিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, পূর্ববঙ্গের কৃতিগণও তাঁহাদের শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন বা নির্বাচন করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। আর্থিক বনিয়াদ স্ব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকিবার ফলে এই মধ্যবিত্ত জীবনে একটা ভাসিয়া যাইবার প্রবণতা আপনা হইতেই আসিয়া গিয়াছিল।

জমির মালিক হইলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ জমির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অনেকদিন। এখন আমাদের জমির উপরে যাহা মালিকানা-স্বত্ব তাহা শুধু কাগজে-পত্রে, সুতরাং প্রাপ্য যাহা তাহাও আর চর্মচক্ষুর গোচরীভূত কোন পদার্থ নহে, তাহাও নথি-পত্রে। আসলে আমরা জমিকে ভোগ করিবার জন্য যতখানি উৎসাহী ছিলাম জমির সহিত যোগ রক্ষায় ছিলাম ততখানি উদাসীন। যোগবিহীন ভোগের বিরোধটাই মূর্তিমান হইয়া আমাদিগকে দেশের মাটি হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। আমরা অবশ্য আমাদের ছেলেবেলায় দু'এক ঘর তালুকদার দেখিয়াছি যাঁহারা খাসে জমি রাখিতেন এবং বাড়িতে হাল-গরু রাখিতেন; কৃষকগণকে মজুর খাটাইয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে জমি চাষ করাইতেন

এবং নিজেরাই সম্পূর্ণ ফসলের মালিক ছিলেন। বছর পনর পূর্বে এই শ্রেণীটিও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আমরা জমি-জমা হয় বিলিবন্দোবস্ত করিয়া পত্তনি দিয়া 'ভূঁইঞা' হইয়া বসিয়াছি, নতুবা জমাজমি ধান-কড়ারীতে বা বর্গাভাগে চাষ করাই। ফলে আস্তে আস্তে জমির স্বত্ব না হোক—তাহার ভোগস্বত্ব আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যেটা ছিল 'ভূঁইঞা'-তন্ত্র, কালের আবর্তনে তাহাই আজ দেখা দিয়াছে 'ভুয়া'-তন্ত্র রূপে।

এই ভূমি-সংস্রবহীনতার ফলে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের জীবন-যাত্রা মুখ্যতঃ নির্ভর করিত কতকগুলি মধ্যপন্থায় অর্জিত অর্থের বিনিময়ে পরের শ্রম এবং শ্রমজাত দ্রব্যের উপরে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই আয়ের পন্থাগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,—

(ক) সরকারী এবং বে-সরকারী চাকরি। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হইবার পরে বর্ণহিন্দুগণই অগ্রসর হইয়া ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে চাকরির ক্ষেত্রে তাহাদের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার। মুসলমানগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা-সঞ্চারের ফলে আস্তে আস্তে অল্প স্বল্প মুসলমান উচ্চশিক্ষিত হইয়া কিছু কিছু চাকরি অধিকার করিলেও দশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুগণেরই। লীগ-শাসনের আরম্ভ হইতেই এ ক্ষেত্রে ভাঁটা লাগিয়াছে; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মচারী-বিনিময় এই ভাঁটায় দুর্নিবার টান লাগাইয়া মধ্যবিত্ত জীবনের বালুচর জাগাইয়া দিয়াছে।

(খ) জমিদারী ও তালুকদারী। এই প্রথা বর্তমান যুগধর্মেরই বিরোধী; তাই যুগধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রথার বনিয়াদ টলিয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের সরকারই এই জমিদারী ও তালুকদারী প্রথার বিরোধী; কিন্তু এই সরকারী

বিরোধ-নীতির বহু পূর্ব হইতেই জমিদারী-তালুকদারী অনেক ক্ষেত্রে একটা ঋণাত্মক ভারস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিল। বর্তমানে একে জনমত তথা রাষ্ট্রমত জমিদারীর বিরুদ্ধে; তাহার পরে আবার মুসলমান জন-সমাজ বিশেষ করিয়া হিন্দু জমিদার-তালুকদারগণের বিপক্ষে। সুতরাং এই লোকসানের ব্যবসা চলিতেছেও না, কেহ চালাইতে তেমন উৎসাহিতও হইতেছে না।

(গ) এই জমিদারী প্রথাকে অবলম্বন করিয়া অল্প-শিক্ষিত বর্ণ-হিন্দুগণের ভিতরে একদল চাকরিজীবীর সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, ইহারা নায়েব-মুহুরির দল। পল্লী-অঞ্চলে এই শ্রেণীর চাকরিয়াই ছিল খুব বেশী এবং পনর-বিশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করিত এই শ্রেণীর চাকরিজীবিগণের উপরেই। কারণ, যাঁহাদের দেহের দুই পাশে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ চাকরির ডানা গজাইয়াছে তাঁহারা যে একবার উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া তাকান নাই; ফলে এই সকল 'উপ-ভূঁইঞা' বা ক্ষুদে 'কর্তামশাই'র দলই ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যমণি। বেতন ইঁহাদের খুব বেশী ছিল না, ঊর্ধ্বে মাসিক দশ বার টাকা হইতে নিম্নে তিন টাকা পর্যন্ত; কিন্তু তাঁহাদের নির্ভর ছিল বাজে আদায়ের উপরে, যেটার একটা গাল-ভরা ভদ্র নাম ছিল 'উপরি'। সরল এবং অশিক্ষিত প্রজাগণ ভূমি এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল জটিলতা বুঝিতে পারিত না; এই অজ্ঞতার সুযোগে উপরি আদায়ের অনেক ফন্দি-ফিকির বাহির হইয়া পড়িত। ফলে প্রকাশ্য বার্ষিক ছত্রিশ টাকার আয়কে অবলম্বন করিয়াই ছয় সাত জন লোকের একটি পরিবারের গ্রাম্য ভদ্রতা বজায় রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহিত হইত। ইহাদের আর্থিক জীবনের আরও একটু অন্দর মহলে প্রবেশ করিলে আরও তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। প্রতাপান্বিত জমিদারের প্রতাপ-রশ্মি এই সকল ব্যষ্টি-কেন্দ্রের ভিতর দিয়াই প্রজা-সাধারণের

সম্মুখে প্রতিফলিত হইত বলিয়া বাজারে ইহাদের একটা মর্যাদা ছিল, যাহার ইংরেজী নাম হইতেছে 'ক্রেডিট'; উপার্জিত অর্থ ভাঙাইয়া বেশী দিন খাওয়া না চলিলেও উপার্জ্জিত 'ক্রেডিট' ভাঙাইয়া অনেক দিন চলিত। এই 'ক্রেডিটে'র বলেই ইহারা অতি সস্তা দরে ধান-চাউল, ডাল, নারিকেল, লাউ-কুমাড়া প্রভৃতি তরি-তরকারী 'কালে' সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিত, তার পরে মূল্য যখন 'শ্রেয় তখন দেয়'। এই প্রকারের দশরকম টাল-বাহনার ভিতর দিয়াই দিন একরূপ ভালই কাটিয়া যাইত। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ', অতএব মধ্যবিত্ত হিন্দুর একটি বৃহৎ অংশ বৃত্তিহীন।

এই জমিদারী-তালুকদারীকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আরও নানারূপ আয়ের পন্থা ছিল; তাহার সবগুলির উল্লেখ সম্ভব এবং সঙ্গত মনে না হইলেও কতকগুলির উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। যেমন সুদূর গণ্ডগ্রামগুলির হাতুড়ে ডাক্তার-কবিরাজ সম্প্রদায়। বড় বড় জমিদারের কাছারীবাড়িই ছিল ইহাদের আশ্রয়। কাছারীবাড়ির সংলগ্ন থাকাতে স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ তাহাদেরও একটা 'ক্রেডিট' ছিল; আয়টা সর্বদা ঠিক নগদ টাকার ছিল না; এক সপ্তাহের কুইনাইন মিক্চার বা 'জ্বরান্তক বটিকা'র মূল্য তিন সের ধানে বা সাতটি হংসডিম্বেও চলিতে পারিত। এইরূপ মাধুকরী-বৃত্তিতে যে আয় হইত তাহা সঞ্চিত হইলেই একটা উপজীবিকা-পদবাচ্য হইয়া উঠিত। পূর্ববঙ্গ মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের অর্থনীতির কাঠামোটাকে পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই সব জমিদারী-তালুকদারী-পৃষ্ঠপোষিত ডাক্তার-কবিরাজগণের কথা ভুলিলেও চলিবেনা। সমূলে উৎপাটিত বনস্পতির সহিত এই সব ছিন্নমূল ব্রততীর বর্তমান অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

(ঘ) মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের ভিতরে আর একটি সম্প্রদায় ছিল কুসীদজীবী। এই শ্রেণীটি আস্তে আস্তে শিকড় প্রসারিত করিয়াছিল

সমাজের প্রায় সকল স্তরে। সংসারে যেমন এক জাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে যাহারা অতি শিশু অবস্থায়ও যদি একবার কঠিন-প্রস্তর-নির্মিত অট্টালিকাতেও শিকড় গাড়িতে পারে তবে কালে সেই শক্ত সৌধেও ফাটল ধরাইবেই, ঠিক তেমনই ছিল এই কুসীদজীবি-মাহাত্ম্য। বাঙলাদেশের ছোট ছোট তালুকদারগণের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, তাহাদের শুধু শ্রীবৃদ্ধি নয়—তাহাদের উদ্ভবও ছিল এই লগ্নী-কারবারের সাহায্যে। বাঙলাদশের কৃষকগণই ছিল প্রধান খাতক সম্প্রদায় এবং তাহাদের সহিত মহাজনগণের নগদ টাকার লেনদেন চলিত প্রধানতঃ জমাজমির বা ভিটামাটির বন্ধকীতে। এই বন্ধকী জমি বা ভিটামাটি কিছুদিনের ভিতরে সুদের জায়েই হস্তগত হইত। ইহা ব্যতীত জায়সুদী বন্ধকীতেও বেশ একটা তালুকদারী গড়িয়া উঠিত। দেশগাঁয়ে সুদের হার ন্যূনকল্পে টাকা প্রতি মাসিক দু' পয়সা হইতে উর্ধ্বে দু' আনা পর্যন্ত ছিল, সুতরাং পল্লীবৃন্দাবনে টাকার গোপালকে উত্তমর্ণ গৃহ হইতে অধমর্ণ গৃহে একবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই দেখিতে দেখিতে তিনি সুদরূপে কান্তিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারিতেন। ঋণ-সালিসি বোর্ড স্থাপিত হইবার সঙ্গে এই শ্রেণীটির উৎখাত হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) হিন্দুগণের অর্থাগমের আর একটি পন্থা ছিল ছোট খাটো ব্যবসায়। পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ববঙ্গে প্রধানতঃ যানবাহনের অসুবিধা এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের অভাবে বড় ব্যবসা গঠিয়া উঠে নাই। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কাঁচামালগুলির আমদানি-রপ্তানিও কলিকাতার মারফতে। কিন্তু স্থানীয় ছোটখাটো ব্যবসাগুলি হিন্দুদের হাতেই ছিল। কাপড়ের ব্যসায় চাউলের ব্যবসায় অন্যান্য মুদি এবং মনোহারী দ্রব্যসমূহের ব্যবসায় প্রভৃতিতে কিছু কিছু মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলেও এগুলি প্রধানতঃ ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের হাতেই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কিছু গেল দুষ্প্রাপ্য হইয়া, কিছু গেল সরকারী

নিয়ন্ত্রণের ফলে জন-সাধারণের হাত হইতে চলিয়া। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ রহিল না। যেটুকু ব্যবসায় চলিতেছিল তাহার পিছনেও আবার সম্প্রতি লাগিয়াছে সংখ্যাগুরুসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটি-প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অসহযোগের মনোবৃত্তি; ফলে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হইতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে ব্যবসায় চলিতেছে সেখানে হিন্দুগণ দন্তস্ফুট করিতে সক্ষম হইতেছে না। তা ছাড়া কতকগুলি পণ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য এবং নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে হিন্দুগণের কতকগুলি স্বজাতি-ব্যবসায়ও বন্ধ হইতে বসিয়াছে; সূতা অভাবে তাঁতী বা 'যোগীর' তাঁত চলে না, তিল-সরিষা অভাবে তেলীর ঘানি চলে না, মিষ্টির অভাবে ময়রার ব্যবসায় বন্ধ।

(চ) পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের আর কতকগুলি ছিল তথাকথিত 'স্বাধীন ব্যবসায়'। এই ব্যবসায়িগণের ভিতরে ছিলেন উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি। ইঁহাদের ভিতরে উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি সম্বন্ধে দেখিতে পাই, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে এবং মুসলমান জনসমাজের মধ্যে একটা পৃথক্ জাতীয়তাবোধের ক্রম-প্রসারের ফলে বিশেষ প্রচার-প্রচেষ্টা ব্যতীতই একটা আর্থিক বর্জন-নীতি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে এই শ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় ইতিমধ্যে বানচাল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কতকটা সঙ্গতিসম্পন্ন অধিকাংশ পূর্ববঙ্গবাসীর অপসারণের ফলে, কতকটা হিন্দু-সংস্কৃতির বিলোপের ভয়ে এবং কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া পলাইতেছে; অতএব স্কুল-কলেজগুলির এবং সেই সঙ্গে অধ্যাপক-শিক্ষক-শ্রেণীর দুরবস্থা অনিবার্য। যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁহারা স্বভাবতঃই গরিব; স্কুলের স্বল্প বেতনের উপরে নির্ভর করা তাঁহাদের কোন দিনই পোষাইত না। গ্রামাঞ্চলে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার

উর্ধ্বে শিক্ষকের বেতন খুব কম। সুতরাং ইঁহাদেরও একটি 'পার্শ্ববৃত্তি' ছিল—ইহা গৃহ-শিক্ষকতা। সঙ্গতিসম্পন্ন গ্রামবাসিগণ নিজেরা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে গ্রাম ছাড়িয়া না আসিলেও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইয়াছেন, সুতরাং গরিব শিক্ষকগণও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন।

মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজের আর্থিক জীবনের আরও পরিপূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে সমাজ-ব্যবস্থার আরও খুঁটিনাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। উপরে-যে সকল অর্থাগম-পন্থার আলোচনা করা হইল ইহা ব্যতীত নানা শ্রেণীর হিন্দুগণের ভিতরে কতকগুলি স্বজাতিবৃত্তি তদবলম্বনে অর্থাগমের উপায় ছিল। যেমন, কুমার, নট্ট, ধোপা, নাপিত, ভূঁইমালী, মালাকর প্রভৃতি। ইহাদের আর্থিক জীবন আবার প্রায় সম্পূর্ণই আবর্তিত হইত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া। হিন্দুগণের বারমাসের তেরপার্বণ ধর্মব্যবস্থা হইতে সমাজব্যবস্থার সহিতই বেশীভাবে জড়িত। এই বার-মাসের তেরপার্বণ, এবং জন্মোৎসব, বিবিধ সংস্করণ-অনুষ্ঠান (অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন প্রভৃতি), বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি এবং ইহা ব্যতীত গৃহপ্রবেশ, বৃক্ষ-রোপণ, বৃক্ষ-বিবাহ, পুষ্করিণী-অভিষেক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের অর্জিত অর্থ উপরি-উক্ত স্বব্যবসায়-নিষ্ঠ জাতিগুলির ভিতরে বণ্টিত হইত। আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবনে এই শ্রেণী সমূহ একান্ত অপরিহার্য নহে ; কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও পল্লীর সমাজ-জীবনের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে কুমার প্রতিমা এবং ঘট-সরা প্রভৃতি না দিলে যেমন চলিত না, তেমনি একজন নট্ট আসিয়া ঢোল না বাজাইলে উৎসব-অনুষ্ঠানের শুধু অসৌষ্ঠব হইত না, একেবারে শাস্ত্রবিরোধী অঙ্গহানী ঘটিত। আমার একদিনের একটি ঘটনা মনে আছে—সেদিন মালাকর শোলার টোপর দিয়া যায় নাই বলিয়া এক বর বিবাহের জন্য যাত্রাই করিতে পারে নাই ; গভীর

রাত্রে সেই টোপরের ব্যবস্থা করিয়া তবে যাত্রার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা নগদ পয়সায় কাজ করিত কম, ইহাদের অনেকেরই জায়গীর বা চাকরাণ ছিল। এই জায়গীর ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ইহাদের কাজ-কর্মের বিনিময়ে ইহারা যথেষ্ট 'ভেট' বা 'সিধা' এবং ইনাম-বকশিস পাইত। এই 'সিধা' জিনিসটি খুব নগণ্য জিনিস ছিল না ; তাহাতে চা'ল-ডাল, তেল-নুন-লঙ্কা, তরি-তরকারী, নারিকেল মিষ্টি প্রভৃতির প্রকারভেদ বা পরিমাণ কিছু কম ছিল না। এই 'ভেট' বা 'সিধা' যে কালেভদ্রেই প্রাপ্য ছিল তাহা নহে, এই প্রাপ্তিযোগের উপলক্ষ ছিল প্রায় হামেশাই। মোটের উপরে এই মধ্যবিত্তকে অবলম্বন করিয়া আর তাহারই সঙ্গে আর একটু এটাসেটা যোগ করিয়াই এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এতদিন স্বজাতি ব্যবসায় অবলম্বনে বাঁচিয়া ছিল। মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতি হয় স্ব-ব্যবসায়চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। আমার পরিচিত পূর্ববঙ্গের বহু নাপিতকে কলিকাতায় 'সেলুন' স্থাপন করিতে বা রাস্তায় আস্তানা করিয়া ব্যবসায় চালাইতে দেখিয়াছি, বহু ধোপাকে কলিকাতায় আসিয়া 'ডাইং ক্লিনিং'-এর ব্যবসা খুলিতে দেখিয়াছি।

এই জাতীয় ব্যবসায়ের কথা যখন আলোচনাই করিতেছি তখন আর এক উপ-ব্যবসায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইতে পারে,—ইহা গুরু-পুরোহিতগিরি। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও এই ব্যবসায় বেশ অর্থকরী ছিল ; ব্যবসায়ীর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। পাঁচ-সাত ঘর শিষ্য-যজমানকে অবলম্বন করিয়াই একটি গুরু-পুরোহিত পরিবার বাঁচিয়া থাকিত। আমাদের ক্রিয়াকাণ্ড এবং জাঁকজমকযুক্ত ধর্মানুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্মের সম্পর্ক একান্ত গৌণ ; ওগুলি 'ভূঁইঞা'-তন্ত্রেরই বহির্বিকাশ। বহির্বাটির চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির বা আটচালা ঘর

যজমানের একটি সামাজিক মর্যাদাই সূচিত করিত। তাই দেখিতে পাই, সমাজ-জীবনের সেই মর্যাদা রক্ষা করিয়া সেই বিশেষ স্তরে অবস্থান করিবার জন্যই বাস্তব জীবনের অন্তঃসারশূন্য হইয়াও প্রাণপণে মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ সেই সকল পাল-পার্বণ এবং ক্রিয়াকাণ্ডকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। যে লোক দু'বেলা অন্নসংস্থান করিতে পারে না, সেও কিছুতেই বৎসরান্তের দোল-দুর্গোৎসবকে বাদ দিতে রাজী নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই 'ভূঁইঞা'-তন্ত্রের সমাধি ঘটিয়াছে—তাহারই সঙ্গে সহমরণে যাইতে হইতেছে গুরু-পুরোহিতগিরিকেও। এই সব দোল-দুর্গোৎসবের কথা ছাড়িয়াই দিলাম; মেয়েদের ব্রতবিধানেও প্রাপ্তিযোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। দৈনন্দিন শালগ্রাম পূজায় নিযুক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণও দশ বাড়ি হইতে দিন দশ সের চা'ল যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আতপ চা'ল কাঁচকলাও শুধু দুর্মূল্য নয় দুষ্প্রাপ্যও হইয়া উঠিয়াছে, বহুক্ষেত্রে শালগ্রাম-শিলাও চুরি হইয়া গিয়াছে।

আশা করি উপরের আলোচনা হইতে মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যাইবে। এই চিত্রের পটভূমিকার উপরে যোগ করুন গত কিছু দিন ধরিয়া মণপ্রতি চল্লিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা চাউলের মূল্য। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কেন বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে—এবং আরও পশ্চিমে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।

ধান-চাউলের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের কথাও উঠিবে। তাহাদের ভিতরে সকলেই চাষী নয়, সুতরাং সকলের ঘরেই খাদ্যদ্রব্য কিংবা ধান-পাটের নগদ টাকা নাই। সকলেই কিছু চাকুরিও পায় নাই, কণ্ট্রোলের শুক্লবাজার এবং কৃষ্ণবাজারে সকলেই কিছু সমান স্ফীতি-লাভও ঘটে নাই। মুসলমান এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ভিতরে ভূমিহীন এবং চাকুরিহীন লোক যথেষ্ট আছে।

তাহাদিগকে ছাড়িয়া আর্থিক বিপর্যয়ের এবং দুর্ভিক্ষের চাপ সবটাই গিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের ঘাড়ে পড়িতেছে কেন ?

ইহার জবাব এই, ভূমিহীন অশিক্ষিত মুসলমান ও নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুরা এখন পর্যন্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারে, আর গত যুদ্ধের পর হইতে খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও যেরূপ উত্তরোত্তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কায়িক শ্রমের মূল্যও তেমনই বাড়িয়া গিয়াছে ; ইহার ফলে এই-জাতীয় বিত্তহীন শ্রমিকদের ভিতরে একটা আর্থিক সামঞ্জস্য আপনা আপনিই আসিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া এই শ্রেণীর লোকেরা ধান-পাট জন্মাইতে না পারিলেও ফল-মূল, তরি-তরকারী, শাক-সব্জী প্রভৃতি অল্প-বিস্তর উৎপন্ন করিতে পারে, মাছ ধরিতে পারে, গোরু-পাঁঠা-ছাগল পুষিতে পারে, হাঁস-মুরগী পালিতে পারে ; এই সকলের দ্বারা সে নিজের প্রয়োজনও মিটাইতে পারে, অবার আবশ্যক অনুযায়ী বিক্রি করিয়া কিছু কিছু অর্থলাভও করিতে পারে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে চরম দুর্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ভূমিহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং স্বল্প উৎপাদনকারীর দল। তাহার কারণ ছিল এই—প্রধান খাদ্য চাউলের দাম হঠাৎ যখন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তখন ফল-মূল, তরি-তরকারী, মাছ-দুধ, মাংস-ডিম প্রভৃতির মূল্য ঠিক সমান অনুপাতে বাড়িয়া যাইতে পারে নাই ; গ্রাম্য দিন-মজুরগণের শ্রমের মূল্যও অনুরূপ ভাবে বর্ধিত হয় নাই। এই আথিক অসঙ্গতিই এই শ্রেণীর জনসাধারণের চরম দুর্গতির প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের ভিতরে একটু একটু করিয়া এই অসঙ্গতি অনেকখানি দূর হইয়াছে। তথ্য-সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে, আজকাল পল্লী অঞ্চলে চাউলের দাম যখন যতগুণ বৃদ্ধি পায় অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য এবং মাছ-মাংস, দুধ-ডিম প্রভৃতির মূল্যও প্রায় অনুপাতিক সমতা রক্ষা করিয়াই বৃদ্ধি পায়। জন-মজুরের পারিশ্রমিকও

অনুরূপ ভাবেই বাড়িয়াছে। আমাদের গ্রামে যখন চাউলের দর চল্লিশ টাকা, অর্থাৎ স্বাভাবিক মূল্যের প্রায় আট গুণ বেশি হইয়াছে, তখন দেখিয়াছি আমাদের বাড়ি হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী স্টীমার স্টেশন পর্যন্ত নৌকাপথে ভাড়া লাগিয়াছে পাঁচ আনার স্থলে আড়াই টাকা। সুতরাং মোটের উপরে এই সব ভূমিহীন জন-মজুরদের অবস্থায় কোন উন্নতি না হইলেও বিশেষ কোন অবনতিও ঘটে নাই। কিন্তু একজন স্কুল-শিক্ষকের কথা ভাবিয়া দেখুন। সাত-আট বৎসর পূর্বে গ্রাম্য স্কুলের জন্য বি-এ পাশ একজন শিক্ষক পঁচিশ টাকাতেই পাওয়া যাইত; এখন সেখানে না হয় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। আর এই যে আর্থিক অসমঞ্জস বৃত্তি তাহাও তাহার কবল হইতে সবই খসিয়া পড়িতেছে।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে আর্থিক জীবনে পূর্ববঙ্গে হিন্দুগণ একটু একটু করিয়া কিরূপে শিথিলমূল হইয়া পড়িয়াছে। বাহির হইতে সকলেই তাহাদিগকে যতই সাহস অবলম্বন করিতে বলিয়াছে, তাহারা ততই যে কেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এইখানে তাহার মূল কারণের হদিস পাওয়া যাইবে। হিন্দুদের পদ্মাতীরে বহুদিন পূর্ব হইতে ভাঙন ধরিয়াছে, সেই ভাঙনে চড়া পড়িয়াছে গঙ্গাতীরে; এবং তাহারই ফলে 'বালিগঞ্জে' পূর্ববঙ্গবাসীদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা এই ভাঙনকে আগে কোন দিনই ঠেকাইতে চেষ্টা করি নাই; আজ যখন শেষ ভাঙনের ধাক্কা আসিয়াছে তখন আমরা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি।

অনেক দিন ধরিয়া আস্তে আস্তে যে গাছের মূলের মাটি ক্ষয় হইয়া শিকড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, প্রবল বাত্যায় সে যেমন তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং বহুবিস্তৃত শাখাবাহু সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ এগুলির দরুন বাতাসের ঝাপটাটাই আসিয়া বেশি লাগে, বিপর্যস্ত আর্থিক জীবন এবং শিথিলমূল সমাজ-জীবনের উপরে একটা

প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার ঝড় আসিয়া সেই ভাবেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে আঘাত করিতেছে; কাণ্ডের প্রকাণ্ডত্ব এবং শাখাবাহুর বহুবিস্তার তাহাকে আরও অসহায় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এখন বিপদ যে শুধু মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুরই তাহা নহে; আর্থিক সমস্যার সহিত একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা জড়িত হইয়া পড়িবার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বিপদ সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়েরই। মধ্যবিত্ত হিন্দুসকল দেশ-ত্যাগী হইলে কৃষক এবং শ্রমিক হিন্দুগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেও হিন্দুসমাজের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে অত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু প্রতিকার কোন্ পথে? বাস্তুত্যাগ এবং দেশত্যাগকেই একমাত্র পন্থা মনে করিয়া সেই দিকেই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ সমাধান বলিয়া মনে হইতেছে আসলে সেটা তত সহজ নহে। প্রথমেই আসে নিজের দেশ-গ্রাম বাড়িঘর পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনকে অবলম্বন করিয়া একটা ভাব-প্রবণতার কথা; কিন্তু এই রূঢ় বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভিতরে হয়ত এই ভাব-প্রবণতা থই পাইবে না। তা ছাড়া এ কথাও সত্য যে মানুষের প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তি তাহার সুকুমার হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল।

কিন্তু সেই প্রাণরক্ষার দিক হইতেই ভাবিয়া দেখিলেও উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের সওয়া কোটি হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করিবার সম্ভাব্যতা কতদূর প্রথমে সে প্রশ্ন আসে। দ্বিতীয়তঃ মনে রাখা উচিত, বহু বৎসর যাবৎ মাটি হইতে রস সংগ্রহ ও আলো-বায়ু অবলম্বন করিয়া যে গাছ বর্ধিত হইয়াছে তাহার শিথিল মূলে নূতন মাটি ও উপজীব্য প্রদান করিয়া তাহাকে সজীব রাখা যেরূপ সহজ, তাহাকে উপড়াইয়া লইয়া নূতন মাটিতে স্থাপন করিয়া রক্ষা করা তত সহজ নহে।

সর্বোপরি আর একটা কথা মনে রাখা উচিত, আমরা যে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রার ধারাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে পলাইয়া আসিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গেও তাহা বেশী দিনের জন্য নিরাপদ নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যবিত্তের এই বিপদ শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে ধীরে ধীরে যুগধর্মের আবর্তনে, বহু বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সামাজিক-শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুপ্রধান্যমূলক রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে তাহারও এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রাকে আর বেশী দিন জীয়াইয়া রাগিবার সাধ্য নাই। কৃষির মূল্য এবং শ্রমের মূল্য সর্বত্রই বাড়িয়া যাইবে; আয়ের মধ্যপন্থাগুলিও ক্রমে লোপ পাইবে; তখন আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে পূর্ববঙ্গে ঠিক সেই সমস্যাই আবার দু'দিন পরে আসিয়া দেখা দিবে পশ্চিমবঙ্গে। পলাইয়া পলাইয়া এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিকে রক্ষা করার স্থান হইবে না হয়ত কোন রাষ্ট্রেই।

তাই সমস্যার সমাধানের জন্য চাই আমাদের মনোবৃত্তির এবং তৎসঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার অনেকখানি পরিবর্তন। নূতন যুগের নূতন ধর্ম তাহার চারিদিকে যে সমস্যা লইয়া অসিতেছে পুরনো যুগের মনোভাব লইয়া আমরা কিছুতেই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিব না। নূতন যুগে ভূমির সহিত সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করিতে হইবে, শ্রমের মূল্যকে নূতন করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং সর্বদা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরের শ্রমকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আদর্শ এবং অভ্যাসকে বদলাইতে হইবে। এই সব কথা শুনিয়া হয়ত অনেকের মনেই আশঙ্কার সঞ্চার হইতেছে যে এখন উপদেশ দেওয়া হইবে, সবাই সকল শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতি ছাড়িয়া মাঠে নাম, অথবা হাতিয়ার লইয়া জন-মজুর বা কুলি-মজুর হইতে আরম্ভ কর! এই আশঙ্কাটাই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিজাত। কৃষি শিল্প বা অন্যান্য শ্রমবৃত্তি গ্রহণ করিতে

হইলেই যে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার-সংস্কৃতিকে বর্জন করিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মনোবৃত্তি পরিহার্য। কৃষি-শিল্পের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোথাও কোন বিরোধ নাই, বরঞ্চ একে অন্যের পরিপোষক এইটাই ত নূতন যুগের বাণী। কিন্তু আশ্চর্য এই, যাঁহারা উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের পর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন তাঁহারাও খাঁটি মাটির সংস্রবে আসিতে চান না, সরকারী কৃষিবিভাগে চাকুরি খুঁজিয়া বেড়ান; যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মৎস্যের চাষ শিখিয়া আসেন, তিনি আসিয়া চাকুরি খোঁজেন, যিনি উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শেখেন তিনিও চাহেন বন-বিভাগে একটা চাকুরি। এইরূপ আমাদের সর্বক্ষেত্রে। আমরা আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের সৌকার্যার্থে মানব-সমাজের ভিতর একটা অজ্ঞ-অশিক্ষিত শ্রেণী পৃথক্ করিয়া রাখিতে চাই—আমাদের মতলব, তাহাদেরই স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আমরা বরাবর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিব এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিব; জগতের নববিধান এই কুব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে যে একেবারেই নারাজ, এ কথাটাকে এখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে। একথা বুঝিবার প্রয়োজন শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের নহে, সমানভাবে মুসলমানগণেরও, কারণ মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি শুধু হিন্দুর ব্যাধি নয়, মুসলমান সমাজকেও তাহা হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই আক্রমণ করিয়া বসিবে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা উচিত, নবযুগের জীবনে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শুধু আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেই চলিবে না, সমাজ-ব্যবস্থারও অনুরূপ পরিবর্তন এবং সংস্কারের প্রয়োজন। বর্তমানে বর্ণহিন্দু বলিতে যে একটা সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার অনেক বিধান যে আধুনিক জীবনের বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তাহার ভিতরকার এমন অনেক বিধান আমরা নির্বিরোধে মানিয়া চলিতেছি যাহা সাধারণ মানবতারই পরিপন্থী, একথা এখন আমরা বুঝি, কিন্তু প্রকাশ্যে

স্বীকার করিতেছি না। সমাজ-ব্যবস্থার এই কৃত্রিমতা আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে নিরন্তর দুর্বল করিয়া দিতেছে। তাই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রথমে চাই আত্মশুদ্ধি। তাহাতে সমস্যার সম্যক সমাধান হইবে কি না বলিতে না পারিলেও ইহা বলা যায় যে সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখে জীবন-সংগ্রামে আমরা সবল হইয়া উঠিব,—এবং সকলেরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজেরাই বাঁচার মত বাঁচিব।

করিম চাচার মন্ত্র

পৌষের শেষ রাত্রি। ছোট্ট চৌচালা টিনের ঘর। কোণে একটা খেজুর গাছ—আর ঝাড়-বাঁধা কলাগাছ, সুপারীগাছ, নারিকেলগাছ। সারা রাত ধরিয়া হিম পড়িয়াছে; সন্ধ্যা হইতে না হইতেই, গাছের পাতা শিশিরে ভিজিয়া উঠিয়াছে, আর ভিজা পাতা হইতে বিন্দু বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িয়াছে টিনের চালার উপরে—টুপ্ টুপ্ টুপ্।

পল্লীর অন্ধকার শীতের রাত্রি—এক একটি যেন ব্রহ্মার নিদ্রিত কল্প—এক একটি নোতুন সৃষ্টির পূর্বে যেন সুপ্তচরাচর প্রকৃতির লুপ্তরূপ গহন-গম্ভীর শ্যামা মূর্তি। সূর্য ডুবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এই গাঢ় শ্যাম আবরণ, শিশির ঝরিয়া ঝরিয়া ভরিয়া দেয় যেখানে যেটুকু ছিল ফাঁক; তারপরে কেমন একটা জমাটবাঁধা অন্ধকার—সকল ঢাকিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দেয়।

যে কয়েকটি মাটির প্রদীপ, কেরোসিনের ডিবি আর লণ্ঠন জ্বলিয়াছিল চারিদিকের গাছে ঢাকা কুঁড়েগুলির এখানে সেখানে, আস্তে আস্তে তাহারা নিভিয়া আসিল। আস্তে আস্তে মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম বিছানায়। ঘুমে চোখ একটু একটু আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে—আর দীপগুলির মতন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে চেতনা; সেই অর্ধচেতন আবেশের ভিতরে শিশির-কণা ঝরিয়া পড়িতেছিল—টুপ্ টুপ্ টুপ্।

শেষ রাত্রির ভাঙা ভাঙা ঘুমের উপর আবার ঝরিয়া পড়িতেছে সেই খেজুর-সুপারী-নারিকেলের পাতাঝরা শিশিরের ভিজা শব্দ—টুপ্ টুপ্ টুপ্। কিছু আগেই প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল একটা কাকের ডাকে; অন্ধকার এবং নিস্তব্ধতার যবনিকা ভেদ করিয়া কা কা করিতে করিতে

উত্তরের ঘন-বিন্যস্ত জাম-তেঁতুলের ঝোপ হইতে দক্ষিণের নুইয়া-পড়া বাঁশবনের উপর দিয়া আকাশে উড়িয়া চলিতেছিল—যেন সৃষ্টির উড়িয়া চলা প্রথম ধ্বনিময় স্পন্দনটি।

মোড় ফিরিয়া গায়ে আরও বেশী করিয়া লেপ জড়াইয়া শুইলাম—অর্ধ-নিমীলিত চেতনাকে আর্দ্র করিয়া দিতেছে সেই টুপ্ টুপ্ শব্দ: এমন সময় কানে দূর হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল পূবের দীর্ঘ শ্যামল মাঠ পার হইয়া আসা আজানের সুর। কিছুটা কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে, কিছুটা পৌঁছিতেছে না—যাহা কানে পৌঁছিতেছে তাহার কিছুটা শুনিতেছি—কিছুটা শুনিতেছি না; যাহা শুনিতেছি তাহার কিছুটা পশ্চিমের আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে—কিছুটা আমার অর্ধোন্মেষিত চেতনার ভিতরে ঐ ভিজা টুপ্ টুপ্ শব্দের সহিত জড়াইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। চোখ মেলিতে ইচ্ছা করিত না—সমস্ত দেহ-মনে ঐ সুরটিকে জড়াইয়া লইয়া কেমন অনড়ভাবে পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল।

সকাল বেলা এমন করিয়া আজানের সুর দিত করিম 'সিউলি'। যাহারা খেজুরগাছ কাটিয়া রস নামায় তাহাদিগকে আমরা বলিতাম 'সিউলি'; কেন যে বলিতাম তাহার তাৎপর্য এখন পর্যন্তও ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এই সুর শুনিবার আধ ঘণ্টা পরেই করিম সিউলির সহিত চারিচক্ষের মিলন হইত,—সে আসিত আমাদের ঘরের কোণে খেজুর গাছটি হইতে রস নামাইতে। বয়সে প্রায় সত্তর ছুঁইতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনও মেরুদণ্ড টান করিয়া চলে। সাদায়-কালোয় মিশানো পাতলা দাঁড়ি, আধ-ফর্সা লম্বা-সরু মানুষটি—সর্বদাই একটা ব্যস্ত-সমস্ত ভাব; কিন্তু এই শীতকালের সকালে এক খেজুর গাছ হইতে রস নামানো ছাড়া আর অন্য অকর্ম ব্যতীত কর্ম করিতে তাহাকে কদাচিৎ কেহ দেখিয়াছে।

খোঁজ লইয়া প্রথম যেদিন জানিতে পারিয়াছি, শেষ রাত্রের সেই আজানের সুর ভাসিয়া আসে এই করিম সিউলিরই কণ্ঠ হইতে সেদিন বিস্মিত হইয়াছি ; সে বিস্ময় মনে কোনও অপ্রত্যাশিত আঘাত সৃষ্টি করে নাই, করিয়াছে অপার মহিমা সৃষ্টি—সুরের মহিমায় নিজেকে গভীরভাবে নিমজ্জিত অনুভব করিয়াছি। সেই একটা নোঙ্‌রা গোয়াল ঘরের পাশে ভাঙা দরগা,—তাহার এক কোণ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে যে আজানের সুর—সে কত লাউ-শিমের মাচার উপর দিয়া, ঘন বাঁশবনের নিবিড়তা ভেদ করিয়া, খোলা মাঠের ভিজা কলাই-মুসুরীর শ্যামকুঞ্চিত গুচ্ছগুলিকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া আমার দেহমনের সহিত নিবিড় আনন্দে জড়াইয়া যাইতেছে—আমার অন্তরের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে !

ভারী মজার মানুষ ছিল এই করিম মিঞা। সকালবেলা সে যখন খেজুর গাছ কাটিবার সকল উপকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হন্ হন্ শব্দে আসিয়া দেখা দিত তখন তাহাকে খেজুর গাছ কাটিবার সিউলি না বলিয়া আদিম কালের কোনও এক প্রসিদ্ধ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিরূপে বর্ণনা করিলেও আপত্তি করিবার তেমন কোনও কারণ ছিল না। তাহার মাজায় জড়ান একটি এক ইঞ্চি ব্যাসের পাটের লম্বা দড়ি, তাহা দিয়াই সে গাছ কাটিবার কালে নিজেকে গাছের সহিত নিবিড় বন্ধনে যুক্ত করিয়া লয়। পিছনে বাঁধা পাঁঠার চামড়া দিয়া নিজের হাতে তৈয়ারী প্রকাণ্ড একটি ব্যাগ ; তাহার ভিতরে ছোট বড় মাঝারি, তীক্ষ্ম, অর্ধতীক্ষ্ম এবং ভোঁতা, কত প্রকস্তের যে দা-কাটারি ছিল, কত রকমের যে ছুঁচলো, চ্যাপটা বাঁশের ছোট ছোট গোঁজ ছিল, তাহা বিধাতা-পুরুষ ব্যতীত অন্যে বিশেষ কিছু জানিত না। বড় বড় অধ্যাপকের গৃহে অনেক সময় যেমন ছোট বড় মাঝারি, পাতলা এবং ওজনে ভারী স্তূপীকৃত বিবিধ প্রকারের বই পাওয়া যায়, যাহাদের কয়েকখানি ব্যতীত

অপরগুলির ব্যবহার কচিৎ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, কারম সিউলির ব্যাগের ভিতরে এই জাতীয় উপকরণের আধিক্যই বোধ হয় বেশী থাকিত। ব্যাগের পাশে একটি বাঁশের বা কাঠের ছোট আঁকশির মত বাঁধা থাকিত; তাহাতে ঝুলান থাকিত অন্ততঃ পাঁচটা ছোট বড় হাঁড়ি-কলসী যাহার একটি কি দুইটিই তাহার ব্যবহারে লাগিত। সব জড়াইয়া হাটিবার কালে মস্‌মস্‌ টুংটাং শব্দের দ্বারা সে তাহার আগমনী সংবাদ ঘোষণা করিতে করিতে চলিত।

জাতি-ধর্ম এবং বয়স নির্বিশেষে করিম সিউলির সহিত গ্রামের একটি সহজ 'চাচা' সম্বন্ধ রহিয়াছে। চাচা স্বভাবেই বড় গল্পধর্মী পুরুষ। ফলে কাজের লোকেরা বহু সময়ই চাচাকে এড়াইয়া চলিত, অপারগ পক্ষে বিরক্তি প্রকাশ করিত। গ্রাম্য জীবনের অকাজের দীর্ঘ ফাঁকগুলি ভরিয়া তুলিবার যাহাদের অন্য উপায় ছিল না, তাহারা দূর হইতে চাচাকে দাওয়ায় ডাকিয়া আনিয়া তামাক দিত। বুদ্ধির গোড়ায় ধূঁয়া লাগাইয়া চাচা একবার গল্প জমাইয়া বসিলে কালও নিরবধি হইয়া উঠিত, আর পৃথ্বীও যেন বিপুলা রূপ ধারণ করিতেন।

গল্পের মধ্যে কয়েকটিকে বলা যায় চাচার রীতিমত রেজেষ্টারীকৃত পেটেণ্ট! এগুলি প্রয়োজন ছিল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, আর তাহার উপাদান এবং সেই উপাদানের বিন্যাস ছিল এমনভাবেই বিশেষ যে, এক করিম চাচা ব্যতীত অন্য কাহারও এগুলির উপরে কোনও অধিকার ছিল না।

করিম চাচার কথা আসিয়া পড়িলে কয়েকটি গল্প অতি প্রাসঙ্গিক-ভাবেই আসিয়া পড়ে। ইহাদের ভিতরে একটি হইল স্থানীয় হাট হইতে ধান ক্রয় সম্বন্ধে; আর দ্বিতীয় গল্পগুলি হইল গৃহ-নির্মাণ প্রসঙ্গে। প্রথম গল্পটির ভাবার্থ হইল, করিম চাচার বয়সের কালে ধানের দর অসম্ভব রূপে সস্তা ছিল। এই সত্যটিকে প্রকাশ করিবার তাহার একটি শিল্পিজনোচিত

ভঙ্গি ছিল। হাট করিয়া বাড়ি-ফিরিবার পথে কাহাকেও ধান মাথায় করিয়া বাড়ি ফিরিতে দেখিলেই দূর হইতে সে ডাকিয়া ধানের দর জিজ্ঞাসা করিত; এই ধানের মূল্য জিজ্ঞাসা আসলে কোনও 'জিজ্ঞাসা' নহে, এটা ছিল তাহার একটি বিশেষ গল্প-বিবক্ষার ভূমিকা মাত্র। ধানের দর যে-ই যেদিন যাহা বলুক না কেন, শুনিবামাত্রই অকস্মাৎ কোনও সর্বনাশ-সংবাদ শুনিবার মতন একটা ভাব করিয়া চাচা শিরে করাঘাত হানিত এবং তাহার পরই আনুষঙ্গিকভাবে তাহার গল্পটি জুড়িয়া দিত। গল্পটি হইল এই, করিম মিঞার ছেলেবেলায় তাহার পিতা একটি টাকা দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল হাটে ধান কিনিতে। হাটে গিয়া এক টাকার ধান কিনিয়া করিম মিঞা আর বাড়িতে ফিরিল না; তাহার ডাইনে-বামে, সম্মুখে-পিছনে আশ-পাশের গ্রামগুলিতে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল সকলকেই সে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিল। সংবাদ পাইয়া সকলের হাটে পৌঁছিতে রাত প্রায় দ্বিপ্রহর ঘটিয়া গিয়াছিল; সেই দ্বিপ্রহর রাতে সমবেত পঞ্চাশ-ষাট জন লোক মিলিয়া সেই এক টাকায় ক্রীত ধান মাথায় করিয়া বাড়ি আনিল।

গৃহ-নির্মাণ প্রসঙ্গের গল্প দুইটির একটি হইল,—শৈশবে করিম মিঞা একবার কুটুম বাড়ি গিয়াছিল। কুটুমেরা যত্ন করিয়া খাইতে দিয়াছিল একখানি খড়ের ঘরে, খড়ের ছাউনীর নীচে ছিল আস্ত আস্ত বাঁশের সরঞ্জাম। খাইতে বসিয়া করিম মিঞা বলিল,—'অল্প জলে কই মাছের লেজ নাড়ার শব্দ পাইতেছি!' কুটুমেরা বিস্মিত হইয়া বলিল,—'না, ঘরে ত আজ কই মাছ নাই!' করিম মিঞা বলিল, আছে বই কি, আলবৎ আছে।' খানিকক্ষণ আবার কান পাতিয়া থাকিয়া মিঞা বলিল, 'ওই মোটা মোটা বাঁশগুলি দুই একটা নামাও ত!' বাঁশ নামান হইল, দুই একটা ফাড়া হইল, এবং সত্যই তাহার ভিতর হইতে এক বিঘৎ পরিমাণ লম্বা চারপাঁচটি কই মাছ বাহির হইল। ব্যাপারটা দেখিতে

শুনিতে যে পরিমাণ অদ্ভুত, এবিষয়ে করিম চাচা প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি সেই পরিমাণেই সহজ। গৃহ-নির্মাণের পূর্বে বাঁশগুলি কাটিয়া কাদা জলে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। রৌদ্রতপ্ত বাঁশগুলির ভিতরে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাটল ছিল। এই ফাটলকে অবলম্বন করিয়াই জল এবং তৎসহ মৎস্য ডিম্ব ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, ও গৃহে ব্যবহৃত বংশদণ্ডের ভিতরে থাকিয়াই তাহারা এমন পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্পটিও সমজাতীয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে বেহাই বাড়িতে খাইতে বসিয়াছে করিম মিঞা। ঘরভরা কাঁঠালের গন্ধ, অথচ তাহাকে কাঁঠাল খাইতে দেওয়া হয় নাই। করিম ইহা লইয়া বেহাইকে একটু ঠাট্টা করিল, কিন্তু বেহাই আল্লার দোহাই দিয়া বলিল, ঘরে তাহার কাঁঠাল নাই। করিম ছাড়িবার পাত্র নহে, পাত্র ত্যাগ করিয়া ঘরের কোণ খুঁজিতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই সত্য আবিষ্কৃত হইয়া গেল! ঘরের পূব-দক্ষিণ কোণের খুঁটিখানি ছিল কাঁঠালের, তাহাই কি করিয়া মাটিতে শিকড় গজাইয়া একটি পরিপক্ক কাঁঠাল ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে।

এই জাতীয় গল্প একটি নয় দু'টি নয়—নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া যাইতে পারিত করিম চাচা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আগে শুনিয়া হাসিতাম, পরে সোজা উপেক্ষা করিতাম।

সেই করিম চাচা—তাহাকে কত দেখিয়াছি, কত তাহার বাড়ি গিয়াছি খেজুরের রস আনিতে। শিমের মাচায় মাচায় খড়ের ঘরের অঙ্গনটি একেবারে ছাওয়া হইয়া থাকিত। মাচার বাঁশের সঙ্গে ঝুলিত ছোট বড় মাঝারি রসের কলসী ও পাশে জ্বলিত উনান—রস জ্বাল দিয়া পাটালি করিবার জন্য। আমরা পাটখড়ি লইয়া যাইতাম—করিম চাচা দয়া করিয়া হাঁড়ির নীচে একটু রস দিলে পাটখড়ি দিয়া

তাহাকে মুহূর্তে শুষিয়া লইতাম। সেই আমাদের করিম চাচা— কিন্তু সেই শেষ রাত্রের আজানের সুর—অপূর্ব, অলৌকিক! সে সুর কোনও ব্যক্তির নয়—তাহা মানবের—শুধু যেন মানবের নয়,—সুদূরের সীমাহীন দ্যুলোককে উপলক্ষ্য করিয়া পৃথিবীর সুর—শুধু ভূলোকে দ্যুলোকে একটা সেতু স্থাপনের জন্য।

কৌতূহলী হইয়া এই আজানের কথা কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; জবাবে শুনিয়াছি অনেক কথা। শুনিয়াছি আজানের মধ্যে প্রাচীন আরবের যুদ্ধধ্বনি ও প্রার্থনার নিমিত্ত আহ্বান-ধ্বনি মিশিয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের আরও কত কথা। কিন্তু এত অর্থের অনর্থ আমার কোন দিনই ভাল লাগে নাই। ভাল লাগিয়াছে শুধু সুরটুকু—চেতন-অচেতনের প্রদোষলগ্নে সেই মাঠঘাট বহিয়া আসা একটা ওঠা-নামা ভরা সুর।

ইহা আহ্বানই বটে—একটি বিশুদ্ধ আহ্বান। কাহার জন্য আহ্বান? জীবন ভরিয়া পরম শ্রেয়ের আভাস মিশিয়াছে—অসীম অনন্ত—দূর দূরান্তর হইতে সুর দিয়া তাহাকে একটু ছুঁইয়া আসিবার চেষ্টা। মানুষ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রান্তে যেখানে যেমন করিয়া কাদা-কালিতে জড়াইয়া থাকুক—যত অস্ফুটই হোক না কেন, তাহার ভিতরেও রহিয়াছে একটি শ্রেয়োবোধ; এই শ্রোয়োবোধের অবলম্বন বা অধিষ্ঠানরূপে দূরে জাগিয়া ওঠে একটি পরম দয়িত—তাহাই মানুষের পূর্বাচলের জ্যোতির্ময় দেবতা—তাহাই মানুষের পশ্চিমাকাশের আল্লা! তাহার ভিতরে আর আমার ভিতরে শুধু একটু সুরের সেতু নির্মাণ করিবার চেষ্টা। কোথায় সেই নদীসমুদ্র বন-পর্বত পার হইয়া দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর মরুভূমি—তাহার পারে কোথায় সেই মক্কা-মদিনা—সেখানে কোথায় রহিয়াছে আল্লা—কি তাহার স্বরূপ,—কি জানে তাহার এই করিম চাচা! তবু জাগে তাহার কণ্ঠে আজানের সুর। গোহাল ঘরের পাশে ভাঙা দরগার কোণ হইতে

করিম মিঞার কণ্ঠের স্বর—শিমের মাচা—কলা-ঝাড়—বাঁশবন—মূলা-সরিষা কলাই-মটরের ক্ষেত পার হইয়া সে স্বর ভাসিয়া চলে। ঐ করিম চাচার মনের মধ্যেও যত এবড়ো খেবড়ো—যত ভাঙাচুরা ভাবে হোক—একটি মক্কা-মদিনা বাসা বাঁধিয়া আছে—এ স্বর সেই মক্কা-মদিনার আজানের স্বর। ইহাই তাহার জীবনের মন্ত্র—শুধু বাক্-স্পন্দন মাত্র নহে—সেই বাক্-স্পন্দনের সহিত গভীরভাবে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার হৃৎ-স্পন্দন।

সেই শীতের শেষ রাত্রির খেজুর সুপারী নারিকেলর স্বচ্ছ পাতা হইতে ঝরিয়া-পড়া শিশিরের শব্দ টুপ্ টুপ্ টুপ্—আর তাহার সঙ্গে জড়িত করিম চাচার আজানের স্বর—ইহা এখনও আমার চেতনার গোধূলি-আলোতে পরম সত্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

অর্থব্যবস্থা ও মনোব্যবস্থা

আজকাল এক সম্প্রদায়ের লোক প্রায় অন্ধভাবেই এই কথায় বিশ্বাসী যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই গড়িয়া উঠে। তাঁহারা শুধু সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, তাঁহারা আমাদের মনোব্যবস্থার ভিত্তিতেও দেখিয়াছেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই একাধিপত্য না হইলেও প্রধান আধিপত্য। তাঁহারা বলিবেন, সমাজের সূক্ষ্ম সুকুমার সম্বন্ধগুলিই যে মানুষের আর্থিক ব্যবস্থার উপরে গড়িয়া উঠে তাহা নহে, আমাদের মনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিগুলিও অনেকাংশে এই আর্থিক ব্যবস্থার প্রভাবে গঠিত হয়। আর এক সম্প্রদায় আবার এই মতটির সম্পূর্ণ বিরোধী; শুধু বিরোধী বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেই চলে না, তাঁহাদের বিশ্বাস এই মতবাদটির দুষ্টরন্ধ্রকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান মানুষের জীবনে দুরন্ত 'কলি'র প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং মানুষের সকল প্রকারের মহৎ মূল্যবোধকে সে তছনছ করিয়া দিয়াছে। আর এক দল আছেন, যাঁহারা নৈষ্ঠিক ভাবে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে-জন আছে মাঝ-খানে'—অনেকটা এই দলের। আমরা মোটামুটিভাবে নিজেদের এই শেষোক্ত দলের অনুগামী বলিয়া অনুভব করিতেছি। অর্থাৎ মানুষের মনের সর্বপ্রকারের স্থূল সূক্ষ্ম বৃত্তির এবং মূল্যবোধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত আর্থিক বণ্টন-ব্যবস্থার উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল এমনতর কথাকে স্বীকার করিয়া লইতে মন রাজী না হইলেও আমাদের মনোবৃত্তি ও বিবিধ মূল্যবোধের বিবর্তনে যে আর্থিক ব্যবস্থারও একটা বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে সে কথাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

এ সকল বিষয়ে নিছক তর্কে তেমন লাভ হয় না, ইতিহাসের সাক্ষ্যই এ সব ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ করিয়াই সত্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যাক।

কয়েক দিন আগে একজন বন্ধু রসিকতা করিয়া বলিয়া ছিলেন—আমরা কলিকাতার লেক-অঞ্চলের •লোক হওয়াতে আমাদের কতকগুলি সুবিধা আছে; নাটক দেখিতে আমাদিগকে সব সময় বাগবাজার বা বা শ্যামবাজারের দিকে দৌড়াইতে হয় না, সন্ধ্যায়-সকালে আমরা অনেক জীবন্ত নাটক বিনা পয়সাতেই অভিনীত হইতে দেখিতে পাই।'

কথাটা শুনিয়া সহজ ভাবেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। আমার জিজ্ঞাসা-বৃত্তি অপেক্ষা তাঁহার বিবক্ষাবৃত্তি কিছুমাত্রায় অপ্রচুর ছিল না; সুতরাং নাট্যাভিনয়ের একটি সবিস্তার এবং সরস বর্ণনা পাইলাম। যাহা শুনিলাম তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই :—

একদিন সন্ধ্যায় তিনি বালিগঞ্জের ঢাকুরিয়া লেকের পারে বসিয়া আছেন। লেক আস্তে আস্তে নির্জন হইয়া উঠিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, একটি যুবক এবং যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে আসিয়া অদূরস্থ একটি আসনে উপবেশন করিল। তাহারা অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল; অদূর হইতে তাহাদের কথাবার্তা কিছু কিছু শোনা যাইতেছিল।

এরূপ স্থানে এই সময়ে ঈদৃশ যুবক-যুবতীর মনোভাব অনেক সময়ে অকথিত ভাবেই ব্যক্ত থাকে। প্রারম্ভিক কথাবার্তায়ই যাহা বোঝা গেল তাহাতে আশ্বস্ত হইবার প্রচুর কারণ ছিল; ব্যাপারটি স্রেফ রোমান্স নহে তাহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প। লেকের পারে বসিয়া তাহারা অদূর ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবনের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতেছিল। প্রথম কথাই হইল বাসাবাড়ি লইয়া। ছেলেটি একটি মেসে থাকে, চাকুরী করে; বিবাহের পূর্বেই

বাসা করা দরকার ; কি রকম বাসা করা উচিত হইবে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ হইল।

অনাস্বাদিতপূর্ব দাম্পত্য জীবনের প্রথম রঙীন কল্পনা ; সুতরাং উভয়তঃই উৎসাহের আবেগ। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাহাদের কণ্ঠস্বর একটু একটু করিয়া উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। কিন্তু তাহারা আশ্চর্যভাবে রিয়ালিষ্ট। প্রসঙ্গটি উঠিতেই মেয়েটি গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেয়েদের অভিজ্ঞতা-প্রাচুর্য এবং সহজাত বুদ্ধির দাবি লইয়া বলিয়া উঠিল, ভাড়া করিতে হইবে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ি, সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে সবদিক হইতেই, অথচ তাহাতে একটি রান্নাঘর এবং ছোট্ট দুইটি চমৎকার আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর ছাড়া আর স্থান-বাহুল্য থাকিত পারিবে না'। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, 'দুইটি ঘরে চলিবে কি করিয়া ?' মেয়েটি বলিল, 'কেন, একটি হইবে আমাদের শোবার ঘর, আর একটি হইবে আমাদের বসিবার ঘর।' ছেলেটি বলিল, 'তা হয় কি করিয়া, মা থাকিবেন কোথায় ?' মেয়েটি যেন একটু বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া বলিল, 'মা ? কেন, তুমি কি আরম্ভেই এই সব ঝঞ্ঝাট দিয়া ঘর বোঝাই করিতে চাও ? তা কিন্তু হইবে না বলিয়া দিতেছি।' ছেলেটি বলিল, 'সে তোমার কি রকম কথা ? আমি বিবাহ করিয়া বাসাবাড়ি করিব, মায়ের সেখানে স্থান হইবে না ?' মেয়েটি এবারে একটু যেন চটিয়াই গেল ; সে ভ্রূ কুঁচকাইল কিনা অন্ধকারে দেখা গেল না বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠে ছিল তাহার আভাস। সে বলিল, 'কেন, তুমি ত এখন মেসে আছ; তোমার মা এখন কোথায় থাকেন ?' ছেলেটির কণ্ঠে কেমন একটা শুষ্ক গাম্ভীর্য দেখা দিল ; সে বলিল, 'মা এখন থাকেন দাদাদের কাছে।' মেয়েটি বলিল, 'তবে আর দু'চার বছর তাঁহাদের কাছেই থাকিলে দোষ কি ?' ছেলেটি উদাসীন ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'সেখানে তাঁহার ভাল যত্ন হইতেছে না।' মেয়েটি বলিল, 'কেন, সেখানে তোমার বৌদিরা

নাই ?' ছেলেটি কেমন চুপ করিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে বলিল, 'বৌদিরা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মায়ের তেমন যত্ন করেন না।' মেয়েটি একটু কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'তাঁহারা কেহ যত্ন করিতে পারিবে না, আমিই বা তবে প্রথমাবধি তাঁহার সব ভার লইতে যাইব কেন ?' ছেলেটি বলিল, 'আমার বিবাহের পরে আমার সঙ্গেই থাকিবেন, অনেক দিন ধরিয়া মায়ের এই রকমই ইচ্ছা।' মেয়েটি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, 'ও সব ইচ্ছা রাখিয়া দাও; প্রথম হইতেই এমন করিয়া ঘর বোঝাই করিতে হইলে তুমি অন্য 'লক্ষ্মী বউ' খুঁজিয়া লও, আমাকে দিয়া তাহা হইবে না। তোমার মা আসিলেই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দিনে-রাত্রে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের রীতিমত ভিড় জমিয়া যাইবে, এত সব ঝামেলার মধ্যে আমি নাই।' বলিয়া মেয়েটি একটু মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া লেকের ওপারের দিকে চাহিয়া রহিল, ছেলেটির মুখেও আর কথা ফুটিল না। দাম্পত্য-জীবনের সম্বন্ধে প্রথম আলোচ্য বিষয়টিই যে এমন করিয়া তিক্ততা সৃষ্টি করিবে ইহার জন্য কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। কে জানিত লেকের ধারের নির্জন সন্ধ্যার আবছায়া প্রদোষালোকের এমন স্বপ্নাবেশের ভিতরে তাহাদের নবীন প্রেমনীড়ের বিচিত্র কল্পনা এমন করিয়া অকস্মাৎ উবিয়া যাইবে! কিন্তু যাহা হইবার ছিল না তাহাই হইল; যুবক-যুবতীদ্বয়ের প্রেম-নাট্যের সেইখানেই সত্য সত্য একেবারে যবনিকা-পাত হইল কিনা তাহা বলা যায় না; কিন্তু দেখা গেল, তাহারা উপরি-উক্ত আলোচনার পর প্রায় দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল এবং তাহার পর আবার আস্তে আস্তে আসন ছাড়িয়া নীরবেই একদিকে চলিয়া গেল।

গল্পটি বলিয়া আমার বন্ধুটি যে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিক তাহাই সংক্ষেপে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাদের দেশের মেয়েদের এই সব 'হায় কি হইল!' কথাটি এই-জাতীয় একটা সাক্ষেপ উক্তির মধ্যে

ফুরাইয়া ফেলিতে পারিলে এ সম্বন্ধে আবার এতগুলি কথা লিখিবার কোনও তাগিদ আসিত না। কথাটি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়াছিল বলিয়াই একটু আত্মবিশ্লেষণ এবং আনুষঙ্গিক ভাবনাও দেখা দিয়াছে।

উপরে একটি আধুনিকা যুবতীর যে মনোভাবের পরিচয় পাইলাম তাহাকে যদি একটি বিশেষ যুবতীর একটি বিশেষ মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিতাম তবে আর ভাবিবার মত কোন সমস্যাই দেখা দিত না ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে একটু সচেতন হইবার চেষ্টা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ইহা একটি বিশেষ যুবতীর বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয় বহন করে না, শুধুমাত্র আধুনিকা যুবতীগণের মনোবৃত্তির পরিচয়ও প্রদান করে না ; ইহা বর্তমান যুগের যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেরই সামাজিক মনের প্রবণতার দ্যোতক। সুতরাং ইহাকে আধুনিক যুগের বিকার বলিয়াই ধিক্কার দিই, আর ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই তারিফ করি, মোটামুটি একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বর্তমান যুগে আমাদের সামাজিক জীবনে ইহা একটি বিশেষ সত্যরূপেই দেখা দিয়াছে।

আমরা আমাদের দেশ-গাঁয়ের পূর্বেকার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাতে মনে হয়, তখন বিবাহ অর্থই ছিল চারিদিক হইতে কেবল ঝামেলা বৃদ্ধি। ইহা বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীও জানিত, কিন্তু তাহাতেই ছিল আনন্দ। বিবাহের পূর্বে পাত্রী যদি জানিত যে, তাহার যে বাড়িতে বিবাহ হইবে সে বাড়িতে কোনও রকমে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিবার মত মাত্র দুইখানি ঘর আছে, সেখানে শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, দেবর নাই, ভাসুর নাই, ননদ নাই, জা নাই, তবে সে মনে মনে খুব খুশী হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিতে যাইয়াও দেখা গিয়াছে মা-বাপ বড়ঘর খুঁজিয়াছেন এবং বড়ঘরের লক্ষণই ছিল

শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ভাসুর, ননদ-জা, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিতে সংসার চারিদিক হইতে ভরপূর। কিন্তু এখন যে এই দুইখানি মাত্র 'খোপে'র মধ্যে জীবনযাপনের মনোবৃত্তি তাহা যে কেবল আধুনিক কালের যুবক-যুবতীগণের মধ্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, প্রাচীনপন্থী পিতা-মাতা, অভিভাবকগণও পর্যন্ত এ যুগে মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে খোঁজেন এমন বর যাহার পোষ্য-পরিজন এবং অন্যান্য সাংসারিক দায়িত্ব অতি অল্প। আগে যেমন কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া মা, ঠাকুরমা, পিসিমা প্রভৃতিকে পাড়ায় গল্প করিতে দেখিতাম, যেখানে সম্বন্ধ করা গিয়াছে তাহাদের বাহির-বাড়ি ভিতর-বাড়িতে কত ঘর-দরজা, কত পোষ্য-পরিজন, আত্মীয়-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত—কত ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ! এখন আবার মা-ঠাকুরমাকে তেমনিধারা খুশী হইয়া বলিতে শুনি, ছেলেটি ভালই পাওয়া গিয়াছে, লেখাপড়া তেমন না জানিলেও চাকুরে ছেলে, বাপ নাই, মা থাকেন অন্য ভাইদের সঙ্গে, একটি বোন তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ভাইদের মধ্যে একজন বড়, সেও চাকুরী করে—ছোটটিও চাকুরী করে। ছেলে বিবাহ করিয়াই মেয়েকে লইয়া কর্মস্থলে গিয়া বাসা করিয়া থাকিবে, সুতরাং সব দিক বিচার করিয়া মেয়ের ভাল কপালই বলিতে হইবে!

আমি আলোচনাটা এতক্ষণ বিবাহকে অবলম্বন করিয়া করিতেছি বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা নিছক বিবাহসম্পর্কেই নহে, ইহা আমাদের সমাজ-জীবনের বিরাট একটা পরিবর্তনের এবং তৎসঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তিরও একটি বৃহৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছে!

আমরা আমাদের প্রথম জীবনের কথা—অর্থাৎ যখন রীতিমত নাগরিক না হইয়া একান্তভাবে পল্লীবাসী ছিলাম'—সেই সময়ের কথা যখন স্মরণ করি তখন দেখি যে, আমাদের পারিবারিক পরিধির সীমা-রেখাটা যে ঠিক কোথায় ছিল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম

না। এখন যেমন আমার বাসস্থানের পরিধি—আমার পরিবারের লোকের সংখ্যা, আমার মাসিক ও দৈনিক কৃত্যসমূহ এবং তাহার জন্য আর্থিক রসদের পরিমাণ প্রত্যেকটা জিনিসকেই অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া জানি, এমনতর পূর্বে কোনও দিনই জানিতাম না—জানিবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। আমরা যে খুব বনিয়াদী ধনি-পরিবারের লোক ছিলাম তাহা নহে, নেহাতই 'নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক'—জাতীয় মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার বলিয়া যে জিনিসটিকে জানিতাম তাহাকে বহু স্তরবিশিষ্ট একটি বিস্তীর্ণ সঙ্ঘ বলিলেই চলে। প্রথম স্তরেই আমরা একসঙ্গে নিত্য দু'বেলা পাত পাড়িতাম চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক, ইহা জ্যেঠা-খুড়া, জ্যেঠতুত-খুড়তুত ভাই এবং তাহাদের পুত্রকন্যার সমষ্টি। দ্বিতীয় স্তরে আমাদের বাড়ির মানুষ, গ্রামের এবং আশপাশের আত্মীয়-স্বজন। ইঁহারা অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র, প্রয়োজন-আয়োজন, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান, উপলক্ষ্য করিয়া এত আসিতেন থাকিতেন, খাইতেন লইতেন এবং আমরাও অনুরূপ আচরণ এমন করিতাম যে, আমাদের ভিতরকার স্পষ্ট ভেদ-রেখা কাহারও নিকট তেমন অনুভব-গাম্য ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার মাথার উপরে গুরু-পুরোহিত ছিলেন (পুরোহিতের ভিতরেও আবার প্রকারভেদ ছিল, শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজার জন্য একটি পুরোহিত-পরিবার, অন্যান্য পারিবারিক পূজানুষ্ঠানের জন্য অন্য পুরোহিত-পরিবার, আবার কালীপূজা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পূজার জন্য বিশেষ বিশেষ পুরোহিত), আর কিছু নিম্নস্তরে ধোপা-নাপিত, নট্ট-মালাকার, কামার-কুমার-ভুঁইমালী প্রভৃতি ত সমস্ত পরিবারটিকে জড়াইয়া ছিলই। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন দুই ঘর 'রাইয়ত', তাহাদের খাজনার পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল, তাহাও আইনতঃ দেয় হইলেও কোনও দিন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বড়

দেখি নাই। কিন্তু এই দুই ঘরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সঙ্গে আমরা কাজে-কর্মে, আহারে-বিহারে, রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে এমন করিয়াই এক হইয়াছিলাম যে আজ বহু দিনের ছাড়াছাড়ির পরেও তাহাদের কাহাকেও দেখিলে পরম আপনার বলিয়া বোধ করি। ইহা ছাড়া আমাদের বাড়ীতে নিত্য পান দিয়া যাইত যে বারুই সে ছিল আমাদের একান্ত আপনার জন, আমাদের ভূমি চষিত যে চাষী আমাদের খেজুর গাছ কাটিয়া রস, 'ভিড়'-গুড়, পাটালী প্রভৃতি যোগাইত যে 'সিউলি' ইহারা সকলেই ছিল আমাদের আত্মীয়স্বরূপ। মাঝে মাঝে এক মুটো চালের 'খুদ' বা ডালের 'খুদে'র বিনিময়ে লাউ-কুমড়োর শাক, পাট শাক, কলাই-মটর শাক দিয়া যাইত যে বুড়ী তাহাকেও ত আমাদের পরিবারের সুখ-দুঃখের ভাগী দেখিয়াছি, তাহাকেও ত কখনও একেবারে পর বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। এইরূপেই জাতিধর্মনিরপেক্ষ একটা বৃহৎ বন্ধন গড়িয়া উঠিত।

এই বৃহৎ বন্ধন আবার একটু একটু করিয়া শিথিল হইয়া স্তরে স্তরে ভাঙন ধরাইয়াছে। এখন সেই ভাঙন এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে যে, সহোদর ভাই-ভাইয়েরও বেশ ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতেছে। পূর্বে যে বৃহৎ পারিবারিক বন্ধনের কথা বলিলাম, সেই বন্ধনের মূল শক্তি কোথায়? সে শক্তি অনেকখানিই নিহিত ছিল তৎকালীন গ্রাম্যআর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে। প্রাচীন যৌথপরিবার-প্রথা একটা পুরনো অর্থ-ব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই আর্থিক প্রথা সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার ফলেই দেখা দিয়াছে সমাজ-ব্যবস্থারও একটা আমূল পরিবর্তন। প্রাচীন গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে 'অর্থ' শব্দের মানে বিশুদ্ধ ভাবে ধাতব মুদ্রা বা কারেন্সি নোট ছিল না; সেখানে অর্থ শব্দে ব্যাপকভাবে মানুষের সাধারণ সম্পদ বুঝাইত। সুতরাং গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থার সহিত নগদ টাকার সম্পর্ক

প্রত্যক্ষভাবে প্রধান ছিল না। মধ্যবিত্তগণের মধ্যে যে সকল বড় বড় যৌথ-পরিবার গড়িয়া উঠিত, তাহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত, পরিবারের কিছু যৌথ ভূমিসম্পদ ছিল। এই যৌথ-সম্পদই ছিল যৌথ-পরিবারের বনিয়াদ-স্বরূপ। এই জাতীয় জমি-জমাতে বৎসরে যে ধান পাওয়া যাইত, মোটা ভাতের সংস্থান প্রায় তাহাতেই হইত। আমাদের পরিবারে দেখিয়াছি নগদ টাকার অঙ্কটি সর্বদাই নগণ্য ছিল—কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সচ্ছলতার অভাব আমরা কমই দেখিয়াছি। পাল-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির দ্বারা খুব ক্রিয়ান্বিত বাড়ি যেগুলি ছিল সে-সব স্থলে একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, এই সকল ক্রিয়া-কর্মের জন্যও অধিকাংশ স্থলেই পৃথক ভূসম্পত্তি ছিল। ইহা হইতে যে ধান-চাল পাওয়া যাইত তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রা-সংগ্রহ করিয়া আমরা কাজ করিতে বেশী দেখি নাই; ধান-চালের এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময় দ্বারাই কাজ চলিতে দেখিয়াছি। যে পুরোহিত তিন দিন উপবাসী থাকিয়া মহা ধূমধামে দুর্গাপূজা করাইতেন তিনি নগদ কিছু পাইতেন শুধু নবমীর দিনে দক্ষিণার সময়ে—তাহাও যৎকিঞ্চিৎ 'কাঞ্চন-মূল্য' রজতখণ্ড'—তাম্রখণ্ডেও যে কাজ চলিত না এমন নহে। কিন্তু পূজার পরে দেখিতাম, তিনি নৈবেদ্যের চালে সবশুদ্ধ প্রায় মণখানেক চাল সংগ্রহ করিয়াছেন, সঙ্গে তিন-চারি মণ পাইয়াছেন ধান (তাহার ভিতরে কিছু আবার ফরমাস করা খইয়ের ধান, কিছু মুড়ির ধান, কিছু বা চিঁড়ার ধান), সঙ্গে কয়েক কাঁদি কাঁচাকলা, কাঁদি কয়েক পাকা কলা, দুই কুড়ি মানকচু, চার কুড়ি নারিকেল, এক জালা ইক্ষু গুড়, কিছু শশা-চালকুমড়া। ইহার বহু জিনিসই ছিল যজমানের বাগানে স্বচ্ছন্দজাত অথবা অনায়াসলব্ধ; সুতরাং যজমানেরও তেমন গায়ে লাগিত না, গুরু-পুরোহিতরাও সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্বাদ বর্ষণে কার্পণ্য করিতেন না; এবং মোটের উপরে এতদুভয়ের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ

যোগও তাই সহজ ভাবেই গড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজিকার দিনে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অর্থ শব্দের একমাত্র তাৎপর্য হইয়া উঠিয়াছে মাসান্তে লব্ধ কিছু নগদ টাকা।

আজিকার বাজারদর যাচাই করিয়া পূর্বোক্ত পুরোহিত-দক্ষিণার একটা অঙ্ক ফেলিয়া দেখুন, দেখিবেন নয়নের বিস্ফারিত দৃষ্টি গুরু-পুরোহিতকে কতখানি ব্যবধানে সরাইয়া দিয়াছে! ধোপা-নাপিত নড়-ভুঁইমালী প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকটা অনুরূপ ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল; পুত্র-কন্যার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু অনুষ্ঠান হোক, তাহাদের খাওয়া-দাওয়া ও পাওনা ছিল যখন-তখন; তদুপরি সর্বকার্যেই পাওনা ছিল 'সিধা' অর্থাৎ ধান-চাল, ডাল-তেল, নুন-লঙ্কা এবং আনুষঙ্গিক অনেক প্রকারের ইত্যাদি ইত্যাদি। নগদ পয়সার জন্য দাতাও তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেন না, গ্রহীতারও নগদ পয়সার লালসা তেমন ভাবে দেখা যায় নাই। আসলে সংসার-যাত্রা নির্বাহের কিছু রসদ জুটিলেই চলিয়া যাইত। আমরা বহুদিন যাবৎ এমন ব্যবস্থাও দেখিয়াছি, দীর্ঘ তিন মাস বসিয়া বাড়ীতে মণ্ডপজোড়া দুর্গাপ্রতিমা গড়িয়া দিয়াছে যে কুমার তাহারাও নগদ টাকা কিছু পাইত না—তিনমাস কাল ধরিয়া পাঁচছয় কিস্তিতে চারি পাঁচজন লোক প্রতিবারে তিন-চারি দিন পরম সন্তোষ সহকারে আহারাদি করিয়া যাইত এবং পূজার পরে প্রতিমা গড়ার বাবদে কয়েক মণ জমির ধান মাথায় করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত। বাড়ীতে কোনও পাল-পার্বণ বা ক্রিয়ানুষ্ঠান হইলে গ্রাম্য চৌকিদারেরও কিছু 'ভেটে'র ভাগ ছিল; অল্প কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমাদের মুসলমান চৌকিদারের দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, এবং কালীপূজার চাল-কলার নৈবেদ্য পাওনা ছিল। গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত যিনি তিনি মাসিক কোনও বেতন পাইতেন না, বৎসরান্তে কিছু ধান তাহার পাওনা হইত। গুরুমহাশয়কে কোনও কোনও ছাত্রের নিকটে বেতন না পাইয়া

অন্ত প্রকারে দক্ষিণা লইতে দেখিয়াছি। কোনও গরীব ছাত্র হয়ত বেতন দিয়া পড়িতে পারে নাই,—গুরুমহাশয়ের জীর্ণ খড়ের ঘর সংস্কারের সময়ে নিজের 'ছাড়াভিটা'য় জাত বেত দিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছে। পাল-পার্বণ ও উৎসবাদি উপলক্ষ্যে মাঝি-মাল্লারা চারি-ছ' আনার পয়সায় সানন্দে আট-দশ মাইল পথ পৌঁছাইয়া দিত; ইহা তাহারা পারিত এই জন্য যে, কোনও চুক্তি থাকুক কি না থাকুক, তাহারা যেখান হইতে রওনা হইবে সেখান হইতে এক বেলার 'খোরাক' এবং যেখানে গিয়া পৌঁছিবে সেখান হইতেও এক বেলার 'খোরাক' অনায়াসে আদায় করিয়া লইতে পারিত। এই 'খোরাক' শব্দটি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ; অর্থাৎ ইহার ভিতরে মাথাপ্রতি চাল, ডাল, তরি-তরকারী, মাছ, তেল-নুন, হলুদ-লঙ্কা, এমন কি জ্বালানি কাঠ, রাত্রিতে বাতি জ্বালাইবার কেরোসিন প্রভৃতি সকলই পরিমাণমত দেয় ছিল।

আমাদের পূর্বতন আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয় লইতে হইলে এই সকলেরই খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতে হইবে। এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, মুদ্রা ব্যবহারের রীতিই তখন পর্যন্ত খুব কম ছিল। একটু বনিয়াদি পরিবারের ইস্তক চণ্ডীপাঠ মায় জুতা সেলাই সব কাজের জন্য প্রায়ই জমি-জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল। দেবতা-ব্রাহ্মণের জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল, ধোপা-নাপিত, নট্ট-ভূঁইমালী প্রভৃতির জন্য 'চাকরাণ' জমি ছিল। সুতরাং পদে পদে নগদ হিসাবের মন-কষাকষি এবং তজ্জনিত অবশ্যম্ভাবী মনোমালিন্যের সম্ভাবনা ছিল না; আর টাকার হিসাব যেখানে যত গৌণ আত্মীয়তার বন্ধন সেখানে তত সহজ এবং দৃঢ়। কিন্তু আজ যে আপনি বাস করিবেন তাহার জন্য রন্ধ্রবিহীন আলমারির তাকের ন্যায় দুইখানি প্রকোষ্ঠ ত জানকবুল করিয়া একরূপ সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পরে চলিতে থাকিল প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে নগদ আদানপ্রদান তাহাকে সারা মাস ধরিয়া কত করিয়া ভুলিবার

চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না। প্রতিদিনের কৃত্য রূপে বাজারে একবার না গেলেই নয় এবং সেখান হইতে ফিরিবার সময়টুকুর মধ্যে নগদ মূল্যের আদান-প্রদানে পিত্ত কিছু তপ্ত না হইয়া যাইবে না। ধোপা আপনার কাপড় কাচিবে, তাহার নগদ-মূল্যের নিত্য নূতন রেট, নাপিত আপনার দাড়ি চাঁচিবে, তাহারও নিত্য নূতন কায়দা এবং তদনুরূপ নগদ মূল্যের উঠতি-পড়তি। রেল-ট্রাম-বাস—ইহাদের চালকদের সহিত আপনার কোনও দিন 'খোরাকি'র কোনও সম্বন্ধ থাকিবার কথা নহে; তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রম-বর্ধিত নগদ মুদ্রার আদান-প্রদানে। গুরু-পুরোহিতের বালাই তুলিয়া দিতে চাহিয়াও তুলিয়া দিতে পারিতেছেন না—বিবাহ আছে, শ্রাদ্ধ আছে, অগত্যা কালীক্ষেত্র কালীঘাট পীঠে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নগদ পঁচিশটি টাকা কোনও পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং একেবারে একোদ্দিষ্ট পিণ্ডদান হইতে ষোড়শ বৃষোৎসর্গ প্রায় ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই সারিয়া আসিলেন। সর্বত্রই শুধু নগদ মূল্য—আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে কাহার সঙ্গে? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আপনার পারিপার্শ্বিক জগৎ আপনাকে শুধু সচেতন করিয়া দিতেছে, নিছক বাঁচিয়া থাকিতেও নিরন্তর কি নগদ মূল্যের চাহিদা! সংসারটা যেন আর কিছুই নহে, আপনি সারাটি মাস গলদ্ঘর্ম হইয়া যে কয়েকটি ধাতব মুদ্রা বা যে কয়খানি কারেন্সি নোট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই ছিনাইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র!

গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থায় এই সেদিন পর্যন্তও একটা বিনিময়প্রথা বর্তমান ছিল। গরীব যে নগদ পয়সায় নলেন গুড়ের পাটালি কিনিয়া খাইতে পারে না, সে তাহার ভিটায় জাত 'ছনে'র দু' আঁটির বিনিময়ে কিছু গুড় সংগ্রহ করিতে পারে। দেশ-গাঁয়ে সর্বপ্রকারের শাকের ব্যবসা বাড়িতে বাড়িতে চলিত মুখ্যতঃ চালের বা ডালের 'খুদে'র বিনিময়ে।

বেত-বাঁশের সহিত আহার্যদ্রব্যের বিনিময় আমরা অনেক দেখিয়াছি। স্থপারীর ঋতুতে স্থপারীকে প্রায় মুদ্রাংশের ন্যায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি।

অর্থনীতির দিক হইতে হয়ত বলা হইবে বিনিময় সর্বত্রই বিনিময়, তাহা বস্তুবিনিময়ই হোক, অথবা মুদ্রার মাধ্যমেই হোক। কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়া আমরা ইহাকে একেবারে তুল্যমূল্য দিতে রাজী নই। বস্তুবিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বত্র না হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের হৃদ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। অর্থবিনিময়ের ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাবনা স্বল্প। গ্রাম্য জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার জন্য দ্রব্যবিনিময়ের একটি গভীর প্রভাব গ্রাম্য সমাজ-জীবনের উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, ইহা আমাদের পল্লীর সমাজ-বন্ধনের ভিতরে একটা শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

মোটের উপরে আমাদের পূর্বতন আর্থিক ব্যবস্থা এবং বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করিতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি যে, পূর্বে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা নির্ভর করিত মুখ্যতঃ ভূমিজাত সম্পদের উপরে; আর বর্তমান অবস্থায় এই ভূমিজাত বা প্রাকৃতিক অন্য কোন প্রকারের সম্পদের সহিত আমরা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক-বিহীন হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের সম্পর্ক শুধু মাত্র ব্যাঙ্কের চেক বা কারেন্সি নোটের সঙ্গে। আমাদের বিশ্বাস অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনই আমাদের পূর্বতন পারিবারিক বন্ধন এবং সমাজবন্ধনের ভিতরে ভাঙন ধরাইয়াছে। সেই ভাঙন-প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিয়া আমাদিগকে যেখানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহারই একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পূর্ববর্ণিত লেকের পারের যুবতীটির মনোবৃত্তির ভিতরে।

আমি পুরাতনের প্রতি সহজাত অন্ধ-প্রীতির বশবর্তী হইয়াই এ কথা বলিতেছি না। পুরাতন প্রথা ভাঙিবেই। সে ভাঙনের ভিতরে

অবিমিশ্র অকল্যাণই রহিয়াছে এমন কথাও শ্রদ্ধেয় নহে। কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া যে কথাটি মনে হয় তাহা এই যে, আমাদের পূর্বতন গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক—তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে চিত্তের যে ঔদার্য ছিল তাহা আমাদের আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে গ্রথিত পারিবারিক তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে মারা পড়িতে বসিয়াছে। আমাদের গ্রামীণ সভ্যতার ভিতরে এই একটি চিত্তধর্ম লাভ করিতাম যে, সাংসারিক ছোটবড় কোনও সুখ-সম্পদকে একা একা ভোগ করিয়া আনন্দলাভ করা যায় না, নানাভাবে বহুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাস, সুখ-সম্পদকে বণ্টন করিয়া লওয়াই ছিল আমাদের ধর্ম। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে নিজের ঘরে দুয়ার আঁটিয়া পিঠা-পুলি খাইতে বা নবান্নের দিনে নিজের ঘরে বসিয়া একা একা ষোড়শ ব্যঞ্জনে আহার করিতে আমাদের কোনও আনন্দ ছিল না; দশ জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইবার একটা সহজ মনোবৃত্তি আমরা অনুভব করিতাম। ইহার পিছনকার অর্থনীতির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, সে অর্থনীতি যে আমাদের একটি বিশেষ মনোবৃত্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত যে গরীব—সামান্য বরপণ বা কন্যার গায়ে না দিলেই নয় এমন দুই-একখানি গহনা যোগাড় করিতে যাহার ভদ্রাসন বাঁধা পড়িয়াছে বা তৈজসপত্র বিক্রি করিয়া দিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে চুপি চুপি বিবাহকার্য সমাধা করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে তাহার হৃদয় সায় দিত না; সুতরাং সেই যে সর্বস্ব খোয়াইবার যজ্ঞ তাহাতেও সে সকলকে না ডাকিয়া পারিত না। ইহা কোনও ঐশ্বর্য-প্রচারের লোভে নয়, কোনও ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় নয়; আমার মনে হয়, ইহা পুরাতন গ্রামীণ মনোবৃত্তিরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

অপর পক্ষে একবার আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। তাহার চারিদিক জুড়িয়া নিশিদিন কেবল একটি সুর—'চাচা, আপন বাঁচা।' এই নিরন্তর 'আপন বাঁচা'ইবার অত্যন্ত তাগিদে আমরা এমন করিয়াই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছি যে, তাহার পরিণামে এই 'আপন' কথাটি যে শেষ পর্যন্ত কি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কয়টি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। বর্তমান মাস-মাহিনার অর্থনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে যাহারা থিতাইয়া পড়িয়াছি, তাহারা কন্যার বিবাহ দিতে হইলে যাহা কিছু খরচ করিব তাহা শুধুমাত্র মেয়ে-জামাইকে কি দিব এই একমাত্র দিকে নিবদ্ধ রাখিতে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি; আর তাহাদের অতিমাত্রায় সাহায্যকারী রূপে আসিয়া জুটিয়াছে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের যত নিয়ম-কানুন। যাঁহারা কালোবাজারের সর্ববিধ পাপাচরণের সহিতই নিজেদের সর্বদা যুক্ত রাখিতে এবং সেই উপায়ে প্রচুর অর্থাগম করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, এই সময়ে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলীর প্রতি তাঁহাদের কঠোরতা এবং নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

আমি পুরাতন গ্রাম্য অর্থনীতির পক্ষে কোনও ওকালতি করিতেছি না, কেহ করিলেও মহাকাল তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করিবেন কিনা সন্দেহ। এই অর্থনীতির সপক্ষে যদি বলিবার কিছু থাকে, তবে বিপক্ষে বলিবারও অনেক কিছু রহিয়াছে। আমি যে জিনিসটি সম্বন্ধে নিজেদের সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা হইল এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে আমরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক গুণ হারাইয়া ফেলিতেছি—যে গুণগুলি আমাদের চিত্ত-ধর্মের ভিতরে একটা প্রসারতা দান করিত। ভূমিজ ও অন্যবিধ প্রকৃতিজ সর্বপ্রকারের সম্পদহারা হইয়া আমরা খালি ব্যাঙ্কসর্বস্ব বা মণিব্যাগসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছি; ইহা সর্বদাই আমাদের অতিমাত্রায় হিসাবী ও সাবধানী

করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু সেই হিসাব ও সতর্কতার পরিণাম যদি হয় শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের প্রাচীর তুলিয়া তুলিয়া কেবলই বৃহৎ মানব-সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্যুত এবং বঞ্চিত করিয়া রাখা, তবে সে আত্ম-সংকোচনের ভিতরে আমাদের অকল্যাণ এবং অপমানই নিহিত আছে। যে অর্থনীতি আমাদের এই-জাতীয় মনোবৃত্তির জন্য দায়ী তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আমরা এক দিনে পরিবর্তিত করিতে পারি না; কিন্তু সচেতন চেষ্টা দ্বারা মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিকের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ বিশ্বাস আমরা এখনও রাখি।

পদধ্বনি

সে যে আসে—আসে—আসে—

কান পাতিয়া শুনি তাহার পদধ্বনি।

শরৎ-প্রাতের সোনার আলো গায় মাখিয়াও সে আসে, নিদাঘের আগুনে পুড়িয়াও সে আসে—শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্ধকারে অবিরল ঝরঝর বারিধারার ভিতর দিয়াও সে আসে।

সে আসে দু'হাত ভরিয়া আনন্দ লইয়া—দু'হাত ভরিয়া বিরক্তি লইয়া—দু'হাত ভরিয়া দুঃখ-বেদনা লইয়া।

সে আনে আকস্মিক সাফল্যের বাণী—সে বহন করে অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা, সে মুহূর্তে হৃদয় ভরিয়া দেয় আশা-উৎসাহে, মুহূর্তে সে আবার আসিয়া নির্মমভাবে এক ফুৎকারে নিভাইয়া দেয় সকল আশার আলো।

তাহার দান কতদিন গ্রহণ করিয়াছি মৌন নিবিড় আনন্দে, কত মনখোলা হাসির হুল্লোড়ে, কত অব্যক্ত বেদনার অন্তর্দাহে, কত অশ্রুসিক্ত কাতরধ্বনিতে!

এমনি করিয়া সারা জীবন সে আমার জীবনে আসে—আসে—আসে—। আমি সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় কান পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকি—কখন শুনি তাহার পদধ্বনি। সেই চিরপরিচিত—অথচ চিরনূতন পদধ্বনি!

আশ্চর্য এই, এমনি করিয়া সে 'চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল'—কিন্তু নিজে সে কোনও দিন হাসিলও না, কাঁদিলও না। নিত্য সে দু'হাতে আমাকে জীবনভর দিয়াই গেল, নিল না সে কিছুই। আমার এত আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না—কোনও দিন তাহাকে একটুকু স্পর্শ করিতে পারিল না। অসীম তাহার ঔদাসীন্য—নির্মম নির্বিকার!

তাহাকে আমি দেখিয়াছি কত রূপে, কত বেশে! কত বিচিত্র ভাবে ও ভাষায় আমার নিকট পৌঁছিয়াছে তাহার অমোঘ আহ্বানের কণ্ঠস্বর। আজ যে রূপে দেখিয়াছি, হয়ত কাল সে রূপে তাহাকে দেখি নাই; কিছুদিন তাহাকে যে বেশে আমার ঘরের পথে আসিতে দেখিয়াছি, সহসা একদিন সেই বেশ বদলাইয়া তাহাকে নূতন বেশে দেখিতে পাইলাম; একদিন সে আসিয়া আমার বদ্ধ দুয়ারে যেমন করিয়া আঘাত করিল, যেমন করিয়া আহ্বান জানাইল, পরের দিনই হয়ত দেখিলাম, তাহার সেই দুয়ারে আঘাতের ঢংও বদলাইয়া গিয়াছে, কণ্ঠের স্বর এবং বাণী সবই বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু আমার সারাজীবন ধরিয়া সে এক এবং নিত্য; কোনও দিন তাহার রূপ বদল দেখিয়া তাহাকে ভুল করি নাই, কোনও দিন তাহার আহ্বানকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে দিই নাই; আমার ঘরে দুয়ারে—আমার প্রাণে আমার মনে তাহার আসন নিত্য সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাহার নাম জানি না, ধাম জানি না—জাতি জানি না, ধর্ম জানি না—কিন্তু তবুও তাহাকে কোনও দিন চিনিতে ভুল হয় নাই, ভ্রমে-সংশয়ে তাহাকে কোনও দিন অবজ্ঞা অনাদর করি নাই—সর্বদাই সে স্বাগত।

কে সে—?

ঘরে বসিয়া কাজ করি,—কাজের ফাঁকে ফাঁকে আনমনা হইয়া কান পাতি, কখন সে আসে সেই তাহার চিরপরিচিত পথে—কখন শুনি তাহার সেই চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন চিরস্বাগত পদধ্বনি!

কে সে—?

জীবনে এমন কিছুই দেখিলাম না যাহা নিত্যই ভাল লাগে, এমন কোনও লোক দেখিলাম না যাহাকে নিত্যই পাইতে একেবারে সমভাবেই ভাল লাগে—সর্বদা সর্বাবস্থায় ভাল লাগে। জীবনে এমন কাহাকেও দেখিলাম না, আজ যে কঠিন আঘাতে বুক ভাঙিয়া দিয়া নির্মম নির্বিকার

হইয়া চলিয়া গেল, যাহার দেওয়া দান হাতে করিয়া অবিরল ক্রোধের আগুনে জলিয়া-পুড়িয়া মরিলাম, সারাদিন তর্জন-গর্জন আস্ফালন করিলাম, অথবা ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া সারাদিন বসিয়া কাঁদিলাম—তাহার প্রতি এতটুকু রাগ নাই, দ্বেষ নাই—এতটুকু অবজ্ঞা-অনাদর নাই—কাল আবার অপরিবর্তিত মনোবৃত্তি লইয়াই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি—কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করি দূর পথ হইতেই কখন শোনা যায় তাহার পদধ্বনি।

কে সে—?

তাহার ভিতর দিয়াই ত দুনিয়ার কত দূর নিকট হইয়া গেল, কত নিকট দূর হইয়া গেল,—কত পর আপন হইল, কত আপন পর হইল। কোথায় বিরাট দুনিয়ার এককোণে বদ্ধ পাঁচিলের ভিতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম আমি—কে আনিয়া দিল দেশ-দেশান্তরের বিরাট জগৎটাকে আমার ঘরের ভিতরে, কে আমার আলো-হাওয়াবিহীন অন্ধ কক্ষটিকে ছড়াইয়া দিল জগতের অসীম পরিধিতে—সমস্ত আনাচে-কানাচে?

কে সে—?

সে আর কেহ নয়, সে আমার ডাক-পিয়ন।

সকালে ন'টায় একবার কান পাতিয়া থাকি, দুপুরে আবার কান পাতিয়া থাকি—সন্ধ্যায় আবার কান পাতিয়া থাকি, কখন শোনা যায় তাহার পদধ্বনি। শক্ত চামড়ার নাগড়াই-নমুনার জুতা, তাহার নীচে শক্ত লোহার চাকতি আঁটা, সিমেণ্ট-বাঁধান ফুটপাথের উপর দিয়া দূর হইতেই শোনা যায় টক্কর টক্কর শব্দে কি কর্কশ, অথচ কি মধুর! এই ধ্বনিটিই প্রসিদ্ধ এবং প্রধান হইলেও এইটিই একমাত্র ধ্বনি নয়; কখনও সে আসিয়াছে ছেঁড়া চটির চটচট্ শব্দে, কখও আসিয়াছে সস্তা কেড্‌স্-এর ধ্যাবড়ান শব্দে; কিন্তু যেভাবেই আসুক, সেই পদধ্বনিকে কোনও দিন

ভুল করি নাই, একটু দূর হইতেই বেশ সহজাত-বৃত্তি-বশেই যেন চিনিতে পারিয়াছি।

কিসের প্রত্যাশা এই পদধ্বনির নিকট হইতে? একখানি চিঠি। কে লিখিবে? কি লিখিবে? কিছুই জানি না। তবু বেলা নয়টা বাজিয়া আসিলেই মনটা উড়ুউড়ু করিতে থাকে। বাড়িতে থাকিলে কান পাতিয়া থাকি, কখন শোনা যায় সেই পদধ্বনি। বাড়িতে না থাকিলে ফিরিয়া আসিয়া চিঠির ভাঙা বাক্সটিকে একবার চাহিয়া দেখি,—দেখিলাম কিছু নাই, স্বস্তি পাইলাম না, বাক্সটির বাহির হইতেই ভিতরের সব-কিছু দেখা যায়, তবুও একবার খুলিয়া দেখিলাম—কিছুই নাই; তাহাতেও মন নিরস্ত হয় না, অভ্যাসবশে ভাঙা বাক্সটার ভিতরটা একবার হাতড়াইয়া দেখি—কিছুই নাই,—বিরক্তিভরে ভিতরে চলিয়া যাই—আজ দিনটই যেন নিস্ফল।

কিন্তু রোজ এত কিসের চিঠি চাই? প্রেমের চিঠি? রোজ এক-খানি করিয়া ইনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের চিঠি আমাকে কে লিখিবে? যশের চিঠি? রোজই বা আমার এমন প্রশস্তি রচনা করিয়া কে আমাকে চিঠি দিবে, আমার শ্রীশ্রীজীবনচরিতের ভিতরে এমনই বা কি গূঢ়ার্থ লুকাইয়া আছে,- যাহা হইতে ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া সবাই মিলিয়া নিত্য নূতন মণিমুক্তা আবিষ্কার করিবে এবং সোচ্ছ্বাসে এবং সালঙ্কারে তাহারই মালা রচনা করিবে? তবে কি লাভ-সৌভাগ্যের কথা? জীবনের অভিজ্ঞতা এতদিনে ত নেহাত একেবারে কম নহে, এবং তাহা হইতে এই মোদ্দা কথাটা ত একদিনে জানা এবং বোঝা উচিত ছিল যে, মাদৃশ জীবের দগ্ধ কপালে ঈদৃশ বস্তুনিচয় ত এত সচরাচর ঘটিবার নহে। তবে কিসের এই চাঞ্চল্য? তবে কি শেষ পর্যন্ত কবিত্ব করিয়া বলিতে হইবে, অজানার আকর্ষণ?

একদিন সকাল বেলা পড়ার ঘরে বসিয়া আছি। বাড়ির ভিতর হইতে সহসা একটা প্রবল ঝাপ্টা আসিল, তাহাতে ভাসিয়া আসিল যে কথাগুলি তাহার গলিতার্থ হইল এই, রান্নাঘরের ছাদ হইতে কিছুদিন যাবৎ কালিমাখা বালি-মাটি-চুণ সময়ে-অসময়ে ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া রাঁধুনী এবং তৎসহচরিগণের মাথায় পিঠে পড়িতেছে; এ সম্বন্ধে তথ্য-সরবরাহ এবং সতর্কবাণীর উচ্চারণ বহুবার হইয়াছে; এখনও এ-বিষয়ে একটা সদাশিবজনোচিত ঔদাসীন্যের ভান করিলে আখের গিয়া তাহার ফল খুব প্রীতিপ্রদ নাও হইতে পারে। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া চিত্ত স্থির করিবার মানসে টেবিলের উপরে গাদাকরা প্রুফগুলি মেলিয়া বসিলাম। কিন্তু সাধ্য কি প্রুফ দেখিব, মুহূর্ত মধ্যেই আবির্ভাব আমার দূর-সম্পর্কীয় বয়স্ক এক আত্মীয়ের। তিনি সাধারণতঃ এক বৈঠকে অনেক প্রসঙ্গ তুলিয়া থাকেন, এবং যে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাহার কোনটাই অতিবিশদরূপে আলোচনা না করিয়া থামিয়া যাওয়া তাঁহার অভ্যাস নয়। দ্বিতীয়তঃ একটি বিশেষ কিছু উপলক্ষকে অবলম্বন না করিয়া এই আত্মীয়টির কখনও আবির্ভাব ঘটে না; অথচ এই সার-সত্যটিকে তিনি তাঁহার কথাবার্তার প্রথমার্ধে কিছুতে স্বীকার করিবেন না; আত্মীয়স্থলে দেখাশুনা ও সংবাদ এবং ভাবের আদান-প্রদান তাঁহার আগমনের যে মুখ্য কারণ, এ-বিষয়ে তিনি কাহারও মনে কোনও সংশয় রাখিতে দিবেন না। সুতরাং প্রথমে 'আমরা' বলিতে যদ্‌যাবতীয় জীব তাহারা কে কোথায় কেমন আছি, তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিতে হইবে, 'তাহারা' বলিতে যত জীব তাহাদের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেহ-মনের বিস্তারিত সংবাদ বসিয়া বসিয়া শুনিতে হইবে; তাহার পরে সমাজনীতি, আনুষঙ্গিকভাবে অর্থনীতি এবং তাহারই আনুষঙ্গিকভাবে আবার রাজনীতির আলোচনা উত্থাপিত হয়; পাকা দেড়-ঘণ্টা পরে অতি নিম্নকণ্ঠে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে সঙ্গোপনে তিনি জানিতে দেন, তাঁহার

অতিসৎচরিত্র শ্রীমান্ ভ্রাতুষ্পুত্র অকারণে একটি ব্ল্যাক-মার্কেটঘটিত অপবাদ এবং তৎসহচরিত ঝামেলার ভিতরে অস্বস্তিকরভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে; এ-ক্ষেত্রে অবিলম্বে দেহ-প্রাণ-মন পণ করিয়া ঝাঁপইয়া পড়া এবং সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষগণকে প্রয়োজনমত একটু ধরাপড়া করিয়া মানীর মান রক্ষা করা আমার শুধু অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, আমার ধর্মের মধ্যে গণ্য। আমি সাফ অস্বীকার করিলাম; তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত তিক্ততা সৃষ্টি করিয়া সাক্ষাৎ ভৈরবমূর্তিতে প্রস্থান করিলেন।

আবার প্রুফগুলিতেই মনোনিবেশ করার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু খানিকটা একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, প্রিণ্টারে 'ডেভিল' আজ মূর্তিমন্ত হইয়া আমাকে কেবলই খামচিঁ দিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিতেছে; পিত্ত জলিয়া উঠিল, প্রুফগুলি মোচড়াইয়া দুমড়াইয়া একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম। কান পাতিয়া শুনিলাম—সেই পদধ্বনি! দুয়ারের কাছে আগাইয়া গেলাম; পিওন হাত ভরিয়া চিঠিপত্র দিয়া গেল। মনটা খুশীতে ভরিয়া গেল। টেবিলের উপরে সবগুলি বিছাইয়া লইলাম। প্রথমতঃ একটি রেজিষ্টার্ড চিঠি দিয়াছিলাম তাহার ফেরৎ রসিদ; দ্বিতীয়তঃ একটি প্রিমিয়ামের তাগিদ-পত্র; তৃতীয়তঃ একটি স্মৃতি-সভার নিমন্ত্রণ-পত্র; চতুর্থতঃ একখানি পোষ্টকার্ড, লিখিয়াছেন একটি পরিচিত ভদ্রলোক। সংবাদ হইল এই যে, শহরের উপকণ্ঠে যেখানে জমি কিনিয়া বাঁশের বেড়া দিয়া আসিয়াছিলাম, আমার ভাবী পড়শীগণ তাহা নিঃশব্দে একখানি একখানি করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে অধিকতর উপযোগী প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন; আপত্তি করিলে তাঁহারা এ-বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার আন্তরিক বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন; পঞ্চমপত্র বোনের, ভাগ্নে-ভগ্নীগণ নূতন জায়গায় যাইয়া যথাক্রমে জ্বর, আমাশয় এবং সর্দিকাশিতে নিরন্তর ভুগিতেছে ও ভোগাইতেছে। বাকি রহিল একখানি খাম, অপরখানি ইন্‌ল্যাণ্ড খাম; ইন্‌ল্যাণ্ড খাম

খুলিয়া দেখিলাম একখানি সুপারিশ-পত্রের জন্য তাগিদ, অর্থাৎ পত্রখানি খুলিয়া একটি জরুরী তার পাইয়াছি মনে করিয়াই হন্তদন্তভাবে যেন ঠিক তারের বেগেই একখানি সুপারিশ-পত্র পাঠাইয়া দেই ; অবশিষ্ট খামখানি খুলিয়া দেখিলাম একটি পরিচিত দুঃস্থার, স্বামী হারাইয়া, ঘরবাড়ি হারাইয়া এখন পুত্রকন্যাগণ লইয়া উপবাসে দিন কাটাইতেছে, লজ্জা নিবারিত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার সাধ্য নাই। বুকপোষ্টে ছিল এক দৈবজ্ঞের মুদ্রিত প্রশংসা-পত্রাবলী—তাহাই খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গেলাম।

পরের দিন প্রভাতে আবার শুনিলাম সেই পদধ্বনি—আবার কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য লইয়া আগাইয়া গেলাম—পিওন আসিয়াছে, চিঠি! চিঠি চাই,—আবার সেই চিঠি!

এতটুকু দেহের মধ্যে মানুষের অসীম বাসনা, মন চায় নিখিল মানবের সঙ্গে একটা নিরন্তর যোগ। সেই যোগের বাহন এই চিঠিগুলি—তাই মানুষের এত আকর্ষণ—শুধু চিঠির জন্য নয়, সেই চিঠির বাহকের পদ-ধ্বনির জন্যও। নিজের ঘরে যতই আঁটসাঁট বাঁধিয়া বসিয়া থাকি না কেন, মন চায় বাহিরে জগৎটাকে ঘরে টানিয়া আনিতে। বৃহতের সঙ্গে যোগ চাই, না হইলেই মন আনচান করে, নিজেকেও হারাইয়া ফেলি। সেই যোগ যাহার মারফতে সাধিত হয় তাহার পদধ্বনিও উঠিয়াছে জীবনে কত আকর্ষণীয় কত রহস্যময় হইয়া।

মন্দির-প্রাঙ্গণে মনঃসমীক্ষণ

ছোট একটি উৎসব উপলক্ষে একটি মফঃস্বল সহরে গিয়াছি। উৎসব আছে, কিন্তু প্রচণ্ডতা নাই, এই জিনিসটিই আমাকে গভীর আনন্দ দান করিতেছিল। চারিদিকে একটা শান্ত এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ। সন্ধ্যায় মন্দিরের আরতি হইবে। আরতির পূর্বে কিছু বন্দনাগান ও স্তোত্র পাঠ হইল। তাহার পরে যে আরতি হইল তাহাও অনাড়ম্বর; অন্তর্গ্রস্থরে পিছন হইতে সেতার-এস্রাজের সাহায্যে একটা নেপথ্য-সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দেবতার সম্মুখে বসিয়া পঞ্চপ্রদীপ লইয়া আরতি করিতেছিল একটি কুমারী। সে গৈরিকাভবসন-পরিহিতা, সদ্যঃস্নতা, ভিজা চুল পিছনে ছড়াইয়া দিয়াছে, অতি শান্ত তাহার মূর্তি এবং সঞ্চরণ। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সেদিনকার সেই আরতি দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, সেই মুগ্ধতা আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যে যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, চারিদিক হইতেই তাহা একটা প্রবল সংশয় এবং তর্কের যুগ। এমন মজা যে, জীবনে সে বর কি অভিশাপ তাহাও নিঃসংশয় হইয়া বুঝিতে পারি না। অনেক সময় মনে হইয়াছে, এই সংশয়-তর্কের দৌরাত্ম্য কিছুতেই জীবনের কোনও অনুভূতিকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে দিতেছে না; আবার অনেক সময়ে মনে হইয়াছে, জীবনের সহজানন্দ যে বিমূঢ়তারই একটা নামান্তর নহে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবারও প্রয়োজন রহিয়াছে,—সুতরাং সংশয়ের কষ্টি-পাথরে একবার যাচাই করিয়া লওয়া সর্বদাই অবিমিশ্রভাবে দুষণীয় নহে।

সেদিনকার সেই সন্ধ্যারতি সত্য সত্যই ভাল লাগিয়াছিল, ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই তাহার স্মৃতি বহু দিন মনে জাগ্রত রহিয়াছে। আর এই ভাল লাগা চিত্তের উপরে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া সংশয়দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই ভাল লাগার খাঁটি অংশই বা কতটুকু, আর তাহার ভিতরকার খাদই বা কতটুকু তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এ সম্বন্ধে আমায় সংশয় যাহা তাহাকে বাক্যের কুজ্ঝটিকাজালে আবৃত না করিয়া খুব স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, তাহা এই যে, সেদিনকার সেই সন্ধ্যারতি যে আমার এত ভাল লাগিয়াছিল সেই ভাল লাগার স্বরূপটি অবিমিশ্র কি না। অবিমিশ্র কি না এই প্রশ্ন আদৌ কেন উঠিতেছে, তাহার কারণ হইল, সন্ধ্যারতিকে যে ভাল লাগা তাহাকে সাধারণতঃ আমরা একটা বিশেষ পরিবেশে কিছু কিছু বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা উদ্রিক্ত ভগবদ্-ভক্তিরই একটা বিশেষ প্রকাশ বলিয়া মনে করি। এখন প্রশ্ন এই, এই ভালা লাগা ভগবদ্-ভক্তিরই রূপান্তর, না আমাদের লৌকিক কোনও চিত্তবৃত্তিরই রূপান্তর।

আধুনিক বিশ্লেষণী বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া যাঁহারা স্পষ্টবাদী সাজিতে চান তাঁহারা বলিবেন, সেদিনকার সন্ধ্যারতি ভাললাগার আসল রহস্যটি সম্ভবতঃ মন্দিরস্থ দেবমূর্তি ততখানি নয় যতখানি হইল সেই কুমারী-মূর্তি, তাহার সদ্যঃস্নাত রূপ তাহার এলায়িত কেশদাম। পঞ্চপ্রদীপের আবছা আলোতে দেবতার মূর্তি হয়ত আমার চিত্তের অন্তঃস্থলে ততখানি রহস্যময়ী হইয়া ওঠে নাই যতখানি রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছিল সেই কুমারী মূর্তি। এই কুমারীর প্রাত একটা সহজাত আকর্ষণ আমাদের চৈতন্যের এত গভীর তলদেশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে সর্বক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট চেতনলোকের ধ্যান-মননের মধ্যে তাহা ধরা পড়ে না। আমাদের সমাজবোধ এবং সেই সমাজবোধ হইতে উদ্ভূত

নীতিবোধের খবরদারীতে আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি সর্বদাই সন্ত্রস্ত; সুতরাং ছদ্মবেশে আত্মগোপন করার একটা চেষ্টা তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ফলে আমাদের স্থূল বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি এই রকম করিয়াই নিরন্তর আত্ম-গোপনের প্রচেষ্টায় সূক্ষ্মরূপে রূপান্তরিত হইতে থাকে; এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই জাগিয়া ওঠে আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিনিচয়, আমাদের সৌন্দর্যবোধ, আমাদের নীতিবোধ—এমন কি আমাদের শ্রেয়োবোধ।

সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার বলিষ্ঠতাকে আমি জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য বলিয়া মনে করি; এ-বিষয়ে কোনও আপোষ-মীমাংসা বা চোখঠাঁরে আত্ম-প্রতারণাকে আমি চরিত্রের মৌলিক দুর্বলতা বলিয়া মনে করি। এই জন্য নিজের মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি, আধুনিক মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টি লইয়াই মনকে বিচার বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে বিচার-বিশ্লেষণ আমাকে নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছে।

ভাবিয়া দেখিলাম, একথা হয়ত সত্য যে সেদিনকার সেই সন্ধ্যারতির পরিবেশের ভিতরে আর সবই ঠিক থাকিয়া যদি আরতির লোকটি পৃথক্ হইত, অর্থাৎ একটি তরুণী কুমারী আরতি না করিয়া যদি একটি বৃদ্ধা বা বৃদ্ধ আরতি করিত, তাহা হইলে আমার ভাল লাগার ভিতরেও একটা তারতম্যের সম্ভাবনা ছিল; বৃদ্ধ বা বৃদ্ধ না হইয়া একটি তরুণ কুমার হইলেও ভাল লাগার পার্থক্য হইতে পারিত, তরুণী কুমারীটি মোটামুটি-ভাবে সুন্দরী না হইয়া কুৎসিত হইলেও হয়ত এই ভাল লাগার কিঞ্চিৎ পার্থক্য হইতে পারিত। এখানে তাহা হইলে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, যে ভাল লাগার কথা বলিতেছি তাহার উদ্রেকের প্রতি মুখ্য কারণ দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার পরিবেশের ভিতরে সেই কুমারী

মূর্তিটি, মন্দিরস্থ দেবমূর্তিটি একান্তভাবে গৌণ; দ্বিতীয়ভাবে বলা যাইতে পারে, সেই ভাল লাগার মুখ্য কারণ যদি দেবমূর্তিও হয় তবে তাহার পরিপুষ্টি এই কুমারী-মূর্তিতে।

আমার বিচারে এখানে আমি আমার চিত্তের ভাললাগার মুখ্য কারণ দেবমূর্তিকেই বলিব। কিন্তু আমার সে সিদ্ধান্তকে ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ অপর সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করিয়া লইতেছি, অর্থাৎ এই কথাই যেন সত্য, সেদিনকার সন্ধ্যারতিকে অবলম্বন করিয়া আমার চিত্তের যে মুগ্ধতা তাহার ভিতরে নারীর প্রতি আমার পুরুষচিত্তের অবচেতন এবং অচেতন লোকে যে সহজাত আকর্ষণ তাহাই আসল কথা, আনুষঙ্গিক আর সকলই হইল, সমাজ-সংসার এবং তাহার সঙ্গে নিজেকেও ফাঁকি দিবার সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌশল। এই মতবাদের প্রথম অংশটা যদি বা কোনও রকমে স্বীকার করিয়া লই, দ্বিতীয় অংশটিকে কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

নারীর প্রতি পুরুষচিত্তের সহজাত প্রবল আকর্ষণের কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। অনেকে এই সত্যটিকেই আরও অনেক বাড়াইয়া লইয়া বলিয়াছেন, মানুষের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সর্বপ্রকারের চিত্তবৃত্তির কেন্দ্রবিন্দু হইল মানুষের যৌন প্রবৃত্তি। এই উক্তিটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও যে বিশেষ দৃষ্টান্তটি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি সেই দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ করিলে আরও অনেক ভাবিবার কথা মিলিবে।

মানুষের যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ভোগে; কিন্তু মানুষের মধ্যে সর্বদাই এই বিপরীত সত্যটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আনন্দের গভীরতা এবং মহিমা শুধু ত্যাগের পথে। নর-নারী যে যাহাকে ভালবাসে তাহারা পরস্পরকে শুধু ভোগ করিয়া ত আনন্দ পায় না। যদি সমাজ-সংসারের কোনও ভয় সঙ্কোচ বা বাধা না-ই থাকিত তবেও কি আমরা পরস্পরকে শুধু ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে

পারিতাম? নিখিল মানবের জীবনেতিহাস এই কথারই সাক্ষ্য দিবে যে মানব-জাতির ভিতরে যেখানেই নর-নারীর যৌন-আকর্ষণ প্রেম-পর্যায়ে উন্নীত হইয়া রহস্যময়, উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই দেখিতে পাই শুধু ত্যাগের মহিমা।

আমার পুরুষচিত্তে নারীর প্রতি যে সহজাত আকর্ষণ তাহাই আমার মনুষ্যধর্মের ভিতরে একক বা প্রধান সত্য নহে। একটি কুমারীর প্রতি আমার যে সহজাত আকর্ষণ তাহাও নিস্তব্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে দেবমূর্তির সম্মুখে অমন করিয়া মহিমান্বিত হইয়া ওঠে কেন? সন্ধ্যারতির পঞ্চপ্রদীপের আলোতে তাহার মূর্তি অমন করিয়া উজ্জ্বল হইয়া ওঠে কেন? আমি বলিব, এখানকার সত্য এই, আমি যদি নারীকে চাই তবে তাহাকে সন্ধ্যার বন্দনা-সঙ্গীতের দ্বারা সুরময় করিয়া পাইতে চাই, তাহাকে আরতির পঞ্চপ্রদীপের মঙ্গল আলোতে উজ্জ্বল করিয়া পাইতে চাই—তাহাকে দেবমূর্তির সম্মুখে পূজারিণীরূপে দেখিতে অধিক আনন্দ লাভ করি। ইহা সমাজভয় বা নীতির বন্ধন এড়াইবার চেষ্টা নহে, ইহাই মানুষের স্বধর্মের ভিতরে মহত্ত্বার বীজ।

দেবমূর্তির সম্মুখে মঙ্গলারতি-রতা কুমারী-মূর্তি মানুষের চিত্তে যে ভাল লাগার সৃষ্টি করে, আর লৌকিক ভোগমূর্তিতে একটি নারী পুরুষচিত্তে যে ভাল লাগার সৃষ্টি করে এই উভয়বিধ ভাল লাগার ভিতরে একটা স্পষ্ট প্রকারগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের সৃষ্টি হইল কিরূপে? দেবমূর্তির আত্মগত মহিমা কি আছে না আছে জানি না, কিন্তু আমি সেই দৃষ্টিতেই দেবমূর্তিকে অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত বলিয়া অনুভব করিয়াছি যে দৃষ্টিতে সে মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রেয়োবোধের প্রতীক। মানুষের প্রকৃতির ভিতরেই যে একটা শ্রেয়োবোধ নিহিত আছে তাহাই মানুষের দেবতা। নারীমূর্তিকে দেবমূর্তির সম্মুখে মহিমান্বিত দেখিবার আগ্রহ মানুষের এই জন্যই যে, মানুষ তাহার

যৌন-বৃত্তিকেও শুধু মাত্র একটা জৈবিক এষণারূপে ক্ষুদ্র এবং ঘৃণ্য করিয়া রাখিতে চায় না, তাহার জৈবিক এষণাকেও সে তাহার পরম শ্রেয়োবোধের সহিত যতটা সম্ভব যুক্ত করিয়া রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত করিয়া ফেলিতে চায়। এইখানেই প্রবাহিত মানুষের চিত্তে উদ্গতির বা উর্ধ্বগতির ধারা। জীবনে যাহা পরমশ্রেয়োবোধের সহিত যুক্ত হইয়া মহিমান্বিত না হইতে পারিল, তাহাই রহিল শুধু মাত্র মর্ত্য হইয়া, ঘৃণ্য পঙ্কধর্মী হইয়া; যাহা পরমশ্রেয়োবোধের স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহাই হৃদয়ের ভিতরে প্রস্ফুটিত হইল শুভ্র শতদল রূপে—তাহাই মানুষকে দান করিল তাহার অমৃত-সত্তা। মানুষ একটি অশরীরী শ্রেয়োবোধ মাত্র নহে,—সে মানুষ তাহার রক্তমাংসের দেহ—তাহার প্রবৃত্তিধর্মী মন—তাহার সকল ভাবময় সত্তা লইয়া। যৌন-বৃত্তি মানুষের জীবনের সত্য, কিন্তু একক সত্য ত নহেই—সে প্রধান সত্যও নহে, প্রধান সত্য মানুষের প্রকৃতিতে একটা মহত্তার বীজ—নিরন্তর একটা উদ্গতির প্রবল প্রেরণা, সে প্রেরণা মানুষকে শুধু সামাজিক বিধি-নিষেধই শিক্ষা দেয় নাই—শুধু শুষ্ক নীতিবাদের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে-ললাটে বাঁধিয়া রাখে নাই; সে প্রেরণা স্পর্শমণির মতন জীবনের সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তিতে ছোঁওয়া লাগাইয়া জীবনকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছে।

আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম, সেদিনকার সন্ধ্যারতিকে অবলম্বন করিয়া আমার গভীর ভাললাগার ভিতরে আমি মন্দিরের দেবতাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছি—আধুনিক পন্থায় মনঃসমীক্ষণের পরেও। এখানে আগে আমার দেবতার ধারণাটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমার অন্তর্নিহিত শ্রেয়োবোধের প্রকাশ যাহার ভিতরে তাহাই আমার ইষ্টমূর্তি—তাহাই আমার দেবমূর্তি। কোনও নারীমূর্তিকে যদি আমার এই পরম শ্রেয়োবোধের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলাইয়া লইতে

পারিলাম তবে সে নারী মূর্তিত' সেই পরিমাণে ইষ্টময় হইয়া দেবতার সহিতই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ওঠে। নারীমূর্তিও যে দেবমূর্তির সহিতই মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে ইহাই মানুষের চিত্তধারার উদ্গতির ফল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নামে অনেক সময়ই একটা ভাব দেখা যায়, আমাদের প্রবৃত্তির অংশটাই যেন আমাদের প্রকৃতির আসল অংশ, আমাদের চিত্তের উদ্গতির অংশটাই যেন একটা আরোপিত নকল অংশ। এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছুই দেখিতে পাই না, পরন্তু ইহা দ্বারা অযথা আমরা মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া বসি। প্রবৃত্তিও আমাদের যেরূপ চিত্তধর্ম, উদ্গতিও সেইরূপই আমাদের চিত্তধর্ম। মানুষের জীবনের যাহা কিছু মহত্ত্বা তাহা তাহার চিত্তধারার উদ্গতির ভিতর দিয়াই লব্ধ; এই উদ্গতি যদি তাহার জীবনের সত্য না হইত, তবে মানুষের জীবনের মহত্ত্বার অংশটিই মানুষের জীবনের সত্য হইয়া উঠিতে পারিত না।

কে বড় কে ছোট

শীতের সকাল। তখনও লেপ মুড়িশুড়ি দিয়া বিছানায় একটা অর্ধশায়িত, অর্ধ উপবিষ্ট ভাব। এটা আমার ঠিক অভ্যাস নয়, খানিকটা যেন বাধ্য হইয়া। যে ভাড়াটে বাড়িতে আজ সুদীর্ঘ একযুগেরও অধিককাল অবস্থিতি, এবং যেখান হইতে সমপরিমাণ ভবিষ্যৎ কালের ভিতরে কোনও প্রকার নড়চড় হইবার সম্ভাবনা বিশেষ কোনও দৈবদুর্বিপাকবশতঃ ভিন্ন দেখিতেছি না, সেই বাড়িতে সপরিবারে যখন আবির্ভূত হই তখন এই বাড়ির দুইটি বৈশিষ্ট্য বহুধা কীর্তিত হইতে শুনিয়াছি; ইহার ভিতরে সর্বপ্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল, এখানকার গৃহগুলি বেশ আলোহাওয়া-যুক্ত। তথ্য যে একটিও অসত্য এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু 'নন্দলালের মন্দ কপাল' বশতঃ সব গুণগুলিই বিপরীতভাবে আসিয়া দেখা দিতেছিল। বাড়িতে আলো যথেষ্টই আছে, কিন্তু তাহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে; অর্থাৎ এই দুইমাসে উত্তরায়ণের সূর্য এক বক্রপথে দিনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাল পর্যন্ত অকৃপণভাবে এমন প্রখর আলো বিকীরণ করিতে থাকেন যে দক্ষিণের বারান্দায় পা দিলে পা সত্য সত্যই পুড়িয়া যায়, ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া অর্ধসিদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু দক্ষিণ দিকটি ঘরবাড়ি এবং পাঁচিলে একেবারে নিরন্ধ্র ভাবে আটকা থাকাতে ফাল্গুন হইতে ছ' মাস পর্যন্ত চিত্তচঞ্চলকারী দক্ষিণ সমীরণের প্রবেশ একান্তভাবেই নিষিদ্ধ। দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর গতি আবার নিষিদ্ধ হইয়া যায়, এবং বাড়ির উত্তর দিকটি সম্পূর্ণ খোলামেলা থাকিবার জন্য হাওয়ার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আরম্ভ হইয়া যায়। ফলে সংক্ষিপ্ত ভাবে দাঁড়ায় গিয়া এই, সমস্ত মাঘ মাসটিতে এ বাড়ীতে সর্বপ্রকারের আলোর গতিবিধি থাকে একান্তভাবে নিষিদ্ধ;

আর উত্তর দিক হইতে অযাচিতভাবে তীব্র শির্ শির্ হাওয়া প্রাণকে মশগুল না রাখিলেও মাতাইয়া রাখে সারাদিন—সারারাত।

এই হাওয়ার আজ বড় প্রাবল্য সুতরাং পড়ার ঘরে আজ শুধু মন বসিতেছে না নয়, দেহও বসিতেছে না; তাই লেপ মুড়ি দিয়া শোবার ঘরেই কিঞ্চিৎ আরামের আমেজ লাগাইতেছি। অবস্থান বৈচিত্র্যের জন্য গঠন বৈচিত্র্যেরও একটা আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিতেছি, টানিয়া লইলাম একখানি বিজ্ঞানের বই। পড়িতেছিলাম বিবিধ নীহারিকা-পুঞ্জের ইতিহাস—তাহাদের বিচিত্র অবস্থান ও পরিণতির কথা; পড়িতেছিলাম গ্রহ-উপগ্রহ এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ এবং দূরত্বের কথা—যাহার গাণিতিক রূপ একটা চোখের সামনে ভাসে বটে—মন তাহার একটা ধারণা করিতে গিয়া অসীম শূন্যে নিরালম্বভাবে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু মাত্র একটা বিস্ময়ের বিমূঢ়তা লইয়া ফিরিয়া আসে। বিশেষ করিয়া এবং বার বার করিয়া মনে পড়িতেছিল একটি নক্ষত্রের কথা, যে নাকি পৃথিবীর জন্মক্ষণে পৃথিবীর জন্য সোনালী আলোর উপহার পাঠাইয়াছে; প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে সে পৃথিবীর দিকে আসিতেছে; কিন্তু শূন্যের দূর পথ অতিক্রম করিয়া সেই আলোকের উপহার আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উপকূলে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই! নিখিল শূন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে শুধু এই রকমের অসংখ্য নীহারিকা-পুঞ্জ, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী—গ্রহ-উপগ্রহ—নক্ষত্র! নিখিল শূন্যে নিরন্তর চলিতেছে কি আলোড়ন। ইহার ভিতরে কত ছোট আমাদের পৃথিবী—কত ছোট তাহার বুকে মানুষ—কত ছোট আমাদের ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি! আবার জানিলাম, যে সর্পিল নীহারিকার একপ্রান্তে আমাদের সৌরজগৎ বাসা বাঁধিয়াছে সেই নীহারিকারই দশ লক্ষ 'আলোকবর্ষে'র দূরত্বে বিরাজ করে তাহার নিকটতম পরশী 'উত্তরভাদ্রপদ-নীহারিকা'।

এই শূন্যের নেশা আমাকে মাঝে মাঝে একেবারে পাইয়া বসে; অনেকখানি যেন গুলিখোরের নেশা! মৃদু মৃদু মাথা ঘোরে—যত ঘোরে ততই নেশার আমেজ জমিয়া ওঠে; একটা ধারণাতীত দূরত্বের মধ্যে, একটা নিঃসীম দেশহীন, কালহীন বিরাটত্বের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের চারিপাশের পৃথিবীটাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলি!

কিন্তু এত বিরাট মহাকালের পায়ে আবার টিক্‌টিক্ করা ঘড়ির ঘুঙুর বাঁধিয়া দিয়াছে কোন্ মানুষ! একটু স্তব্ধ হইয়া মহাকালের বিরাট রূপ, বিরাট মহিমার কথা ভাবিব তাহার সাধ্য নাই—কানে আসিতেছে অস্ফুট শব্দ—টিক্ টিক্ টিক্। ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। ক'টা বাজে? দেখিলাম, প্রায় ন'টা। গা ঝাড়া দিয়া প্রায় লম্ফ দিয়া বিছানা হইতে নীচে নামিলাম এবং হৈ চৈ দ্বারা নিজেই একটা কোলাহল বাধাইয়া দিলাম! এত বেলা হইয়া গিয়াছে? আজ যে শ্রীমান পুত্রকে প্রথম স্কুলে ভর্তি করাবার চেষ্টায় বাহির হইতে হইবে, দশটায় যে ভর্তির পরীক্ষা আরম্ভ! কোথায় রহিল কোটি কোটি 'আলোকবর্ষে'র দূরত্বে অবস্থিতি নক্ষত্র—কোথায় সেই উত্তরভাদ্রপদ-নীহারিকা!—ঝট্‌পট্ স্নানাহার সারিয়া সস্ত্রীক এবং সপুত্র বাহির হইয়া পড়িলাম।

স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়া দেখি, সে আর এক এলাহী কাণ্ড! তিনশতাধিক শিশু পরীক্ষার জন্য জমায়েৎ হইয়াছে, তাহাদের বয়স ছয় হইতে আটের মধ্যে। প্রায় প্রত্যেক শিশুরই দুই পাশে একটি করিয়া মা ও একটি করিয়া বাপ। উদ্বেগ, ব্যস্ততা, চঞ্চল সঞ্চরণ প্রভৃতির ফলে ভাল করিয়া বোঝা যাইতেছে না, পরীক্ষা কাহাদের—ঐ শিশুদের না তাহাদের পিতা-মাতার! পরীক্ষার সময় আসন্ন—মা-বাপগণ নিজের নিজের বৎস লইয়া বিভিন্ন পরীক্ষা কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমি আমার পুত্রকে লইয়া যখন একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সকল মা-বাপগণ নিজের নিজের পুত্রের কাছে দাঁড়াইয়া রীতিমতন

হন্তদন্তভাবে উপদেশ এবং নির্ভয় দিয়া যাইতেছেন। ইহার ভিতরে আবার একটি শিশুকে বিশেষ করিয়া চোখে পড়িয়া গেল, সে বোধ হয় প্রতিযোগিগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ফুট্‌ফুটে সাদা রঙ্, কালো কুচকুচে কোকড়ান চুল, দুই গালে গোলাপী আভা। তাহার মা-বাবা তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শুনাইয়াও স্থির করিয়া বসাইতে পারিতেছে না, আসন্ন পরীক্ষার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে একটা হিংস্র জন্তুর গোঙানির মতন ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; এবার মা-বাবাদের বাহিরে চলিয়া যাইবার পালা, কিন্তু সেই শিশুটি তাহার পাশে দাঁড়ান মায়ের গায়ে ঠেস দিয়া নিশ্চলভাবে হেলিয়া বসিয়া রহিল। মা তাহাকে কত আদর করিতেছে, সর্বাঙ্গে স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে, কাছে টানিয়া চুমু খাইতেছে,—কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ছাড়াইতে পারিতেছে না! কিন্তু আর ত নয়, দেরী হইয়া যাইতেছে,—পরীক্ষকগণের নিকট হইতে তাড়া আসিতেছে···মা এবারে জোর করিয়াই যেন শিশুটিকে টান করিয়া বসাইয়া দিয়া তাহার কপালে আবার চুমু খাইয়া বাহির হইয়া আসিল। শিশুটি যেন একান্ত অসহায়ভাবে মায়ের দিকে তাকাইয়া রহিল, কক্ষ হইতে বাহির হইবার পথে মা আর একটিবার শিশুটির দিকে তাকাইল—যখন বাহির হইয়া আসিয়াছে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দুই চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

গুটি গুটি স্কুল-গৃহের বাহিরে অপেক্ষমাণ মা-বাবাগণের সহিত বাহিরে উন্মুক্ত মাঠে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেন যেন বার বার মনে পড়িয়া যাইতেছিল সেই লক্ষ লক্ষ 'আলোকবর্ষে'র ব্যবধানে অবস্থিত সেই নক্ষত্রটির কথা—যাহার আলো এখনও অন্তহীন শূন্য পার হইয়া আসিয়া পৃথিবীর বুকে পৌছাইতে পারে নাই ;—মনে পড়িয়া যাইতেছিল দশ লক্ষ 'আলোকবর্ষে'র দূরত্বে অবস্থিত নিকটতম নীহারিকা-পড়শী

'উত্তরভাদ্রপদ-নীহারিকা'র কথা। কে বড়, কে ছোট! সেই সুদূরের নামহারা নক্ষত্র, না এই নিকটের শিশুটি? কাহার রহস্য অজ্ঞেয়তর? সেই নক্ষত্রের না এই শিশুটির? কাহার বিস্তৃতি অন্তহীন? নিখিল শূন্যের, না এই মায়ের বুকের? কে বিরাট—কে বিস্ময়কর,—নিখিল শূন্য, না মর্ত্ত্যের এই মা? মৃদু মৃদু পদসঞ্চারণ করিয়া অনেক ভাবিলাম—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—কে বড়, কে ছোট? সেই সুদূরের নক্ষত্র—এই নিকটের শিশু,—সেই নক্ষত্রকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে অন্তহীন নিখিল শূন্য—আর এই শিশুকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছে যে স্নেহময়ী মা—আমার মনের মধ্যে ইহারা কেমন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল!

সংসারের কে বড় কে ছোট—এই প্রশ্নটা ঠিক এই ভাবেই আর একদিন আমার মনকে গভীর করিয়া নাড়া দিয়াছিল। সে অনেকদিন আগের কথা। বড়দিনের ছুটির সহিত আরও কিছুদিন ছুটি মিলাইয়া প্রায় কম্বল-সম্বলে বাহির হইয়া পড়িয়াছি পশ্চিমে বেড়াইতে। আগ্রা, দিল্লী ঘুরিয়া হরিদ্বারে গিয়া সপ্তাহখানেক ধর্মশালায় আস্তানা গাড়িয়া আছি। একদিন বিকাল বেলায় নিকটস্থ মনসা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছি। মনসা পাহাড়ের চূড়ায় একটি মনসার মন্দির রহিয়াছে, তাহার ভিতরে একখানি পাথরের মনসা দেবী। মনসা দেবী বাঙলা এবং তাহার প্রতিবেশী ভূভাগেরই দেবী বলিয়া একটা ধারণা ছিল; কি করিয়া আবার সেই দেবীর প্রতিষ্ঠা হইল হরিদ্বারের পাশের পাহাড়ে তাহা আজও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। পাহাড়ের চূড়ার মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিতেছিলাম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! যত দূর চোখ যায় শুধু ছোট ছোট পাহাড়—সেই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া মাঝখান দিয়া প্রবাহিত শুভ্র রজতধারার ন্যায় গঙ্গার খরস্রোতা প্রবাহ। চুপ করিয়া কান পাতিয়া থাকিলে কানে আসিয়া পৌঁছায় একটা অশ্রুত-

পূর্ব ঐকতান—উপলবন্ধুর পথে কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়া ছুটিয়া-চলা বহুস্রোতের ঐকতান—শীতের শির্‌শির্‌ বাতাসের সহিত মিশিয়া সে অপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

পাহাড়ি দেশের এই জাতীয় অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম, সুতরাং আনন্দের এবং বিস্ময়ের সীমা নাই। আনমনা হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন যে একেবারে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে লক্ষ্য করিতে পারিলাম না; সে জিনিষটা সম্বন্ধে খেয়াল হইল যখন একটা তীব্র কন্‌কনে শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। একটু ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি নামিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এই পাহাড়ে উঠিবার বা নামিবার ভাল কোনও পথ নাই, থাকিলেও আমি জানি না; সুতরাং খাড়া পথে প্রায় ছ্যাচড়াইয়াই নামিতেছিলাম; হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম, গড়াইয়া পড়িলে অনেক নীচুতে পড়িয়া যাইতাম, কিন্তু হাতের কাছে একটা গাছের শিকড় পাইয়া কোন রকমে টাল সামলাইয়া গেলাম। শিকড়টি ধরিয়া প্রায় ঝুলিয়াই কোথাও পা আটকাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার কাছে আগাইয়া আসিয়াছেন,—আমার দুরবস্থা দূর হইতে দেখিয়াই বোধ হয় আগাইয়া আসিয়াছেন। আমি ততক্ষণে পা দু'খানি অসমভাবে দুইখানি পাথরে রাখিয়া সটান দাঁড়াইয়াছি। ভদ্রলোক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার দিকে একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাইয়া আমার আপাদমস্তক যেন একবার দেখিয়া লইলেন। তারপরে আমাকে রূঢ়ভাবে বলিলেন, তুমি কখনও পাহাড়ে চড়িয়াছ? আমি একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, না। তনি বলি লন, তা' তোমাকে দেখিয়াই বেশ বোঝা যায়; তুমি একটা শক্ত চামড়ার জুতা পায় দিয়া হাতে কোনও লাঠি না লইয়া বোকার মত কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে? এখনই ত গড়াইয়া একদম নীচে পড়িয়া যাইতে। নিজের অজ্ঞতা এবং অপটুতার জন্য

একটা সঙ্কোচ এবং অপমান বোধ করিতেছিলাম, তবু অমনভাবে একটা অপদার্থ প্রমাণিত হইতে মোটেই ইচ্ছা হইল না, একটু বাহাদুরী কণ্ঠেই বলিলাম, পাহাড়ে উঠিতে নামিতে আমিও জানি, আজ বড় বেশী শীত পড়িয়াছে, শীতের হাওয়ায় আমার হাত-পা কাঁপিতেছে, সেই কারণেই আমার ঐরূপ একটু পড়ি পড়ি ভাব হইয়াছিল। ভদ্রলোক বলিলেন, 'শীত পড়িবে না? এই তিন চার দিন যাবৎ মুসৌরী পাহাড়ে যে বরফ পড়িতেছে: বরফে বরফে যে সমস্ত শহর ঢাকা পড়িয়াছে, আমি নিজে সেখানে থাকিতে না পারিয়া পরশু নীচে নামিয়া আসিয়াছি।' আমি চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ যদি আমি মুসৌরী রওনা হইয়া যাই তবে আমি গিয়া বরফ দেখিতে পাইব?' লোকটি আমার প্রতি আর একটি তীব্র ভর্ৎসনাদৃষ্টি পাত করিয়া বলিলেন,—'তুম তো বিলকুল 'বাউরা' (পাগল) আদমি হো'; বলিয়াই তিনি একজোড়া দড়ির জুতা পায়ে, ছুচাল একটা লাঠিতে ভর দিয়া প্রায় গড়্গড়্ করিয়াই পথ বাহিয়া চলিয়া গেলেন।

ধর্মশালার সার্বজনীন খাটিয়ার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি। ভাল ঘুম হইতেছে না, বারবার করিয়া জাগিয়া উঠিতেছি। পশ্চিমের একটা জানালার একটি পাটের উপরের দিকের কবজাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং আঁটিয়া বন্ধ করিলেও কিছুটা ফাঁক হইয়া থাকে। সেই ফাঁক দিয়া ডাইনী বুড়ী যেন লম্বা সরু একটা হিমেল হাত বাড়াইয়া দিয়া খানিকটা আঁচড়াইয়া লইতেছে। পাতলা ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্ন দেখিতেছি—বরফ শুধু বরফ—পাহাড়-পর্বত—মাঠ-ঘাট গাছ-পালা সব বরফে ঢাকা পড়িতেছে। আকাশ হইতে নীচের দিকে টুপ্ টাপ্ ধুপ্ ধাপ্ নামিয়া আসিতেছে শুধু বরফ, ছোট বড়-মাঝারি, চৌকা, ত্রিভুজাকার, বৃত্তাকার—বাঁকা-তেড়া-ছুঁচলো। সারা রাত বরফ পড়িতেছে, রাত্রে না হয় দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতরেই

রহিলাম; কিন্তু দিনের বেলা? খাবারের খোঁজেও ত বাহির হইতে হইবে। বাহির হইব কেমন করিয়া? সারা দিন যে বরফ পড়িতেছে—টুপ্‌ টাপ্‌, ধুপ্‌ ধাপ্‌—ছোট বড় গাছ পালা ভাঙিয়া বরফ পড়িতেছে, বাড়িঘরের ছাদ ভাঙিয়া বরফ পড়িতেছে—কোথাও কোথাও পাহাড়ের স্তূপের ন্যায় বরফ জমিতেছে—কোথাও ধ্বসিয়া ভাঙিয়া যাইতেছে—শক্ত পাথরের উপর পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেছে। বরফের নীচে চাপা পড়িয়া আছে কত মানুষ—কত পশু-পাখী! পরক্ষণে আবার ছবি ভাসিয়া ওঠে—ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, পথ-ঘাট ছাইয়া গিয়াছে সাদা ধবধবে নরম পেঁজা তুলার মতন বরফে—আকাশ হইতে পেঁজা তুলার আঁশের মতন ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়া পড়িতেছে শুধু বরফ।

ছেলেবেলায় বরফ সম্বন্ধে ধারণা ছিল শক্ত চৌকো একটা বড় খণ্ডের মত—অথবা তাহাকে ভাঙিলে যে টুকরা টুকরা বিবিধ আকৃতির খণ্ড হয় তাহারই মত। সুতরাং যখন পাহাড়ে বরফ পড়ার কথা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি তখন শিলাবৃষ্টির অভিজ্ঞতাটাকেই মনে মনে সহস্রগুণে বাড়াইয়া লইতাম। মনে করিতাম, এই শিলাই আরো বড় হইয়া বড় ডেলার মত, অথবা বিবিধাকৃতিতে খণ্ড খণ্ড হইয়া টুপ টাপ ঝুপঝাপ করিয়া পড়িতে থাকে। শৈশবে এইরূপ বরফ-পতনের কল্পনা মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভয় এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করিত। বরফ-পতনের এই ধারণা এবং তাহার সম্বন্ধে ঐ জাতীয় একটা বিস্ময়বোধ আমার বহুদিন পর্যন্ত ছিল। তারপরে খানিকটা লোকমুখে—খানিকটা বই পড়িয়া পেঁজা তুলার মতন সত্যকার বরফ-পতনের ধারণাও কম বিস্ময় এবং কৌতূহলের সৃষ্টি করে নাই। মনের মধ্যে দুই জাতীয় বিস্ময়ই জড়ীভূত হইয়া আছে—সারারাত ধরিয়া তাহারই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

সারারাত ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন দেখিয়া শেষ রাত্রে কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলাম। অত শীতের ভিতরেও শরীর যেন গরম

হইয়া উঠিল। কম্বল ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম, টর্চ দিয়া দেখিলাম ঘড়িতে সাড়ে চারটা; চট্‌পট্ করিয়া লটপটটুকু গুছাইয়া বাঁধিয়া ফেলিলাম। সাড়ে পাঁচটায় দেরাদুনের গাড়ী আছে; সুতরাং যাহাকে বলে আস্ত একটি 'কাঁধে বোঁচকা ঞ'—ঠিক তাহাই সাজিয়া স্টেশনের দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম।

দেরাদুন স্টেশনে পৌছিয়া স্টেশনের উপরেই একটি পাঞ্জাবী হোটেলে ঠাঁই করিয়া লইলাম। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমার সহজাত বাঙালী প্রবৃত্তি বশতঃ একটি কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। গরম জলে স্নান করিয়া খাইবার জন্য যখন গিয়া টেবেলে বসিয়াছি তখন শুভ্র একখানি প্লেটের উপরে সাজান দেখিলাম শুভ্র সরু ঝুরঝুরে এগুলি কি? হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, ভাতই ত বটে! প্রায় ইঞ্চি খানেক লম্বা সরু সরু ঝুর ঝুর করিতেছে শুভ্র ভাত! কয়েকদিন পর পর রুটি-পুরীর পরে এই ভাত—চোখ জুড়াইল, প্রাণ এবং আত্মা অবধি পরিতৃপ্ত হইল; খানিকক্ষণের জন্য হিমালয়ের চূড়ার শুভ্র বরফপতনও এই শুভ্র অন্নপতনের দ্বারা যেন ঢাকা পড়িয়া গেল! সেদিন অনুভব করিয়াছিলাম, বাঙালীর দেহ-মনে এই সব বাঙালী প্রবৃত্তির কি প্রবল প্রতাপ! এই বাঙ্গালী প্রবৃত্তির প্রবলতর রূপ দর্শন করিয়াছিলাম একদিন আগ্রার তাজমহলের সামনে বসিয়া। একজন খ্যাতনামা বাঙালী মনীষীর সঙ্গে আমি তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইচ্ছা করিয়াই আমরা সন্ধ্যাবেলায় তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। শীতের হিমের উপরে তৃতীয়া কি চতুর্থীর চাঁদ উঠিয়াছে; তাহারই আবছা আলোয় আমরা একটু দূরে বসিয়া তাজমহলের শ্বেতমর্মর রূপ দেখিতেছিলাম। সংলগ্ন মসজিদ হইতে থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুট আজানের ধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছিল। আমরা সেই শীতের মধ্যেই ঘণ্টাখানেক তন্ময় হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের সঙ্গের চাকরটি

একটু দূরে তাজমহলের সম্মুখস্থ ছোট্ট জলাশয়গুলির পাশে বসিয়া যেন কি দেখিতেছিল। সে সহসা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু, বাবু, একটা বস্ত বড় কই মাছ!" "কোথায়রে?" "বাবু, এই জলের মধ্যে।" পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য যে তাজমহল তাহার ভিতরের সেরা আশ্চর্য্য আমাদের চাকরটির কাছে "এত বড় একটা কই মাছ!" পরে শুনিলাম, বেচারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিস্ময়ের বস্তুটিকে দেখিতেছিল; কিন্তু তাহার হৃদয়ের অপার আনন্দানুভূতিকে সে আর একার ভিতরে যখন কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তখনই অমন করিয়া আমাদের ধ্যানভঙ্গের জন্য দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছিল।

দেরাদুনের একজন প্রবীণ বাঙালীর কথা আমাকে অনেকেই বলিয়াছিলেন; বিকালের দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার সহিত গিয়া দেখা করিলাম। তাহার ব্যবহারে সত্যই মুগ্ধ হইলাম; বাঙালীকে বাঙালী এত ভালবাসে—ইহা যে একটা আবিষ্কার। মনে হইল, বোধ হয় বিদেশ বলিয়া; তৎসঙ্গেই মনে হইতে লাগিল, বাঙালী জাতি সর্বই যদি এমন করিয়া বিদেশ ছড়াইয়া পড়িতে পারিত তবে বাঙালীর মৌলিক প্রকৃতিতেই হয়ত বড় একটা পরিবর্তন দেখা যাইতে পারিত।

সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ পাইলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি তাঁহার নিকট আমার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিলাম—একবার বরফপাত দেখিতে মুসৌরী যাইব। তিনি হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বয়স কত?' প্রথমে আমি ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন,—'বলি বয়সটা পঁচিশের নীচে ত?' এইবারে ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিলাম; ভিতরে ভিতরে একটু অপমানও বোধ করিলাম।

জিনিসটা তিনি বুঝিতে পারিলেন, স্বরটা মুহূর্তে বদলাইয়া লইয়া তিনি সদয়কণ্ঠে বলিলেন,—"এখন মুসৌরী যেতে কোনও যান বাহন মিলবে না, রাস্তায় এক হাঁটু বরফ জমে আছে। মুসৌরী সহরে এখন প্রায় লোক নেই, যারা সর্বদা থাকে তারাও প্রায় সবাই নীচে নেমে এসেছে; রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, হোটেল-রেস্তোরাঁ সবই বন্ধ।" তিনি আরও সাবাধান করিয়া দিলেন, আমার গায়ে গরম জামা-কাপড়ের যেরূপ অপ্রাচুর্য তাহাতে যদি কোনও রকমে একবার মুসৌরী পৌঁছাই-ই, তবে একেবারে সমগ্র প্রাণ লইয়া যদি টান নাও পড়ে, অন্ততঃ আঙ্গুলের অগ্রভাগ, নাকের ডগা, কানের লতি (নীচের অংশ) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ লইয়া টান পড়িবারই সম্ভাবনা। কিন্তু পোলাও খাইয়া এতক্ষণ যে স্নেহশীল সদাশয় ভদ্রলোকটিকে এত ভাল লাগিতেছিল তাঁহার ঠাণ্ডাস্বরের এই কথাগুলি একটাও ভাল লাগিল না। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। হোটেলে আসিয়াও বিবিধ রকমের লোকের সহিত পরিচয় করিতে লাগিলাম এবং আলাপের একটু প্রসঙ্গ করিয়াই মুসৌরীর কথা তুলিতে লাগিলাম, সকলেই মাথা নাড়িয়া, জিভ কাটিয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া অসম্মতি জানাইতে লাগিলেন। তা ছাড়া সত্য সত্য যাইবই বা কি করিয়া? খোঁজ করিয়া দেখিলাম, যানবাহনও সবই বন্ধ? তবে? তবে কাল প্রত্যূষের গাড়ীতে আবার অন্যত্র ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেই সঙ্কল্প লইয়াই রাত্রে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিন্তু ঘুম ত আর আসে না। সেই তুষারাবৃত হিমালয় আমার বহুদিনের স্বপ্নের ধন, তাহার অতি নিকটে আসিয়াও সে দৃশ্য একবার চোখে দেখিয়া যাইতে পারিব না! সারারাত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। প্রত্যূষের গাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া হইল না; সকাল ছয়টা হইতে আটটা পর্যন্ত লক্ষ্যবিহীন ভাবে—সঙ্কল্পহীন মনে শুধু স্টেশনের প্লাটফর্মে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছি—আর উত্তরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেছি, তুষারাবৃত নগাধিরাজ যেন হাতছানি দিয়া আমার দেহমনকে ডাকিতেছেন।

সহসা চোখে পড়িল কিছু কিছু লট-বহর এবং একটি কুকুর লইয়া এক প্রৌঢ়া মেম-সাহেব স্টেশনের পাশে একটি গাড়োয়ালী ড্রাইভারের সহিত কথা বলিতেছে। মেম-সাহেব কিসের কথা বলিতেছে? গাড়ী চাই? কেন, কোথায় যাইবে, মুসৌরী নয় ত? আগাইয়া গেলাম তাহাদের কথা শুনিতে। হ্যাঁ, সত্যই ত, এর বিশেষ দরকার, মুসৌরী একবার যাইতেই হইবে—যত টাকা লাগুক সে দিবে—যাইতে তাহার হইবেই। টাকার লোভে গাড়োয়ালী ড্রাইভার স্বীকার করিল; মেম-সাহেব তাহার মাল-পত্র এবং কুকুরটি লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় আমি আগাইয়া গেলাম। মেম-সাহেবের নিকটে গিয়া বলিলাম,—'ম্যাডাম, আমি তোমার সঙ্গে যাব।' মেম-সাহেব মুখ লাল করিয়া আমাকে ধমক দিয়া বলিল, 'ইডিয়ট্ কোথাকার, তুমি কোথায় যাবে?' আমি বলিলাম, 'মুসৌরী যাব'। 'কেন?' আমি বলিলাম, 'তুষারপাত দেখিতে।' ধমকে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া মেম-সাহেব মিষ্টিগলায় আমাকে সেখানকার অবস্থা, পথের অবস্থা এবং বিপদের সকল সম্ভাবনা বুঝাইয়া বলিতে লাগিল; কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, আমি নাছোড়বান্দা হইয়া গাড়ী ধরিলাম। বিরক্ত হইয়া মেম-সাহেব বলিল, 'তবে ওঠ।' আমি বলিলাম একমিনিট দেরী কর। বলিয়াই আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া হোটেল হইতে আমার শ্রেষ্ঠসম্বল কম্বলখানিকে লইয়া আসিয়া গাড়ীর এককোণে উঠিয়া বসিলাম।

বাস বা অন্যান্য মোটর গাড়ী সাধারণতঃ মুসৌরী শহরের পাদদেশে যেখানে গিয়া দাঁড়ায় সেদিন আমাদের গাড়ী সেখানে আগাইতে পারিল

না, বরফে রাস্তা ঢাকিয়া গিয়াছে। আমি নামিয়া পড়িয়া হাঁটিয়া চলিলাম, মেমসাহেব কি করিল জানি না।

এ যে সম্পূর্ণ এক নূতন দেশ। উপরে পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া দেখি, গাছপালার শাখাপল্লবের উপর এক বিঘতের অধিক পরিমাণ বরফের একটি প্রলেপ পড়িয়া আছে, ঘর বাড়ির ছাউনীর উপরেও সমপরিমাণ বরফের প্রলেপ। রাস্তার স্থানে স্থানে বেশ বরফ জমিয়া রহিয়াছে, দু'একস্থানে আমার পা নরম বরফের মধ্যে বসিয়া যাইতে লাগিল।

পাহাড়ের উপর উঠিতে অনেক কষ্ট হইল, খানিকটা উঠিয়া হাঁপাইয়া পড়িলাম, খানিকটা আবার একপাশে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিয়া আবার উঠিলাম। যখন পথ দিয়া চলিতেছি তখন মনে হইতে লাগিল—সেই ছেলেবেলাকার রূপকথার ঘুমের দেশের কথা; রাজপথে পথিক নাই—হাটে বাজারে লোকজন নাই—দুয়ারে দ্বারী নাই, হাতিশালে হাতী নাই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নাই—কোথাও গাছে একটা পাখী নাই। শুধু একবার দেখিলাম,—নীচের পথ বহিয়া একটি পাহাড়ী লোক একবোঝা কাঠ পিঠে বাঁধিয়া উপরে উঠিতেছে, আর এক জায়গায় কয়েকটি পাহাড়ী কাঠ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

একা একা অনেকক্ষণ এদিক সেদিক করিয়া একেবারে উঁচুতে উঠিয়া রাস্তার পাশে একটি বাঁধান বেঞ্চিতে বসিলাম। তখনও ঝুর্ ঝুর্ করিয়া পেঁজা তুলার আঁশের মতন বরফ পড়িতেছে—আমার গায়ের কোটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম বেশ পুরু হইয়া বরফ জমিয়া গিয়াছে—আবার ঝাড়িয়া লইলাম। এতক্ষণ আকাশ মেঘলা মেঘলা মতন ছিল—হঠাৎ সমস্ত কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া মাথার উপরে সূর্য দেখা দিল—যেন একটা পাতলা ময়লা সাদা চাদরে ঢাকা।

উত্তর মুখে ফিরিয়া বসিলাম,—চোখে পড়িল সে কি এক অখণ্ড বিরাট রূপ। যতদূর চোখ যায় অশান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন শুধু উঁচু

নীচু পাহাড় চলিয়াছে—সব শুভ্র তুষারে ঢাকা। তাহার উপরে পড়িয়াছে সূর্যকিরণ—দেবতাত্মা নগাধিরাজ যেন ঝক্‌ঝক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। প্রত্যক্ষ করিলাম মহাকবি কালিদাসের সেই প্রসিদ্ধ বর্ণনা,—'রাশীভূতঃ প্রতিদিনমেব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ'! এই বিরাট হিমালয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইলেন মহাকালের অধীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব; তাঁহার প্রতিদিনের অট্টহাসি যেন রাশীভূত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এই শুভ্র সৌর-করোজ্জ্বল তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের সীমাহীন বিস্তৃতিতে! সে কি বিস্তৃতি—সে কি শুভ্রতা—সে কি বিরাট্—সে কি গম্ভীর! অনন্তের সহিত প্রত্যক্ষ নিবিড় যোগে নিজের খণ্ডসত্তাকে হারাইয়া ফেলিলাম—বিরাটের সহিত মিলিয়া একাকার হইয়া সকল ভুলিয়া একটা বিরাট অস্তিত্বের ভিতরে অবস্থান করিতে লাগিলাম!

কিন্তু এই বিরাট অনুভূতির মাঝখানে হঠাৎ কি করিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল; সহস্রাধিক মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গের শস্য-শ্যামলা সমতলভূমিতে নদী-নালা বেষ্টিত আমার ছোট্ট বাস্তুভিটা ঘরবাড়ি! কত শ্যামল—কত স্নিগ্ধ—কত সুন্দর—কত মধুর। সম্মুখস্থ এই বিরাটের তুলনায় সে কত ছোট! কিন্তু তবু কত মধুর! সেই এককোণের নুইয়া-পড়া অন্ধকার-করা বাঁশবন, সেই সারি সারি নারিকেল গাছ—সুপারী বাগ—সেই কলাবন, তাহার মাঝখানে সেই লাউয়ের মাচা—শিমের মাচা, সেই জারুল ফুল আর কলমী ফুল—তাহার মাঝখানে ছোট ছোট আমাদের ঘরগুলি—ছোট খাটো সুখদুঃখে ভরা নীড়গুলি—সব যেন একসঙ্গে মনের ভিতরে জাগিয়া উঠিল। কত ছোট ছোট—কত কচি কচি—কত সুন্দর! একবার সম্মুখের অনন্ত শুভ্রবিস্তৃতির ভিতরে দৃষ্টি এবং অনুভূতিকে প্রসারিত করিয়া দিই—আমার ছোট্ট সুন্দর স্মৃতিগুলির ভিতরে ফিরিয়া আসে আমার ছোট আমিটি। কে বড়? কে ছোট? কিছুই বুঝিতে পারি না। তার পরেও একা একা বসিয়া অনেকদিন

ভাবিয়াছি—বুঝিতে পারি নাই। আজ অনুভব করিতেছি, সেই কোটী কোটী আলোকবর্ষের দূরত্বে অবস্থিত, পৃথিবী হইতে কোটী কোটী গুণে বড় নক্ষত্রটি এবং সেই গোলাপী আভাযুক্ত কচি শিশুটি—সেই নিখিল শূন্য আর সেই মায়ের নিঃসীম স্নেহভরা বুক—হিমালয়ের বুকে এই শুভ্র-বিস্তৃতি এবং আমার সেই ছোট পল্লীর ছোট্ট সুখ-দুঃখের নীড়গুলি—ইহারা আমার মনের মধ্যে কেমন একটা তুল্যমূল্য লাভ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছে!

শিশু হাসিল কেন

নেহাৎ বেড়াইতে যাওয়া। একটি মফস্বল শহর; শহর হইতেও ছ'সাত মাইল দূরে। চারিদিকে ছোট ছোট শালবন, তাহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাংলো নমুনার কয়েকটি বাড়ি। জনমানবের বিরল বসতি, লোকজনের আনাগোনাও কম। অনেক দূরে দূরে এখানে সেখানে আদিম জাতিগণের বাস, পথেঘাটে দেখা তাহাদের সঙ্গেই। চারিদিকে একটা স্নিগ্ধ নির্জনতা।

আমাদের দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল বছর তিনেকের একটি মেয়ে। সকাল বেলায় আমরা দল বাঁধিয়া এখানে সেখানে বেড়াইতেছি; কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, সারাটি সকাল মেয়েটি তাহার মায়ের গা ঘেঁষিয়া আছে। এতখানি অপরিচয় এবং নির্জনতা তাহাকে বোধ হয় আজ সকালে আরও অনেকখানি মায়ের কাছে টানিয়া আনিয়াছে।

স্নান করিয়া জামা গায় দিতে একশ'রকম ওজর-আপত্তি এবং তাহা লইয়া মাকে খানিকটা হয়রানি করা, ইহা শিশুমাত্রেরই একটা নিত্যলীলা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই জাতীয় অবস্থায় মাকেও বিবিধ প্রকারের ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহার ভিতরে আদর থাকে, অনাদর থাকে; বিবিধ প্রলোভন থাকে, বিবিধ ভয় প্রদর্শন থাকে; এবং শেষ পর্যন্ত থাকে সম্পূর্ণ অসহযোগের সঙ্কল্প জ্ঞাপন।

আজও সেই নিত্যলীলারই নৈমিত্তিক অভিনয়। মা শিশুকে ধমকাইয়া বলিলেন,—'খুকু, তুমি অমনি দুষ্টুমি করলে আমি তোমাকে এখানে ফেলে চ'লে যাব।' শিশুটি যেন সমূহ একটু বিপদ মানিল, কারণ চারিদিকের নির্জনতা এবং নীরবতা তাহার মনের উপরে একটা

অস্বস্তিকর একাকিত্বের অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া আছে। সে খানিকটা একটু ভাবিয়া লইয়া ঈষৎ-ভীত কণ্ঠে বলিল, 'যাও তুমি, আমি ঠাকুমার কাছে থাকব।' মা বলিলেন,—'ঠাকুমাও আমার সঙ্গে চ'লে যাবেন।' শিশু বলিল,—'তবে ত দাদু আছেন।' মা জানাইয়া দিলেন দাদু এমন দুষ্টু মেয়ের সঙ্গে থাকবেন না। শিশু পিসিমাকে আশ্রয়ের সঙ্কল্প জানাইল; কিন্তু মা যখন সে সম্ভাবনারও বিরোধিতা করিবেন জানাইলেন, তখন শিশুটি খানিকক্ষণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা খিল্ খিল্ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; যে কি হাসি!—হাসি যেন আর থামে না!

শিশু ত একরাশ হাসিয়া তাহার বিপদ বাধা সবই মুহূর্তে উড়াইয়া দিল; মাও তাহার সঙ্গে খানিকটা হাসিয়া এবং সেই সুযোগে জামাটি পরাইয়া দিয়া খালাস! ইহারা উভয়েই বাস করেন খাস প্রাণের রাজ্যে, শয়তানের সেখানে কোনও প্রবেশাধিকার নাই; কিন্তু শয়তান চাপিয়া বসিয়া আছে আমার মাথায়, সুতরাং আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—'শিশু হাসিল কেন?'

শিশু হাসিয়া উঠিয়াছে এমন একটি মন লইয়া—যে মন সম্পূর্ণরূপে উপায়হীন—আশ্রয়হীন। কচি লতা বাড়িয়া উঠিবার পথে যেমন সর্বদা শক্ত আশ্রয় চায়, শিশুমন সহজাত ধর্মবশে তেমনই সর্বদা কাহাকেও এবং মুখ্যতঃ তাহার মাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। এ আশ্রয় শিথিল হইলে সে ভীত হয়, সন্ত্রস্ত হয়; কাছাকাছি যাহাকে পায়, আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। আশ্রয়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যতক্ষণ তাহার মন বিচরণ করে, ততক্ষণ সে ভীত-সন্ত্রস্ত; কিন্তু এই সম্ভাবনার একটা পরিধি আছে, সেই পরিধির বাহিরে যখন সে চলিয়া যায়, তখন আমাদের সহজ বিচারে এবং বিশ্বাসে তাহার একটি পথই থাকা উচিত—উহা চরম আশ্রয়হীনতার চিৎকার। কিন্তু সংসারে দেখা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে শুধু এই একটি

জিনিসই যে সর্বদা ঘটে তাহা নহে—তাহার চরম চিৎকারের মুহূর্তে তাহার মুখে চিৎকার দেখিতে না পাইয়া আমরা দেখিতে পাই, অনাবিল অফুরন্ত হাসি! সুতরাং বসিয়া বসিয়া ভাবিতে হয়, 'শিশু হাসিল কেন!'

পূর্বেই বলিয়াছি, শিশু বাস করে অনাবিল প্রাণের রাজ্যে, মনের রাজ্যে পা ফেলে সে কদাচিৎ। মনের রাজ্যে সে যে একেবারে নবাগত বিদেশী; তাই পা ফেলিতে তাহার কেবলই ভয়, সংশয়, বেদনা; চঞ্চল পথিক তাই কেবলই ছুট দিতে চায় সেই অপরিচিত ভয়সঙ্কুল বিদেশ ছাড়িয়া নিজের নিশ্চিন্তের রাজ্যে। মনের পরিধি অতিক্রম করিতে পারিয়া শিশুর তাই একটা অনাবিল আনন্দ। যে পর্যন্ত মেয়েটি আপন প্রাণপ্রাচুর্যে অহেতুকভাবে লীলা-চঞ্চল, তখন পর্যন্ত সে তাহার সহজ আনন্দের রাজ্যেই বিচরণ করিতেছে; মা যখন তাহাকে একা ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি অকস্মাৎ একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে প্রাণ রাজ্য হইতে মনের রাজ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন; সেখানে তাহার বিচরণ-ভূমির পরিধি খুব বেশী নয়,—দাদু-দিদিমা বা বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি পর্যন্ত; এইটুকু পর্যন্ত তাহার অস্বস্তির গণ্ডি; যখন সে এইটুকু অতিক্রম করিল তখন সে তাহার মনোরাজ্য হইতে অমনি ছুটি পাইল—আবার প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার নিঃসীম নিঃশব্দ প্রাণরাজ্যে, তখন আবার তাহাকে কে পায়—হাসি শুধু হাসি!

'শিশু কেন হাসিল'—ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারিলাম, এই শিশু শুধু বিশেষ কোনও শিশুর ভিতরে নহে, শুধু শিশুর ভিতরেও নহে—নিখিল মানবের ভিতরে বাসা বাঁধিয়া আছে। মানুষের স্থিতি সাধারণতঃ মনের রাজ্য; এই মনের রাজ্যে সে যে কখনও হাসে না এমন নহে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া খোলা মনে বড় একটা হাসিতে পারে না—তাহার অষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে হাজারো চিন্তা ভাবনা। এত চিন্তা—এত ভাবনা কিসের? জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য শুধু

সম্বল খোঁজা—শুধু আশ্রয় খোঁজা। খুঁজিতে খুঁজিতে মানুষ কূল-কিনারা পায় না; নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সে একটি সীমিত পরিধিতে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। সে শ্রান্ত হয়, ক্ষত বিক্ষত হয়। এই জাতীয় মানসিক অবস্থান হইতে দুইটি অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। এক অবস্থায় মানুষ জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা হারাইয়া ফেলিয়া একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে। অন্য অবস্থায় সকল আশ্রয় হারাইয়া অনন্যশরণভাবে এক পরম আশ্রয়কে সমস্ত জীবনমন দিয়া জড়াইয়া ধরে; এই পরম আশ্রয়ের স্বরূপ সে জানে না, সেই পরম-শরণ এবং নিখিল শরণের সহিত ব্যক্তি জীবনের কি সম্পর্ক তাহাও সে জানে না,—তবু তাহার মন-প্রাণ চায়—তাহার নিজের ছড়াইয়া পড়া সমগ্র জীবনের কেন্দ্রে—শুধু তাহার জীবনের নয়—বিশ্ব-জীবনের কেন্দ্রে কেহ একজন থাকুক—যাঁহাকে আঁকড়াইয়া বিশ্ব-নিখিল বলিতে পারে,—'তুমি একজন হৃদয়েরই ধন'—অথবা 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা!' এই যে এক পরম-শরণের চাহিদা—ইহা মানুষের একটা মানসিক প্রয়োজন; নিখিল শূন্যে ঘুরিয়া মরিতেছে যে মন, তাহার একটা আশ্রয়স্থল চাই। সে যে ডালে ভর করে সেই ডালই ভাঙিয়া যায়,—শুধু বিষয় হইতে বিষয়ে—আশ্রয় হইতে আশ্রয়ে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে: সে শ্রান্ত—তাহার বসিবার ঠাঁই চাই; এমন করিয়াই হয়ত মানুষের মনে জাগিয়া ওঠে যে পরম-আশ্রয়, তিনিই জীবনদেবতা—বিশ্বদেবতারূপে মানুষের চিত্তে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন; মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধের ভিতরে এ হয়ত একটি মৌলিক সত্য।

বলিতেছিলাম জীবনের মধ্যে শিশুর মত মন খোলা হাসির কথা। কাহারও কাহারও জীবনে এই হাসি সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে ব্যক্তিজীবনের এবং বিশ্বজীবনের কেন্দ্রে এইরূপ একটি পরম আশ্রয় 'এ:ক'র প্রতিষ্ঠা করিয়া, তখন সংসারের যে অবস্থার ভিতরেই থাকুক

না কেন, সে পরম নির্ভরের ফলে পরম নির্ভয়ে বলিয়া উঠিতে পারে—

'সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে ;'

এইভাবে পরম 'একে'র মধ্যে সমাহিত হইতে পারিলে মনোরাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রাণ খোলা হাসির রাজ্যে পৌছিবার একটি পথ মেলে। এই যে পরম-ইষ্ট বা পরম আশ্রয়, ইহা অনেকখানি স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। স্বরূপে ইহা যাহাই হোক না কেন, মানুষের বিশ্বাস ইহাকে একটা রূপও দান করিয়া লইয়াছে, একটা স্বরূপও দান করিয়া লইয়াছে, এবং বিশ্বাসী মানুষ সর্বদাই বলিতে থাকে—

'ভুলে যদি থাক প্রভু ভাঙিও না ভুল।'

কিন্তু আমরা যে মূল প্রশ্ন দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ, 'শিশু কেন হাসিল,' সেই প্রশ্নে ফিরিয়া গেলে দেখিতে পাই, শিশু সকল আশ্রয় হারাইয়া কোনও 'এক'কে আশ্রয় করিয়া হাসে নাই—নিরালম্ব চিত্তে হাসিয়াছিল। এই নিরালম্ব চিত্তে হাসির তাৎপর্য কি ? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের মনের অজ্ঞাতে এক প্রকারের 'ব্রহ্ম-বিহার'। ব্রহ্ম-বিহার কথাটিকে এখানে আমি ইহার বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, সাধারণভাবে ইহার আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ব্রহ্ম-বিহারের অর্থ সর্ববিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বৃহতের ভিতরে অবস্থান, দেহে মনে আত্মায় অজানিত বৃহতের ভিতরে অবস্থানেই আমাদের গভীর আনন্দ।

একটি শিশু যখন সহসা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয় যেখানে সে তাহার অতি স্তিমিত চেতন-লোকের ভিতরে একান্ত অবোধপূর্বভাবে

অনুভব করে যে, তাহাকে ঘিরিয়া তাহার চারিপাশে কেহ নাই, তাহার সেই পরিচিত জগৎটিও নাই—শুধু সে আছে—তখন সে তাহার একটা উপাধিমুক্ত বিশুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে—সেই উপাধিহীন বিশুদ্ধ সত্তায় স্থিতিই এক প্রকারের আনন্দময় ব্রহ্ম-বিহার। শিশু নিজে ইহার আর কোনও অংশই জানে না, শুধু আনন্দানুভূতির অংশটুকুর ভাগীদার হয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্থূলতার মধ্যেও এই আনন্দময় 'ব্রাহ্মী স্থিতি'র আভাস আমরা সময় সময় পাইয়া থাকি। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের স্থূল জৈবিক সত্তায় আমরা যখন আত্মকেন্দ্রিকভাবে অবস্থিত থাকি, তখন কায়মনোবাক্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাই আমাদের মুখ্য হইয়া ওঠে; কিন্তু ইহারই ফাঁকে ফাঁকে একদিন প্রভাত বেলা যখন দেখিতে পাই, সোনার আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে, প্রান্তরের গাছে গাছে—অদূরের জঙ্গলা ভূমি হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কাকের আর শালিকের কা-কা কিচির-কিচির কোলাহল—একটু দূরে ঘুঘুর ঘুঘুঘু-ঘু ঘুঘুঘু-ঘু রব, তখন সহসা ক্ষণিকের জন্য অন্ততঃ মনে হয়, আমার চারিদিকে মাটির নীচে—মাটির উপরে—কি অফুরন্ত প্রাণের লীলা! তৃণেগুল্মে তরুলতায়, পশুতে-পাখীতে—চারিদিকে প্রাণ—শুধু প্রাণ—সে এক 'নিরাধার মহাপ্রাণ!' এই 'নিরাধার মহাপ্রাণে'র সহিত যদি মুহূর্তের জন্যও নিজের প্রাণ-প্রবাহকে যুক্ত করিয়া দেখিতে পারি, তাহাতেই গভীর আনন্দ; ইহাকেই আমি বলি প্রাত্যহিক স্থূল জীবনে 'ব্রাহ্মী স্থিতি'র অস্পষ্ট আভাস। এই আভাসের ক্ষণিক স্পর্শও চিত্ত আনন্দে ভরপূর হইয়া যায়—শুধু সেই শুভ মুহূর্তেই দেখা দেয় মানুষের মধ্যে অনাবিল হাসি—অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও প্রাণখোলা হাসি।

ব্যাপক ব্যস্ততা

শহর কলিকাতা। রসা রোড ও রাসবিহারী এভেন্যুর মোড়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি, একবার উত্তরবাহী হইবার বাসনা। হঠাৎ দেখা হইয়া গেল একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে। অনেক দিনের বন্ধু—বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু—অনেকদিন অনেক সময় বসিয়া তাহার সহিত হইয়াছে অনেক কথা—কি কথা কিছু মনে নাই, থাকিবারও কথা নহে; কারণ সত্যকারের বন্ধুর সঙ্গে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া বলে যত কথা, কদাচিৎ তাহার থাকে কোনও মাথামুণ্ডু। বন্ধুকে দেখিয়া আমিও সাগ্রহে আগাইয়া গেলাম,—সেও আমাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন আছ?' কিন্তু কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া সে আর এক মুহূর্তও থামে নাই, গতিবেগ যেন বাড়াইয়া দিয়াই হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দেখিলাম, 'ভাল আছি' বা 'ভাল নাই'—সর্বপ্রকার ভণিতাদি-বর্জিত এই প্রকারের যে-কোনও একটি তথ্য সরবরাহ করিতে হইলে আমাকে অন্তত দশহাত দৌড়াইয়া আগাইয়া যাইতে হইবে; সুতরাং আপাতত 'বলি বলি' এইরূপ একটা ভাব দেখাইবার মতন করিয়া অতি সংক্ষেপে এবং অতি তৎপরতার সহিত একবার ঢোক গিলিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হইল না।

মনটা কেমন যেন শিথিল এবং ঠাণ্ডা হইয়া গেল। দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'বন্ধুটি অমন করিয়া দৌড়াইল কেন!' আজ ত রবিবারের সকাল বেলা, পিছনে যমতাড়ার মত আপিসের তাড়া নাই, নিত্য-নৈমিত্তিক প্রাতঃকৃত্য বাজারাদিও এতক্ষণে বাকি থাকিবার কথা নহে, চলৎ-চিত্রের চপল-নৃত্যও সকালবেলা হইবার নহে। আমি ইতি-মধ্যে বন্ধুর তেমন কোনরূপ বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছি আমার কোনও

সজ্ঞান-কৃতকর্মের স্মৃতিদ্বারা এ-রূপ সংশয় সমর্থিত হইতেছে না, বন্ধুর ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রভাচকিতহসিত মূর্তিখানির ভিতরেও ত ইহার ব্যঞ্জনা দেখিতে পাইলাম না। তবে? 'বন্ধু দৌড়াইল কেন?'

দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মনে হইতে লাগিল, শুধু এই বন্ধু নয়, সকলেই যেন আজকাল এমনি করিয়া দৌড়ায়। কারণে দৌড়ায়, অকারণে দৌড়ায়, দৌড়ান যেন এখনকার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথচ মনে পড়িতেছে, ঠিক এই চৌমাথার মোড়েই কর্মব্যস্ত গতিচঞ্চল জনসঙ্ঘট্টের এক পাশে দাঁড়াইয়াই ত কতদিন কত বন্ধুর সঙ্গে কতক্ষণ ধরিয়া মন খুলিয়া কত আলাপ করিয়াছি; অথচ তখনও যে নেহাৎ অলস জীবনই যাপন করিয়াছি তাহা ত মনে হয় না। কিন্তু হঠাৎ যেন চোখের সামনে কেমন একটা মর্মান্তিক তাড়াতাড়ির যুগ উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি। আগে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পরিচিত কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে তিনি মন খুলিয়া হাসিতেন, তাহার পরে তিনি বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া 'ভাবিতেন', তার পরে আস্তে-সুস্থে চলিতেন। কিন্তু এখনকার কথা স্মরণ করিয়া দেখুন, পথে কাহারও সহিত দেখা হইলে সে যেন বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের এক 'কিলকিঞ্চিৎ' ভাব; বিদ্যুদ্‌গতিতে স্বল্প শ্মশ্রু আকম্পিত করিয়া, সমস্ত মস্তক বা নাসিকাগ্র আঘূর্ণিত করিয়া, কেহ বা ডান হস্ত, অপারগ স্থলে (এবং অধিকাংশ স্থলে) বাম হস্ত উত্তোলিত এবং অবনমিত করিয়া, কেহ বা লাঠির অগ্রভাগ, কেহ বা ছাতার বাট দ্রুত নাড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন! আপনি ভ্যাবাচাকা খাইয়া অনুভব করিতে পারিলেন, যে-দুনিয়ায় আপনার বাস সে-দুনিয়ার আহ্নিক গতি সহসা কি করিয়া অসম্ভবভাবে বাড়িয়া গিয়াছে! নমস্কারের আজকাল কত রকমফের হইয়াছে কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ডান হাত দিয়া, বাঁ হাত দিয়া, কোনও সমগ্র হাত ব্যবহার না করিয়া শুধু মাত্র একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া, হস্তস্থিত বই, রেশন ব্যাগ, ছাতা, লাঠি—যা হোক

একটা কিছু একটা বিশেষ ভঙ্গিতে নাড়াইয়া দিলেই হইল। এই প্রসঙ্গে একটি রসিকতার আধুনিক গল্প মনে পড়িতেছে ; জনৈক গুরুঠাকুরের জনৈক আধুনিক শিষ্যপুত্র গুরুঠাকুরের সহিত দেখা হইলেই তীব্রবেগে দক্ষিণ হস্তখানি সমান্তরাল ভাবে একবার উত্তোলিত করিয়াই সমবেগে নামাইয়া লইতেন ; প্রত্যুত্তরে গুরুদেব তাঁহার দুই হস্তের দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাইতেন। একদিন শিষ্যপুত্র গুরুদেবের নিকটে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, আপনাকে আমি নমস্কার জানাইলেই আপনি আমাকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করান কেন ?' গুরুদেব সবিস্ময়ে বলিলেন,—'ঐভাবে কি তুমি আমাকে নমস্কার জানাইতে ? আমি সেকেলে মানুষ, বুঝিব কেমন করিয়া ? আমি ভাবিতাম, তোমাদের বাড়িতে আমার এই ঘন ঘন যাতায়াত তুমি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলে না , তাই দেখা হইলেই তুমি হাতের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়া দিতে, আমাকে তুমি শেষ করিবে ; প্রত্যুত্তরে আমি আমার দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া দিয়া জানাইতাম, সে কাজ তোমার সাধ্য নহে !'

কিন্তু সস্তা রসিকতার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। যেটা ভাবিবার কথা তাহা হইল এই যে, আমাদের সমাজ-জীবনের পরিবেশের ভিতরে এমন কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, যাহার ভিতরকার কিছু কিছু জিনিস চলিবার পথে এদিক হইতে ওদিক হইতে গাঁয়ে আচড় কাটিতেছে। সাধারণ সমাজজীবিগণ কতকগুলি সহজাত স্থাবরবৃত্তি দ্বারা অনড়ভাবে ভাসিয়া চলিতেই অভ্যস্ত ; সুতরাং যে পরিবর্তনই তাহাদিগকে নাড়া দিয়া চালাইতে চায় সেই পরিবর্তনেই তাহারা অস্বস্তি বোধ করে। এই সাধারণ সত্যটি সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে সচেতন থাকিয়াও বলিতে হয়, পরিবর্তন এবং অগ্রবর্তন সর্বাংশে সমার্থক নয়।

আমাদের সাম্প্রতিক সামাজিক জীবনে—বিশেষ করিয়া নাগরিক জীবনে—যে একটা মর্মান্তিক ব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করিতে পারি তাহা

প্রথমে আমাদের আচরণ হইতে অভ্যাসে এবং তৎপরে অভ্যাস হইতে প্রায় মুদ্রাদোষে গিয়া পর্যবসিত হইয়াছে। আমাদের সমাজদেহে এগুলি গত মহাযুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফলরূপেই দেখা দিয়াছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের রাষ্ট্রজীবনে, অর্থ-নৈতিক জীবনে এবং সমাজ-জীবনে কি কি সত্য বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহা বড় বড় মাথা আবিষ্কার করিবে; কিন্তু ছোট মাথায় বুঝিতে পারিলাম, ইহা সমগ্র জাতীয় জীবনকে একটি অতিশয় কঠোর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছে,—তাহা হইল এই,—'যেমন করিয়া হোক, আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।' এই যে বাঁচিয়া থাকিবার আহ্বান ইহার যেন কোনও দিকে কোনও আশ-পাশ নাই, শুধু সাড়ে তিন হাতের একটি নিছক রক্তমাংসের দেহকে কোনও রকমে টিকাইয়া রাখা। ফলে আমাদের সত্তা বিজ্ঞানের স্তর হইতে, আনন্দের স্তর হইতে—এমন কি মনের স্তর হইতেও ক্রম-সঙ্কুচিত হইয়া শুধু মাত্র প্রাণের স্তরে আসিয়া ঠাঁই লইয়াছে; আর এ-প্রাণ দেখিতেছে, অন্ন ব্যতীত আর কোথাও যেন তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। এই জন্য অন্নই আমাদের কলিযুগের ব্রহ্ম—অন্নেই আমাদের প্রতিষ্ঠা।

প্রাণ যদি শুধু মাত্র অন্নের দাস হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই বোধ হয় ব্যক্তিজীবনে—তথা জাতীয় জীবনে একটা সর্বগ্রাসী ব্যস্ততা প্রকট হইয়া ওঠে; ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক প্রাণকে আমরা অন্য সকল সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া শুধু মাত্র অন্নমুখী করিয়া তুলি। প্রাণের এই অন্নমুখিতা আজ যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সেই একনিষ্ঠ অন্নমুখিতার ফল যে শুধু সমাজ-জীবনের সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই প্রকটিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহার ফল দেখা দিয়াছে আমাদের সাহিত্যে এবং সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রেও। বাহিরে যাহাকে বাস্তবতা বলিয়া একটা গালভরা নাম দিয়া লইয়াছি, ভিতরে যে তাহা আমাদের প্রাণধর্মকে সর্বতোভাবে

আমাদের অন্নের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা ছদ্ম তাগিদ নয়, এ বিষয়ে আমরা খুব স্পষ্ট ভাবে নিশ্চিত হইতে পারিয়াছি কি ?

বলা যাইতে পারে, অন্ন বাদ দিয়া ব্যক্তি বা জাতির শুধু আকাশে সৌধচূড়া তুলিয়া কল্পনায় মজিয়া থাকিলে কি লাভ হইবে ? প্রাণ অন্নে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে একটা জাতি শুধু মন, আনন্দ, বিজ্ঞান লইয়া হাওয়ায় ভাসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু একথাও আবার ঠিক যে, অন্নই যদি সর্বেসর্বা হইয়া প্রাণের খাজনা সবটুকুই আদায় করিয়া লয় তবে মনুষ্যত্বেরও বোধ হয় আমরা অনেকটা হারাইয়া ফেলি। আমরা ভূমিস্পর্শহীন আকাশচারী সাজিয়া যেমন কোনও মহৎ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করিতে পারি না, তেমনই শুধু মাত্র ভূমিকেন্দ্রিক হইয়াও কোনও আনন্দ বা উদ্গতির আশা করিতে পারি না।

বিকেন্দ্রীকরণ

আমাদের দেশের বাড়িতে আমাদের জ্যাঠাইমার প্রকাণ্ড একটি কাঠের বাক্স ছিল। সংসারের বিবিধ এবং বিচিত্র প্রকারের প্রয়োজন সাধিত হইত এই বাক্সটি দ্বারা। মুখ্য প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বাক্সটি ছিল আমাদের সংসারের একটি সংক্ষেপিত ভাঁড়ার ঘর; রান্নার তেল-লঙ্কা গরম-মসলা বীচিকুচি প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া খেজুর-কিস্‌মিস্‌, চিনি-বাতাসা সন্দেশ, নাড়ু এবং অন্যান্য বিবিধ নৈমিত্তিক দ্রব্যাদিও ইহারই অফুরন্ত গহ্বরে স্বচ্ছন্দে স্থান পাইত। আহার্য বা ব্যবহার্য যে-সকল জিনিষ সম্বন্ধেই একটা পারিবারিক সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল, সেই সকল জিনিসই বাজার হইতে সোজা এই সংক্ষেপিত গুদাম ঘরে চলিয়া আসিত; বাক্সটির গহ্বরে আবার সুরক্ষণ ক্ষমতার তারতম্যযুক্ত বিবিধ প্রকোষ্ঠ ছিল; রক্ষণীয় দ্রব্য সম্বন্ধে চাহিদা ও সরবরাহের তারতম্য বিচার করিয়া জ্যাঠাইমা এই বিবিধ প্রকোষ্ঠে বিবিধ দ্রব্য রাখিতেন; তারপরে উপস্থিত জনগণের বিপুল নৈরাশ্যের মধ্যে সশব্দে প্রকাণ্ড ঢাকনাটি ফেলিয়া দিতেন এবং জবরদস্ত গণ-সরবরাহ-সচিবের মৌন মহিমা প্রকটিত করিয়া বিরাজ করিতে থাকিতেন। এই ত গেল মুখ্য প্রয়োজনের দিক; গৌণদিক হইতে বাক্সটি ছিল দিবসে যৌথভাবে উপবেশনের এবং নিশীথে বেশ গা ঢাকিয়া শয়নের আশ্রয়।

বাক্সটি সম্বন্ধে যেটুকু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল তাহা হইতেই বেশ বোঝা যাইতে পারে, বিবিধপ্রকারের কারণের সমাবেশে এই বাক্সটি পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার একটি কেন্দ্রীয় আকর্ষণের বস্তু ছিল, সুতরাং সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সারাটি দিন ইহার আশেপাশে

একটা ভিড় লাগিয়াই ছিল। প্রথমতঃ দিনমজুর আসিয়া দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে এক ছিলিম তামাকের আবেদন জানাইলে জ্যাঠাইমাকে বাক্সটি একবার খুলিতে হইত; তাহার পরই রন্ধনের ভারপ্রাপ্ত বধূগণ আসিয়া বিবিধ বস্তুর প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতেন, তারপরেই গোসাঁইপূজার পুরুত ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইতেন তাঁহার চাল-কলা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ সামগ্রীর জন্য, পুবপাড়ার বামুনদিদি আসিত লাউ-কুমড়ার কয়েকটি টাটকা বীচির জন্য, পাশের বাড়ির আদুরীর মা একফোঁটা নিমতেলের জন্য—ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যে-কোনও উপলক্ষেই বাক্সটি খোলা হোক না কেন সব সময় চারিপাশ হইতে কালীঘাটের ভিক্ষুকের মত হাত বাড়াইয়া থাকিতাম আমরা কয়েকটি ছায়ামূর্তি জীব; ছায়া-মূর্তি এইজন্য যে আমরা যে কোথা হইতে সহসা সেখানে আসিয়া জমা হইতাম এবং কিঞ্চিৎ পূর্ণমনোরথ হইয়া বা শূন্যহস্তে ধমক খাইয়া মুহূর্তে আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতাম তাহা কেহই ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিত না।

কিন্তু মজা এই, জ্যাঠাইমার ইচ্ছা এবং উপদেশ ছিল, এই এত বড় প্রশস্ত বাড়ির এত প্রশস্ত উঠান-দরজা, ঘাট-মাঠ, আগান-বাগান থাকিতে আমরা সবাই যেন দিনরাত ঐ বাক্সটিকে কেন্দ্র করিয়া ভিড় জমাইয়া না তুলি। তিনি আমাদের ধর্মের ভয় দেখাইতেন, স্বাস্থ্যের ভয় দেখাইতেন, কিন্তু আমরা ছিলাম একেবারেই 'অপরিশোধ্য'। ধর্মের দিক দিয়া তাঁহার মতে আমাদের এতাদৃশ বিসদৃশ আচরণে গৃহাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর কুপিতা হইয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল; নীতির দিক হইতে এতখানি লোভরিপুর বশবর্তী হওয়া এবং সেই প্রবল রিপুর বশবর্তী হইয়া অপর একটি লোককে দিনরাত উত্যক্ত করিয়া তোলা কোন নীতিশাস্ত্রেরই অনুগ নহে; স্বাস্থ্যের দিক হইতে এক একটি ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে বারবার বিবিধ রসপ্রয়োগের অসমীচীনতা।

বাক্সটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার এই বিকেন্দ্রীকরণের মতবাদ শুধু আমাদের সম্প্রদায় সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থি-প্রার্থী সকলের সম্বন্ধেই তাঁহার এই মতবাদ এবং অনুশাসন। কিন্তু নিজে তিনি বাক্সের ভিতরস্থ মজুত দ্রব্যসম্ভারকে কিছুতেই কোনভাবে হস্তান্তরিত বা স্থানান্তরিত করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন না।

সমসাময়িক জীবনের আশপাশে তাকাইয়া মনে হয়, আমার এই পারিবারিক জ্যাঠাইমা মরেন নাই,—তাঁহার মনোবৃত্তি বৃহত্তর রূপ-পরিগ্রহ করিয়া ছড়াইয়া আছে আমাদের বিকেন্দ্রীকরণকামী আধুনিক রাষ্ট্রবুদ্ধির মধ্যে। ব্যক্তি জীবন তথা জাতীয় জীবনকে দৃঢ় সুস্থ এবং সবলভাবে গড়িয়া তুলিতে বিকেন্দ্রীকরণের অপরিহার্য প্রয়োজন আজ আমরা কমবেশি সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের বাস্তব কার্য-কলাপ সকলই হইল কেন্দ্রীকরণের দিকে। দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শহরগুলির দিকে তাকাইলেই মনে হয়, এগুলি সবই কতকগুলি বড় বড় জ্যাঠাইমার বাক্সবিশেষ; তাহারা জাতির সর্বপ্রকার মানুষকে সর্বপ্রকার প্রলোভনের দ্বারা এই কেন্দ্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে; কিন্তু কর্তৃপক্ষ ধর্ম, নীতি ও স্বাস্থ্যের উপদেশ দিয়া প্রচার করিতেছেন—সব গ্রামে ফের, এখানে এত ভিড় কেন!

পনর বিশ বৎসর পূর্বেও শহর হইতে গ্রামে ফিরিয়া চলিবার কথা দুই এক জনে সত্যপথ বলিয়া মনে করিলেও অধিকাংশই তাহা গ্রহণ করিতাম কোনও গালভরা বক্তৃতার মধ্যে একটু স্বাদ-বৈচিত্র্যসম্পাদক ফোড়নরূপে; কিন্তু আজ আর গ্রামে ফিরিবার কথাকে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না, মহাকাল নিজেই তাহা আমাদের জীবনে এখন রূঢ় সত্য করিয়া তুলিয়াছে। সৌধবিলাসী মুষ্টিমেয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাদবাকি 'ব্যাপকের'র দল বেশ বুঝিতে পারিতেছি হাঁস-মুরগীর খাঁচায় বা পায়রার খোপে বাস করিয়া করিয়া আমরা জীবজন্তুর যে

পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছি তাহাতে মনুষ্যত্বের সীমা হয়ত ইতিমধ্যেই অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছি ; আজ এ-কথাটা বুঝিতে খুব কষ্ট হয় না যে মানুষের শুধু দেহের স্বাস্থ্যের জন্য নয়, তাহার মনের স্বাস্থ্যের জন্যও খানিকটা একটু পৃথিবীর অংশ, খানিকটা আকাশের অংশ, খানিকটা একটু জল-বায়ু-আলোকের অংশের প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং শহরের সৌখিন সখের অংশটায় এখন বেশ বিতৃষ্ণার মরিচা পড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যাই কোথায়? বিকেন্দ্রীকৃত হইয়া পড়—গ্রামে ফিরিয়া যাও বলিলেই ত ঠিক ফিরিয়া যাওয়া যায় না, ফিরিয়া যাইবারও যে ব্যবস্থা চাই। আর সব ব্যবস্থার মধ্যে এই সত্যটাকে মনে রাখিতেই হইবে যে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে; আমাদের বিকেন্দ্রীকরণ-নীতির সহিত আমাদের বাঁচিয়া থাকবার রীতির যোগ না ঘটাইতে পারিলে রীতিহীন নীতি অসত্যই থাকিয়া যাইবে।

যে-কোনও নীতিকে আজ আর বস্তুবিয়োজিত বিশুদ্ধ নীতি হিসাবে আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না, কোন দিন করিতে চেষ্টা করাও যে উচিত ছিল না সে-কথাটাও আজ স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছি। ইতিহাসের বিবর্তনে আজ আমরা যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি সেখানে আমাদের জীবসত্তা দিন দিনই একান্তভাবে প্রাণকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে। তাহা ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া উটপাখীর মতন বালুর মধ্যে চোখ লুকাইয়া আত্মরক্ষার আত্মপ্রবঞ্চনায় কোনও লাভ নাই। এই প্রাণকেন্দ্রিক যুগে নীতিকে প্রাণধারণের বাস্তব পন্থায় মূর্ত করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু আমাদের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি এই-জাতীয় কোনও সুস্পষ্ট পন্থার রূপ গ্রহণ করিতেছে না। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যমের দ্বারা বা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা যে-সকল কর্মানুষ্ঠান করিতেছি তাহা

এখন পর্যন্তও আমাদিগকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেন্দ্রীভূতই করিয়া তুলিতেছে ; কারণ বাস্তব জীবনের রসদ যে এখন পর্যন্ত সেই 'জ্যাঠাইমার বাক্সে'ই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি অর্থোপার্জনের উপায় সবই শহরে—গ্রামে গ্রামে লোক ফিরিয়া যাইবে কি শুধু অশিক্ষায়, অনাহারে, পেটভর্তি পিলে টানিয়া মরিবার জন্যে ?'

বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে তাই সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাকে কোনওরূপ আংশিক পরিকল্পনা হইলে চলিবে না, যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার তাহা একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা ; কারণ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি যে পর্যন্ত আমাদের সামগ্রিক জীবনদর্শনের সমর্থন লাভ না করিবে সে পর্যন্ত আমাদের জীবনে কোনও সত্যমূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। কোনও সাময়িক অবস্থার চাপে পড়িয়া আমরা যদি আমাদের জাতীয় জীবনের কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে এই নীতিকে প্রয়োগ করিতে যাই, আমরা কিছুতেই তাহাতে সফলকাম হইতে পারিব না। একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য বঙ্গ-বিভাগের ফলে কলিকাতার লোকসংখ্যা সহসা অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গেল ; ইহা জাতীয় জীবনে আনিয়াছে একটি সামগ্রিক বিপর্যয় ; কিন্তু এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের ভিতরে আমাদের সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়িয়া গেল শিক্ষা বিপর্যয়ের প্রতি ; একসঙ্গে এত ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ে স্কুল-কলেজগুলি অসম্ভব রকমে ফাঁপিয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল ; সহসা ফাঁপিয়া-ওঠা ব্যবসায়ীর কল-কারখানার মত তাড়াতাড়ি বিভিন্ন 'শিফ্ট' আরম্ভ হইয়া গেল ; তাহাতে আর কি হইল বোঝা না গেলেও বোঝা গেল যে মা সরস্বতীর হৃদ্দমুদ্দ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল ! সরকার তখন অতি সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করিয়া রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গে সরকারী অর্থে অনেকগুলি

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন ; কিন্তু আমাদের যতদূর সংবাদ জানা আছে তাহাতে ইহার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই ইতিমধ্যে বেশ নাভীশ্বাস চলিতেছে। ইহা ত হইবেই! আমার জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি সবই রহিল কেন্দ্রে—শুধু আমাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? একটি ছাত্রকে যাঁহারা খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন আমাদের দেশের সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থা তাঁহাদের নাকে দড়ি দিয়া কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া আনিবে, ছেলেটিকে জীবনে কোনওরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে ছুটিয়া আসিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইবে শহরের দেয়ালে দেয়ালে—মাঝখান হইতে তাহার শিক্ষার কয়েকটি দিন সে নিরালম্বভাবে ঝুলিতে থাকিবে বিকেন্দ্রীকৃত হইয়া এদিকে সেদিকে ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

আমি পূর্ব্বে বিকেন্দ্রীকরণের পিছনে যে জীবনদর্শনের সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়াছি এই কথাটিকে আমাদিগকে একটু গভীরভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ইতিহাসের ধারা আমাদিগকে (আমি বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে এবং তাহার মধ্যেও আবার বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশের কথাই বলিতেছি) দিন দিন কেবলই প্রাণকেন্দ্রিক করিয়া তুলিতেছে, সেই প্রাণকেন্দ্রিক জীবনে অর্থনীতিই আমাদের সর্বপ্রধান নীতি বলিয়া দেখা দিতেছে। এই প্রচলিত অর্থনীতির পিছনে আমাদের একটি জীবনাদর্শ রহিয়াছে। এই জীবনাদর্শের কোনও পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের প্রচলিত অর্থনীতিরও কোনও পরিবর্তন ঘটিবে না, আর প্রচলিত অর্থ-নীতি এবং অর্থব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি কখনই কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারে না। আমাদের অর্থবোধ দিন দিনই শুধুমাত্র মুদ্রাবোধের সমার্থক হইয়া উঠিতেছে ; মুদ্রা-আহরণ এবং আরাধনের এই অর্থনীতিই আমাদের বহু অনর্থনীতির গোড়া বলিয়া আমার বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধী যখন

বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রচার করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের প্রচলিত অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন; তিনি যে নূতন অর্থনীতির আদর্শ প্রচার করিলেন তাঁহার প্রচারিত চরকা হইল সেই নীতির প্রতীক। চরকাকে আমি শুধু নূতন অর্থ-নীতির প্রতীক বলিব না, উহাকে বলিব একটি নূতন জীবনাদর্শের প্রতীক। 'টাকা-আনা-পাই'র হিসাব করিয়া চরকার মূল্য কোনও দিনই বুঝিতে পারি নাই, আজও বুঝি না; কিন্তু চরকার অর্থনীতি যে মূলতঃ 'টাকা-আনা-পাই'-র অর্থনীতিই নহে, ইহা যে শুধুমাত্র মুদ্রারূপী নগদের পরিবর্তে বহু টুকরা টুকরা রূপে ছড়াইয়া পড়া জীবনরসদের অর্থনীতি। যাহার হাতে নগদ মুদ্রা কিছুই নাই, ব্যাঙ্কের ঘরে জমাও শূন্য—অথচ যে নিজের শ্রমের বিনিময়েউপার্জিত অন্নে বস্ত্রে সুস্থদেহে এবং সুস্থ মনে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে সেও যে অর্থশালী, এইবোধ আমাদের না জন্মা অবধি আমরা গান্ধীজী-পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ কিছুতেই বুঝিতে পারিব না।

আমি বিকেন্দ্রীকরণ-প্রসঙ্গে পরোক্ষে গান্ধীবাদেরই মহিমাকীর্তন করিতে বসি নাই; কিন্তু এ-কথা সত্য যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নহে—সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের বর্তমান জীবনাদর্শ এবং তৎসঙ্গে জীবনপদ্ধতিও বদলাইতে হইবে। আমাদের ভদ্রতা, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির যে আদর্শ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহার ধারা বিকেন্দ্রীকরণের বিপরীত ধারা। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় শ্রদ্ধাশীল না হইলে এবং দৈহিক শ্রমের মূল্য স্বীকার না করিতে পারিলে আমরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং অর্থ—সকল দিক হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিব না। মানুষকে শহর-কেন্দ্র হইতে বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইলে তাই মানুষ যাহা লইয়া বাঁচে সেই বহিঃসম্পদ্ এবং অন্তঃসম্পদ্ সকলকে বিকেন্দ্রীকৃত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা বিকেন্দ্রীকরণ অবাস্তব একটা নীতিতেই পর্যবসিত থাকিবে।

পরিকল্পনায় কল্পনা ও বাস্তব

একটি মফস্বল শহরের বনাঞ্চল ; বেড়াইতে গিয়া বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আশপাশের সব খোঁজখবর করিতেছি, তাহার ভিতর হইতে একজনে বেশ একটি স্থূল রসিকতার ভঙ্গিতে একটি সংবাদ প্রকাশ করিলেন,—সে সংবাদটি হইল এই, ঐ অঞ্চলে সম্প্রতি গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সরকারী উৎসাহ এমন মারাত্মক 'প্রবল প্রকোপ' রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে যে, সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ রীতিমতন ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদ-সরবরাহকারী সংবাদটিকে যে-ভাবে পরিবেশন করিলেন তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম, সংবাদের সঙ্গে যেটুকু রসিকতার ঝাঁজ মিশ্রিত আছে তাহা সর্বাংশে না হোক, বহুলাংশে তাঁহার ব্যক্তিগত সরকার-বিদ্বেষ-প্রসূত। কিন্তু তাই বলিয়া সবটাই বানান কথা নয় ; ইহার ভিতরে লক্ষণীয় একটি বড় সত্যও যে রহিয়াছে আমার ব্যক্তিগত পূর্বাভিজ্ঞতা হইতে আমি তাহা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিলাম।

কোনও জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা লইয়া গ্রামাঞ্চলে গেলে অনেক সময় যে বেসুরের সৃষ্টি হয় তাহার সবটাই পরিকল্পনাকারী বা যাঁহারা সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন তাহাদের দোষে এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক সময় অনেক মহৎপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও স্থানীয় জনগণের মনে যে একটা অনাস্থা এবং তজ্জনিত অসহযোগের মনোবৃত্তি দেখা যায় তাহা পল্লীবাসিগণের দৃঢ়মূল পূর্বসংস্কার, প্রচলিত জীবন-যাত্রার প্রতি একটা সহজাত অন্ধানুগত্য, অশিক্ষা এবং তজ্জনিত চিন্তাদৈন্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সব কথা সবই স্বীকার করিয়াও আর একটি সত্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইল এই যে, গ্রামবাসিগণের দিক হইতে এই সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকল বিরূপতার একটি মুখ্য কারণ, পরিকল্পনাকারী অথবা পরিকল্পনাকার্যকারিগণের প্রতি স্থানীয় অধিবাসিগণের একটা গভীর অনাস্থা—আর এই অনাস্থার আবার মুখ্য কারণ হইল, জীবনধারা এবং চিন্তাধারা উভয় দিক হইতে এই দুইদিকের দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান। ফলেই—

'দু'জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।'

সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করে উপর হইতে তাগিদ পাওয়া কতিপয় কর্মচারীর অত্যুৎসাহী আকস্মিক কর্মচাঞ্চল্যে। হয়তঃ সরকারীভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে এইসব কাজের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাদের জন্য এত সব ব্যবস্থা তাহারা হয়ত ইহার কিছুই জানিল না। এই সব কর্মচারী তাই যখন গ্রামাঞ্চলে গিয়া নানা-প্রকার কর্মতালিকা গ্রহণ করিয়া একটা রীতিমতন হৈ চৈ বাঁধাইয়া দেন, স্থানীয় অধিবাসীরা হয়ত আড়ষ্ট এবং আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এমনও হয়ত দেখা যায়, যেখানে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পাঠান হইয়াছে, সেখানে সে দেশ-কাল-পাত্রের বিচারে সত্য সত্যই প্রযোজ্য নহে; কিন্তু তা বলিলে চলিবে কেন? পরিকল্পনা যখন করা হইয়াছে এবং তাহার পিছনে যখন এত লোক নিয়োগ এবং এত অর্থব্যয় রহিয়াছে তখন এখানে ইহার প্রয়োজন নাই বলিলেই ত রেহাই দেওয়া চলে না,—তখন যাহা চলে তাহা অনেক খানিই উৎপাত।

কয়েক বৎসর পূর্বেকার একটি গল্প মনে পড়িতেছে। ঠিক গল্প নয়, একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সঙ্গে যুক্ত হইবার পরে এদেশের উপরে—বিশেষ করিয়া কলিকাতার মতন নগরীর উপরে—বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রচণ্ডভাবে। বেকার যুবক প্রায় সবই গিয়া 'এ-আর-পি'-র দল ভর্তি করিয়া দিল। এই এ-আর-পি দলের মহড়াও চলিতে লাগিল দিনে রাত্রে। কিন্তু মহড়া ত বহুদিন বহুভাবে চলিল,—কার্যক্ষেত্র আর কোনও দিক হইতেই কিছু মিলিতেছে না। একদিন সকালবেলার দিকে এইরূপ একটি এ-আর-পি-র দল কলিকাতা শহরের দক্ষিণ -উপকণ্ঠে একটি রেল লাইনের কাছাকাছি মহড়া দিয়া ঘোরাফেরা করিতেছিল, সঙ্গে তাহাদের অধিনায়ক। হঠাৎ দেখা গেল রেল লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে একটি লোক হোঁচট খাইয়া লাইনের পাশে পড়িয়া গেল। যে-ভাবে লোকটি পড়িয়া গিয়াই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সটানভাবে হাঁটিতে লাগিল তাহাতে বেশ বোঝা গেল লোকটির তেমন কিছুই হয় নাই। কিন্তু ললাটলিখনে সেই প্রভাতে কর্মভোগ তাহার অনেক ছিল, তাই ঘটনাটি পড়িল ত পড়িল ঠিক একটি এ-আর-পি-র লোকের চোখে। ঘটনাটি চোখে পড়িবামাত্র সে একটি সামরিক ঢঙে দৌড়াইয়া গেল দলের অধিনায়কের নিকট, অধিনায়ক আবার ঘটনাটি শুনিবামাত্র তাঁহার তীব্র বংশীধ্বনিতে স্থানটিকে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন; এ-আর-পির দল যে যেখানে ছিল সকলে সেই বংশীধ্বনি শুনিবামাত্র দৌড়াইয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল তাহাদের অধিনায়ককে। অধিনায়ক লাইনে হাঁটিয়া-চলা লোকটির দিকে সংকেত করিয়া কি নির্দেশ দিলেন, আর যায় কোথায়—একসঙ্গে বিশ-পঁচিশজন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া লোকটিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং মুহূর্ত মধ্যে তাহাকে ধরাধরি করিয়া অধিনায়কের নিকটে আনিয়া হাজির করিল। ভয়ে এবং আতঙ্কে লোকটির ব্রহ্মতালু অবধি ইতিমধ্যে শুকাইয়া কাঠ

হইয়া গিয়াছে, হাত-পা রীতি মতন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। লোকটিকে নিকটে হাজির করা হইলেই অধিনায়ক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে?' লোকটি বলিল, 'হুজুর আমার কিছুই হয় নাই; একটু প'ড়ে গিয়েছি তাতে কিছুই লাগেনি।' ভ্রূ কুঁচকাইয়া অধিনায়ক বলিলেন,—'লাগেনি মানে, রেল লাইনের উপরে পড়ে গেছেন, আলবাৎ লেগেছে; কোথায় লেগেছে বলুন।' ধমক খাইয়া লোকটি বলিল, 'আজ্ঞে পায়ে একটুখানি লেগেছে।' পায়ে? বলিয়াই অধিনায়ক তাহার পায়ের কাপড়টা তুলিলেন, দেখিলেন খানিকটা ছড়িয়া গিয়া একটু একটু রক্ত বাহির হইয়াছে। বহুক্ষণ জালে মাছ না পড়িবার পর হঠাৎ যখন ধীবরের জালে একটা বড় মাছ পড়ে তখন তাহার যে-জাতীয় একটা আকস্মিক উল্লাসের আবির্ভাব ঘটে, ঠিক সমজাতীয় উল্লাসের স্বরে অধিনায়ক প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—Regular accident, first aid!' অমনি আবার কয়েকটি এ-আর-পি-র লোক তাহাকে ধরাধরি করিয়া নিকটস্থ একটি ডাক্তার খানায় লইয়া গেল,—সেখানে তাহাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হইল। ইতিমধ্যে অসম্ভব তৎপরতার সহিত অধিনায়ক কোথা হইতে অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ীর জন্য যে ফোন করিয়া দিলেন কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে বায়ুবেগে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। অধিনায়ক লোকটিকে বলিলেন, 'আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে।' হাত জোড় করিয়া লোকটি বলিল,—'হুজুর গরীবের মা বাপ, আমার যে কারখানায় না গেলেই নয়।' অধিনায়ক আবার ধমক দিয়া বলিলেন,—'যা বলছি শুনুন মশাই।' লোকটি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল; কাছের এ-আর-পি-র লোক ধমক দিয়া বলিল, 'থামুন মশাই।' দেখিলাম, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর ভিতর হইতে একখানা ষ্ট্রেচার বাহির হইয়া আসিল, ক্ষিপ্রতার সহিত ষ্ট্রেচারখানি ডাক্তারখানার সিঁড়ির

সামনে পাতা হইল, লোকটিকে একরূপ জোর করিয়াই তাহার উপরে শোয়ান হইল, তাহার পরে তাহাকে বেশ রীতিমত একখানি কম্বল চাপা দেওয়া হইল, তাহার পরে তাহাকে সেই ষ্ট্রেচারে করিয়া অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে তোলা হইল, কয়েকটি এ-আর্-পি-র লোকসহ অধিনায়ক গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন—তাহার পরে গাড়ি পোঁ পোঁ করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

ঘটনাটি একটু সবিস্তারে বলিবার তাৎপর্য আছে। অনেক সময় মনে হইয়াছে, আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যকরী পদ্ধতির সহিত এই ঘটনাটির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যাহার উন্নয়ন তাহার উপর হইতে আমাদের দৃষ্টিটি যেন আস্তে আস্তে একেবারে সরিয়াই যায়; সে উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া, লক্ষ্য হইয়া উঠে—যেমন করিয়া হোক গৃহীত কোনও পরিকল্পনাকে যা হোক একটা বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা। সে চেষ্টায় জনগণের হিত না হইয়া অহিত হইলেও যেন বড় বেশি কিছু আসে যায় না, বাহিরেও বিপুল আড়ম্বরে এবং ততোধিক ঢক্কানিনাদে পরিকল্পনার মহিমা বিঘোষিত হইলেই যেন কামনা পূর্ণ হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা ঘটনা মনে পড়িয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গের লোক, সুতরাং শারদীয়া পূজার সময় দেশে গিয়া অসম্ভব ভিড় জমাইয়াছি। এই সময়ে বহিরাগত দেশবাসিগণের কাহারও তেমন কোনও কাজের কাজ থাকিত না, তা ছাড়া মা দশভুজার দয়ায় আমিষ এবং নিরামিষ উভয়বিধ প্রসাদের বেশ একটু প্রাচুর্যই থাকিত, সুতরাং দেহ-মনেরও একটা স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা থাকিত। ফলে স্বদেশ উদ্ধারের একটা হিড়িক পড়িয়া যাইত। তদুপরি সেবারে আবার ছিল আগতপ্রায় নির্বাচনের রণদুন্দভি! অষ্টমী পূজার দিন রাত্রেই আলাপ আলোচনায় বসিয়া দেখা গেল অবস্থা তেমন অনুকূল নয়। আমাদের অঞ্চলে হিন্দুদের ভিতরে বর্ণহিন্দু অপেক্ষা তফ্শীলী হিন্দুদের সংখ্যাই

অনেক বেশী। সংবাদ পাইলাম, তফ্‌শীলীরা ইতিমধ্যেই সভা করিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারা বর্ণহিন্দু কোনও প্রার্থীকে কিছুতেই ভোট দিবে না। অথচ এই তফ্‌শীলি সম্প্রদায়ের ভোট না পাইলে আমাদের প্রার্থীর পরাজয় অনিবার্য। বহু বড় বড় মস্তক একসঙ্গে মিলাইয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত গভীর চিন্তা এবং আলোচনায় মগ্ন থাকা গেল। শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া গেল যে যেমন করিয়া হোক, এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে দলে টানিতে হইবে। এত চট্ করিয়া দলে টানিবার উপায় কি? ঠিক হইল, আগামী কাল নবমীর দিনে আশপাশের সকল অনুন্নত হিন্দুদিগকে ডাকিয়া জড় করিতে হইবে, তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া আমাদের এক এক বাড়ির পূজা মণ্ডপে তুলিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত একসঙ্গে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহাদিগকে মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহারা তাহাদের ভিতরে যে ব্যবধানের কল্পনা করিয়াছে তাহা একান্তপক্ষেই ভিত্তিহীন—বস্তুতঃ আমরা সকলেই এক মা দুর্গার সন্তান—সুতরাং একেবারে ভাই-ভাই। ভোর হইতে না হইতে দিকে দিকে আমাদের কর্মী বাহির হইয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল, অন্যান্য বৎসরে নবমীর দিনে তাহারা প্রসাদ লইতে যদি বা ভিড় করিত —এবারে আর একটিও আসে নাই। কি করা যায়! আমাদের পরিকল্পনা সবই যে ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন হাতের কাছে পাওয়া গেল কয়েকটি নট্ট, ধোপা, ভুঁইমালী—তাহারা কেহ বা বাজনাদার হিসাবে—কেহ বা পূজার নৈবেদ্যাদির পাওনাদার হিসাবে সমুপস্থিত। অগত্যা আমরা সহসা তাহাদের উপরেই ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তাহাদের ভিতরেও কয়েকজন পলাইয়া বাঁচিল,—যাহারা পলাইবার সুযোগ পাইল না তাহাদিগকে ধমকাইয়া ঘাড় ধরিয়া পূজামণ্ডপে তুলিয়া দিলাম। মোনাই ধুপীকে লইয়া যে বিষম বিপদ বাঁধিয়াছিল তাহার ছবিটি মনে পড়িলে এখনও হাসি পায়। দুইটি লোক মণ্ডপের ভিতর হইতে

মোনাইর দুই হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—মোনাই প্রাণপণ চীৎকার করিতেছে এবং তাহার দেহটিকে পূজামণ্ডপের বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পুরুষানুক্রমে মজ্জাগত বিশ্বাস—বাবুদের দেবালয়ে পা দিলে মহাপাতক হয়,—সে কেন আজ হঠাৎ যাইবে এই মহাপাতকের ভাগী হইতে! গোলমাল শুনিয়া বাড়ির ভিতর হইতে কড়া মেজাজের সেজ কর্ত্তা বাহির হইয়া আসিলেন; চোখ লাল করিয়া তিনি মোনাইকে বলিলেন,—'দেখরে মোনাই, তুই যদি আর এমনটা করবি তবে আমি তোকে ভিটেমাটি ছাড়া করে ছাড়ব।' মোনাই মুহূর্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, এবং নবমী দিবসের ছাগবৎসটিকে যেমন করিয়া যূপকাষ্ঠের নিকটে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় প্রায় সেই রকমেই মোনাইকে অঞ্জলি দেওয়াইবার জন্য মায়ের ঘটের সামনে টানিয়া লওয়া হইল।

যে-কোনও অবস্থায়ই হোক, কোনও উন্নয়ন বা সাহায্য কর্মী বা কর্মচারীর গরজে হইলে হইবে না, অধিকতর গরজ চাই অপর পক্ষের। তাহাদের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইবে; তবেই হইবে উভয় পক্ষের ভিতরকার ব্যবধান দূর। আর পূর্বেই বলিয়াছি, এই ব্যবধান দূর না হইলে উভয়পক্ষের ভিতরকার অনাস্থা কিছুতেই দূর হইবার নহে। ফসল বুনিবার পূর্বে যেমন মাটি হইতে সকল প্রকার আগাছার শিকড় উপড়াইয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনিই জনসাধারণের কল্যাণ করিতে হইলে সর্বপ্রকার অনাস্থার পূর্বসংস্কার দূর করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন আছে। ব্রিটিশ সরকারের আমলে সরকার হিসাবে আমরা তাঁহাদের যাহা মুখ্য দোষ বলিয়া বুঝিয়াছিলাম আমাদের স্বদেশী সরকারের ক্ষেত্রেও সেই দোষই আস্তে আস্তে আবার আত্মপ্রকাশ করিতেছে মুখ্য হইয়া। দেখিতেছি, সরকারী পরিকল্পনা আছে, তাহার সঙ্গে আয়োজনও আছে,

আড়ম্বরও আছে, কিন্তু জনগণের সরকারের জনগণের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। আমলাতান্ত্রিকতার মধ্যে যে দ্বৈতত্ব নিহিত আছে সেই দ্বৈতত্বই আবার দেখা দিতেছে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী এবং বিরাট জনসমাজের মধ্যে ব্যবধান বিরোধ এবং অনাস্থায়। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিতরে তাই অনেক সময় তথ্য আছে, বুদ্ধি আছে—উদ্দেশ্যের সততাও যে কোথাও কিছুই নাই, এসব কথাও বলা যায় না, কিন্তু এগুলির সহিত জনগণের প্রত্যক্ষ যোগের অভাবে ইহা কল্পনানুরূপ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতেছে না।

খুড়োতত্ত্ব

পৃথিবীতলে পঞ্চুখুড়োকে কে যে প্রথমে খুড়ো বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল সে কথা পঞ্চুখুড়ো নিজেও হয়ত এখন ঠাঁয়-ঠিকানায় বলিতে পারিবে না। কিন্তু পথে ঘাটে হাটে মাঠে আবালবৃদ্ধবনিতা যাহার সঙ্গেই পঞ্চুখুড়োর সাক্ষাৎ হয় সেই জোরগলায় ডাক দেয় 'পঞ্চুখুড়ো'—এবং তাহার পরে যথার্থ প্রণাম সকলেই না করিলেও, 'পেন্নাম' বলিয়া প্রণামের ভঙ্গি একটা সকলেই করিত; আমাদের সদানন্দ আশুতোষ পঞ্চুখুড়ো তাহাতেই মোটামুটি খুশী। কিন্তু ঐটুকু অন্ততঃ চাই-ই; খুড়ো বলিয়া বড় গলায় ডাকটা, আর ঐ প্রণামের ভঙ্গিটি। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ঠিক প্রথমক্ষণে পঞ্চুখুড়ো একটি কঠোর সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনও প্রকার অক্ষরের সহিত তাঁহার কোনও সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না এবং সমগ্র গ্রামবাসীর একান্ত বিস্ময়-স্বরূপে এই সঙ্কল্পে তিনি আমরণ অটুট ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে উমেশ বিদ্যারত্নের সাক্ষাৎ পৌত্র এবং ও-অঞ্চলে উমেশ বিদ্যারত্ন যে কতবড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এই দুইটি তথ্য সম্বন্ধে অবহিত পঞ্চুখুড়োর মতন কেহই ছিলেন না। আর গ্রামবাসী কর্তৃক এইটুকুর স্বীকৃতি ছিল তাঁহার ন্যূনতম দাবী।

ও পাড়ার ধনঞ্জয় রায়ের মেঝমেয়ের ছেলে সব পরীক্ষায়ই ভাল পাশ দিয়া অল্প বয়সেই সদরে মুন্সেফি পাইয়াছে। বড় দিনের ছুটিতে সে মামা-বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে। এত বড় কৃতবিদ্য নাতিকে ঘরে বসাইয়া রাখিতে ধনঞ্জয় রায়ের আপত্তি, নাতি আসিলেই তাই তিনি তাহাকে সময়ে সময়ে জোর করিয়া রাস্তায় ঘাটে এবং পাড়ায় পাড়ায় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বিকাল বেলা তাঁহারা খালপাড়ের রাস্তা

ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নিজেদের গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া পাশের গ্রামের দিকে আগাইয়া যাইতেছেন, দেখা গেল পঞ্চুখুড়ো লাল গামছায় বাঁধা একটা ভিজা চালের পুঁটলি মাথায় করিয়া হন্ হন্ বেগে বাড়ি ফিরিতেছেন। ধনঞ্জয় রায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই দূর হইতে—'এই যে পঞ্চুখুড়ো, পেন্নাম' বলিয়া নুইয়া পড়িলেন; কিন্তু পঞ্চুখুড়োর দৃষ্টি ঐ ডেঁপো ছোড়াটার দিকে, সে ঘাড় টান করিয়া আর একদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পঞ্চুখুড়ো ভুরু কুঁচকাইয়া ছোকরাটিকে লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয় রায়কে বলিলেন,—'ছোকরাটি কে হে বটে?' ধনঞ্জয় রায় বলিলেন,—'আজ্ঞে আমার বিনির ছেলে—সেই যে মেঝো মেয়ে বিনি ইদিলচকে বে দিলুম—'

পঞ্চুখুড়ো বলিলেন,—'বুঝেছি, বুঝেছি—আরে সেই যে তোমার মুন্সেফ নাতি'—

'আজ্ঞে হ্যাঁ হ্যাঁ'—বলিয়া ধনঞ্জয় হাত জোড় করিয়া মাটির দিকে আরও নুইয়া পড়িলেন।

'তা দেখ, বেশ বেশ,—তা দেখ—একটু মান-মজ্জাদা শিখিয়ে দিও হে, শুধু মুন্সেফ হ'লেই ত হয় না।'

'তা বটে, তা বটে—। নেরে সতু, পঞ্চুখুড়োকে একটা পেন্নাম কর—উমেশ বিত্তারত্নের নাতি—জানিস্'—বলিয়াই ধনঞ্জয় রায় তাঁহার নাতির ঘাড়টা ধরিয়া খানিকটা নোয়াইয়া দিলেন।

পঞ্চুখুড়ো বলিলেন, 'আরে থাক্ থাক্, ওতেই হয়েছে, এমনিই—আশীর্বাদ করছি—ধন হোক—মান হোক—দীর্ঘ আয়ু হোক'—বলিয়াই তিনি তাঁহার অপরিষ্কৃত দন্তরাজি বিকশিত করিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। ধনঞ্জয় রায় পথে পথে নাতিকে বুঝাইতে বুঝাইতে ফিরিলেন যে, লোকটা একটু পাগলাটে হইলেও মানী মানুষ—উমেশ বিত্তারত্নের নাতি।

পরের দিন সকাল বেলা—সেই ধনঞ্জয় রায় আর তাহার নাতি সতু—সেই খালের পাড়ের রাস্তা ধরিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। খালে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে একটি লোক, কোমড়ের কাছে ঝুলান একটি বাঁশের খালুই। শীতের কুয়াসায় ভাল করিয়া চেনা যায় না,—কাছে আসিতেই দেখা গেল স্বয়ং শ্রীপঞ্চুখুড়ো। একখানি গামছা পরিহিত—তাহাও উপরের দিকে যতটা সম্ভব টানিয়া ওঠান; গায়ে একটি পাতলা কাঁথা আঁট করিয়া জড়ান, আর পরিধানের বস্ত্রখানি দ্বারা দুই কান ভাল করিয়া ঢাকিয়া একটি পাগড়ি বাঁধা। পিছন হইতে ধনঞ্জয় রায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হেঁই যে পঞ্চুখুড়ো, মাছ মিলল কিছু ?'

পঞ্চুখুড়ো জাল টানিতে টানিতে বলিলেন, 'খাটলে দু'চারটা মেলে বই কি ? এই দু' চারটে ইচা (চিংড়ি) পুঁটি চেলা—আর বড় নয় কিছু।'

পঞ্চুখুড়োকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নাতি সতু বলিল,—'দাদু, শামুক ঝিনুক জালে যা উঠছে সবই লোকটি খালুই ভর্তি করে নিচ্ছে কেন ?' কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া ধনঞ্জয় রায় বলিলেন,—'পঞ্চুখুড়োর অনেক হাঁস, সেই হাঁসের জন্য নিচ্ছেন।'

মাছ ধরিতে পঞ্চুখুড়ো শুধু ওস্তাদ নন, প্রায় অদ্বিতীয়। একথা তল্লাটের জেলে-জিয়ানীরা পর্যন্ত বিবিধ উপলক্ষে নতমস্তকে স্বীকার করিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মৎস্য-মারাই পঞ্চুখুড়োর আসল পেশা; যজনাদি কার্যে দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে একবার বাহির হইতে হয়, নিজের গ্রাম বা আশপাশের গ্রামের কাজ সারিয়া ফিরিতে ফিরিতে বিকাল হইয়া যায়। তারপরে কোনও রূপে নাকে-মুখে কিছু গুজিয়া লওয়া,—তারপরেই বড়শি লইয়া বাহির হওয়া, রাত্রির অন্ধকার একেবারে ঘনীভূত হইয়া আসিবার পূর্ব পর্যন্ত। জাল বাহিয়া হোক, বড়শি

ফেলিয়া হোক, বাঁশের 'চাই' পাতিয়া হোক, মৎস্য-শিকারের যত প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালীগুলির সংশ্লিষ্ট আবার যতগুলি ফন্দি-ফিকির রহিয়াছে—পঞ্চুখুড়োর কিছু অজানা ছিল না। কোন্ জাতীয় বড়শিতে কোন্ জাতীয় মাছ ধরিবার জন্য চালের পিটুলি গাঁথিতে হয়, কখন কেঁচো দিতে হয়, কখন বোল্‌তার ডিম—কখন ছোট ছোট সোনা ব্যাঙ —এ-সকল তথ্য পঞ্চুখুড়োর নখদর্পণে। এই জন্য আড্ডা জমে তাঁহার সব চেয়ে বেশি জেলে-জিয়ানীর সঙ্গে।

একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই ধনঞ্জয় রায়ের মুন্সেফ নাতি সতুকে লইয়াই। ছেলেবেলায় সতু মাইনর পর্যন্ত মামাবাড়ি থাকিয়াই পড়িয়া গিয়াছে ; সুতরাং এই মামাবাড়ি শুধু নয়—সমস্ত গ্রামটার সঙ্গেই সমস্ত শৈশবের মধুর স্মৃতি জড়িত হইয়া কেমন একটা নাড়ীর টান দেখা দিয়াছে। মাইনরের পর হইতেই শহরে অধ্যয়ন, সুতরাং শহরেই বাস ; এই শহরবাস ঐ গ্রামটাকে আরও অনেকখানি তাহার মনের কাছে আনিয়া দিয়াছে। তাই ছুটি পাইলেই সতু মামাবাড়ি চলিয়া আসে—আর সকাল-সন্ধ্যা তাহার শত স্মৃতিমাখা রাস্তাঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সেবারে আশ্বিনের প্রথমেই দুর্গাপূজা পড়িয়াছে, সতু পূজার ছুটি পাইয়াই মামাবাড়ি চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ববঙ্গের পাড়া-গাঁ—তখন পর্যন্ত চারিদিকে জল থৈ থৈ। এক বাড়ি হইতে অন্য বাড়ি যাইতেও পথে হয় এক হাঁটু জল—নয় এক হাঁটু কাঁদা। আজ অষ্টমী পূজা, পাশের বাড়িতে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আরতির ঢাক-কাঁসর বাজিয়া উঠিয়াছে। সতু অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় পা টিপিয়া টিপিয়া পাশের বাড়ি গেল আরতি দেখিতে। গৃহস্থটি গরীব ছিল, সতুকে দেখিয়া তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ; তথাপি মুহূর্তমধ্যে একখানি হাতলভাঙা চেয়ার আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল এবং একটু চা করিয়া দিবার জন্য সকলে

যেন হস্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি লাগাইয়া দিল। কিন্তু পূজা-মণ্ডপের ভিতরের দিকে তাকাইয়া সতুর ত চক্ষু স্থির—দেবীর পূজারী হইয়া আরতি করিতেছেন একখানি নামাবলী গায়ে সেই পঞ্চুখুড়ো। প্রথমে ধূপের ধোঁয়ায় লোকটিকে ঠিক করা যায় নাই, তারপরে তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিয়া সতু এমন আচমকা ভাবে এবং এমন একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া চেয়ারখানি ছাড়িয়া একদম বাড়ির বাহির হইয়া গেল যে, বাড়ির সমস্ত লোকই তাহার গর্বে এবং অসৌজন্যে ব্যথিত এবং বিরক্ত হইল। কথাটা পঞ্চুখুড়োর কানে পৌছাইল,—এই ডেঁপো দেমাকী লোকটার কথা ভাবিয়া রাগে পঞ্চুখুড়োর গা'টা গিস্ গিস্ করিতে লাগিল। আরতি সমাপ্ত করিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

পূজামণ্ডপের সামনে হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সতু বাড়ি ফিরিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে সেই খালপাড়ের রাস্তায়ই গিয়া পড়িল। খোলা রাস্তা দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সতুর মনে হইতেছিল, কাজটা সে তেমন ভাল করে নাই—মনটা কেমন যেন একটু খারাপ খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু ঐ পঞ্চুখুড়োর চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ এবং দেবীর আরতি জিনিসটা সতু কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না।

দিনের বেলার দু'এক পশলা পাতলা বর্ষা হইয়া গিয়াছে, আকাশে এখনও একটু আধটু মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে ঝরিয়া পড়িতেছে অষ্টমীর জ্যোৎস্না। পাশের শীর্ণ খালটা আজ কেমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে! বেশ ভাল লাগে সতুর এই রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতে। হাঁটিতে হাঁটিতে সোজা পশ্চিমমুখে আগাইয়া চলে সতু গ্রামের প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা কাঠের পুল, তাহার চওড়া হাতলগুলির উপরে বেশ বসিয়া থাকা চলে। সতু তাহারই একটার উপরে পা তুলিয়া দিয়া খানিকটা কাৎ হইয়া বসিয়া রহিল। রাস্তার ডান পাশে খাল—আর দুই দিকে জলে থৈ থৈ ধানের মাঠ।

ধানগাছগুলি এখন বেশ লম্বা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের গলা অবধি জল। মাঝে মাঝে দু'এক খানা মাঠ জলা গিয়াছে, তাহাতে ধান জন্মে নাই—ফুটিয়া আছে লাল সাদা অসংখ্য শাপলা। দুই পাশের মাঠেরই দূরে দূরে গাছপালা-ঢাকা গ্রাম, জলভরা মাঠের মাঝে মাঝেও পড়িয়াছে এক আধটা বাড়ি। এখান হইতে সেখান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র-নিঃসৃত আরতির বাজনা, তাহার সবটাই পটু বাদ্যকারের হাত হইতে নয়, অনেকটাই অত্যুৎসাহী বালক-যুবকগণের অপটু বা অর্ধপটু হাত হইতে। দুই পাশের মাঠের জলচলাচলের সংযোগস্থলে হইল এই প্রশস্ত পুলটি। উত্তর দিকের সকল মাঠের জল ঢালু হইয়া এই পুলের নীচ দিয়া আসিয়া পড়িতেছে দক্ষিণের খালের একটানা জলে। পুলের কাছ দিয়া একটানা জল পড়িতে পড়িতে জায়গাটা মাঠ হইতে আস্তে আস্তে ঢালু হইয়া পুলের নিকটে বেশ খাই হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বৎসর জেলেরা এখানে বাঁশের 'চাই' পাতিয়া মাছ ধরে; তাই তাহারা বর্ষাকাল পড়িলেই বাঁশ পুঁতিয়া এবং তাহার সঙ্গে বাঁশের চ্যাটাই বাঁধিয়া 'গড়া' বাঁধিয়া লয়। বাঁশের এই ঘেরান বেড়া মাঠ হইতে আগত নিম্নাভিমুখী জলকে প্রচণ্ড বাধা দেয়, সেই বাধা পাইয়া জল যেন ফুঁসিয়া উচ্ছ্রিয়া উঠিতে থাকে, মৃদু গর্জনে কল্-কল্ ঝুপ্-ঝাপ্ শব্দ করিয়া সবেগে আগাইয়া আসিয়া ঘন আবর্তের সৃষ্টি করিতে করিতে খালের একটানা জলে মিশিয়া যায়। মেটে মেটে জ্যোৎস্নার ভিতরে এই অর্ধবৃত্তকারে উচ্ছিয়মান জলের শুভ্ররজতরেখা-কান্তি—তাহাদের একটানা কল্-কল্—ছল্-ছল্—ঝুপ্-ঝাপ্ শব্দধারা স্তিমিত চেতনার মধ্যে কেমন একটা একতানতার সৃষ্টি করে। কাছেই মাঠের মধ্যে জেলেদের 'টঙ্-ঘর',—অর্থাৎ লম্বা বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া জলের উপরে মঞ্চাকৃতি ছোট ঘর। লম্বা বাঁশের চোঙের মধ্যে রান্নার সকল মশলা ঢুকাইয়া একটা ছোট সরু মুগুরের আকৃতি কাঠি দিয়া

ঘষিয়া ঘষিয়া মসলা প্রস্তুত করা হইতেছে—তাহার শব্দও ঐ জলের শব্দের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে।

সতু খানিক পরে লক্ষ্য করিল, মাঠের ভিতর দিয়া লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া একখানি জীর্ণ ভাঙা ছিপ নৌকায় দুইটি লোক আসিয়া টঙের কাছে পৌঁছিল। টঙের একটা খুঁটির সঙ্গে নৌকার দড়ি বাঁধা হইল। তারপরে সামনের লোকটি নৌকার আগায় পা দিয়া যেমনি টঙের উপরে উঠিতে যাইবে অমনি মট করিয়া আগাটি ভাঙিয়া গেল। লোকটি জলে পড়িতে পড়িতেই টঙের বাঁশ ধরিয়া কোনও রকমে উপরে উঠিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে অপর লোকটিও উপরে উঠিয়া গেল, ভিতরে একটা হাসির রোল উঠিল। তারপরে খানিকক্ষণ তামুক টানার ফুরুক্ ফুরুক্ শব্দ, পুটপাট দুই একটি কথা—তার পরেই একটু গুন্‌গুন্ সুর টানার শব্দ। সুরটি বড় মধুর লাগিতেছে। আস্তে আস্তে বাড়িয়া উঠিল—বেশ স্পষ্ট গান শোনা যাইতেছে—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

কি মধুর কণ্ঠ—কি মধুর সুর—কি মধুর কথা! সতু যেন এমন কণ্ঠ, এমন সুর, এমন কথা কোনও দিন শোনে নাই। মাঠের থৈ থৈ করা জল, সবুজ ধানের মোটা মোটা শীষ, অষ্টমীর পাতলা মেঘে মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্না—সকলের সঙ্গে যেন এই সুর—এই কথা মিশিয়া যাইতেছে; উচ্ছ্বিয়মান জলের একটানা শব্দ যেন ইহার সঙ্গে অপূর্ব সঙ্গতে যোগ দিয়াছে; সতুর মন আস্তে আস্তে কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

গান থামিয়া গেল। বেশ খানিকক্ষণ গল্প স্বল্প করিবার পর এবং পুনরায় দু'এক ছিলিম তামাক টানার পর আগন্তুক লোক দুইটি আবার টঙ হইতে ছিপ নৌকায় নামিয়া পড়িল। একটি লোক লগি ঠেলিয়া নৌকাখানিকে এবার পুলের কাছে রাস্তার পাশে আনিয়া লাগাইল। দ্বিতীয় লোকটি একটা লাফ দিয়া পাড়ে পড়িয়া বলিল,—'যাইরে মঙ্গল,—দেড়পর রাতে আবার সিদ্ধিপূজা বাকি আছে।' কণ্ঠস্বরে সতু বুঝিতে পারিল, এই লোকটিই গায়ক। পুল ছাড়িয়া লোকটির দিকে আগাইয়া আসিল সতু, চাহিয়া দেখিল সেই পঞ্চুখুড়ো; কেমন অভিভূত হইয়া আগাইয়া আসিয়া সতু পঞ্চুখুড়োর কাদাভরা পা ছুঁইয়াই একটা প্রণাম করিল। পঞ্চুখুড়ো বলিলেন,—'কেরে, সেই ধনঞ্জয়ের মুন্সেফ নাতি নয়রে? একটা পেন্নাম ক'রে তবে ছাড়লি?' বলিয়াই কেমন একটা কদর্য বোকাহাসি হাসিয়া পঞ্চুখুড়ো আগাইয়া চলিয়া গেলেন।

কণ্ঠস্বর ছেলেবেলা হইতেই পঞ্চুখুড়োর অপূর্ব, এই পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাহাতে একটু মরিচা ধরিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এই কণ্ঠস্বরের জন্যই পঞ্চুখুড়োকে তাঁহার ছেলেবয়সে দুই দুই বার দুইটি যাত্রাকোম্পানী প্রায় লোপাট করিয়াই লইয়া গিয়াছিল। প্রথম বারে নাকি পঞ্চুখুড়োর পিতাঠাকুর যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গুণধর পুত্র যাত্রাদলে ভিড়িয়া শুধু তামাক-বিড়ি নয়, বেশ 'সিদ্ধিতে নিপুণ' হইয়া উঠিয়াছে, তখন একেবারে কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া তাহাকে বাড়িতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে নাকি খুড়ো যাত্রাদলের স্বত্বাধিকারীর কিঞ্চিৎ অস্থাবর স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেই সোজা বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিলেন। এ-ছাড়া ঐ অঞ্চলের ঢপওয়ালাদের সঙ্গে যোগ দিয়া পঞ্চুখুড়ো বহুবার দোহারকি করিয়াছেন; নিজেও বহুবার সখের ঢপের দল গড়িয়া গান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রশংসা পাওয়া ছাড়া নিন্দাভাজন হ'ন

নাই বড় কোথাও। নিরক্ষর হইলেও বহু শ্যামা-সঙ্গীত, আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত এবং বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী পঞ্চুখুড়োর মুখস্থ ছিল। মাছের প্রসঙ্গই ছিল খুড়োর প্রিয়তম প্রসঙ্গ—সুতরাং আড্ডাটা জমিত এই জেলে-জিয়ানীদের সঙ্গেই বেশী; পঞ্চুখুড়োর গানও তাই বেশী শোনা যাইত এই জেলে-জিয়ানীদের আড্ডায়।

কিন্তু মৎস্য শিকার পেশা হইলেও এবং জেলেদের সঙ্গেই আড্ডাটা একটু বেশি জমিলেও যজনযাজনাদি কাজেও পঞ্চুখুড়োর একটা ডাক ছিল, এটা বোধহয় মুখ্যতঃ বংশগৌরবের জন্য। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অক্ষর-পরিচয় লাভ করিতে না পারিলেও মন্ত্র-পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই এমন নহে। শুনিয়া শুনিয়া অনুস্বর-বিসর্গান্ত যা দু'একটি কথা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে দেশ-গাঁয়ে তাহাতেই একরূপ কাজ চলিয়া যাইত,—কারণ ধর্মাধর্মের চর্চা মুখ্যতঃ মেয়ে-মহলে, সেখানে শুধু পঞ্চুখুড়ো নন, সব খুড়োই প্রায় নিরঙ্কুশ। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে সকল প্রকার ব্যবসায়ীরই বিশেষ বিশেষ ধরণের কতগুলি যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের প্রয়োজন, পৌরোহিত্যের জন্যও উপকরণ-বাহুল্য নেহাৎ কম নহে। কিন্তু পঞ্চুখুড়োর উপকরণ সবই দায়াদসূত্রে লব্ধ, নিজের জীবনে আর কিছুই করেন নাই; ফলে কিছু কিছু জিনিস—যেমন তালপাতার 'চণ্ডী' পুঁথিখানি—এমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দ্বারা আর কোনওরূপেই কাজ চালান যাইতেছে না। এই উপকরণের অসদ্ভাবকে পূরণ করিয়া লইতে হয় পঞ্চুখুড়োর নানা প্রকার উপস্থিতবুদ্ধি এবং ফন্দি-ফিকিরের দ্বারা। কিন্তু এই সব ফন্দি-ফিকির ফস্কিয়া গিয়া রামফ্যাসাদেও যে পড়িতে হয় নাই খুড়োকে দু'একবার এমন নহে।

সেই একবার পাশের গাঁ রত্নপুরে বিজয়াদশমীর প্রশস্তি-বন্ধনের সময়ে, দত্তবাড়ির ছেলেবুড়ো সব সভা করিয়া বসিয়া আছে। মায়ের ঘটসহ সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজান রহিয়াছে নূতন একখানি কুলার উপরে,

তাহারই সঙ্গে লালগামছায় জড়ান একখানি 'চণ্ডী'-পুঁথি। পুরোহিত পঞ্চুখুড়ো সেই কুলাখানি একজনের একজনের করিয়া ছোঁওয়াইয়া যাইতেছেন ছেলেবুড়ো সকলেরই কপালে। সেজকত্তার কপালে ছোঁওয়াইবার বেলা ঠাকুরমহাশয় কি করিয়া পিছন হইতে বেশ একটু ধাক্কা পাইলেন—কুলাখানি—এবং তৎসহ 'চণ্ডী'পুঁথিখানির সজোরে ধাক্কা লাগিল গিয়া সেজকত্তার প্রশস্ত কপালে। কি যেন একটা কিছু কপালে বিঁধিয়া গিয়াছে বুঝিয়া সেজকত্তা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, —'কপালে এটা বিঁধিল কি ঠাকুরমশাই?' ঠাকুর মহাশয় একটু অপ্রস্তুতের ভান দেখাইয়া বলিলেন, 'পুরণো 'চণ্ডী' বাবা—বোধ হয় তালপাতার শলা ঢুকে থাকবে।' সেজকত্তার বড় ছেলে চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেজকত্তার কপাল হইতে শলাটি টানিয়া বাহির করিয়া বলিল,—'কোথায় ঠাকুর তালপাতার শলা, এ যে নারকেল পাতার শলা, দেখি আপনার চণ্ডী'—বলিয়াই কুলার উপর হইতে চণ্ডীখানা লইয়াই একটানে তাহার আবরণ-বস্ত্র গামছাখানি খুলিয়া ফেলিল,—দেখা গেল, আর কিছুই নহে, গামছায় মোড়ান একখানি নারিকেলের শলা-নির্মিত ঝাঁটা! ছেলের দল সহসা যতই উত্তেজিত হইয়া উঠুক না কেন—বিজয়ার দিনে বৃদ্ধেরা কিছুতেই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে দিলেন না; কিন্তু পঞ্চুখুড়োর এত বড় এক ঘর যজমান চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হইয়া গেল।

আর একদিনের ঘটনাটি ছিল আরও একটু জটিল প্রকৃতির। সে আরও একটু দূরের গাঁ বেতঘাটায়। পুরণো তালুকদার বাড়ি, এখন লেখাপড়া শিখিয়া সকলেই বিদেশবাসী। শুধু একমাত্র মধু পিপলাইয়ের নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রী রাজুবালা ধর্মকর্ম পালা-পার্বণাদি রক্ষা করিতে বাড়িতে আছেন। এবারে আষাঢ়ের পূর্ণিমায় গুরু-পূর্ণিমা পড়িয়াছে; রাজুবালার ইচ্ছা এই পূর্ণিমায় লক্ষ্মী-নারায়ণের অভিষেক করিয়া একটু

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এই পিপলাই বাড়ির বহু প্রাচীনকালের স্বর্ণচক্রধারী শালগ্রাম শিলাটি চুরি হইবার পরে রাজুবালা সকল পূজারী ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া সশব্দে অনেক গাল পাড়িয়াছেন, সে গালির ব্যঞ্জনা ছিল এই যে, এই চৌর্যকার্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কীর্তি! ইহার পরে চট করিয়া কোনও পুরোহিতই আবার এ বাড়ি আসিয়া যাজনিক কার্য করিতে রাজী হইলেন না। একটু দূর সম্পর্কে পরিচয় ছিল পঞ্চুখুড়োর সঙ্গে রাজুবালার, অগত্যা লোক পাঠাইয়া রাজুবালা ডাকাইয়া আনাইলেন পঞ্চুখুড়োকে; সব শুনিয়া মাথা নাড়িয়া পঞ্চুখুড়ো বলিলেন, তিনিই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করাইতে পারিবেন। রাজুবালা বলিলেন,—'আমার যে শালগ্রাম শিলা নেই।' পঞ্চুখুড়ো হাসিয়া বলিলেন, 'সে সব ভাবতে হবে না, সব যোগাড় করে আনব।'

যথা-নির্দিষ্ট দিনে এবং যথা-নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চুখুড়ো শালগ্রাম-শিলাসহ যখন আসিয়া পিপলাই বাড়ি উপস্থিত হইলেন, তখন পিপলাই গিন্নীর মনটা বড় বিরূপ হইয়া গেল। তেল চিট্‌চিটে ময়লা ছেঁড়া একখানি নামাবলী কাঁধের উপরে ভাঁজ করিয়া ফেলান আছে, পায়ে এক হাঁটু কাঁদা, মাঝে মাঝে ধানগাছের এবং জোলো ঘাসের আঁচড়ের দাগ; পরিধানে আটহাতি মোটা ধুতি—জল-কাদার ভয়ে তাহাও যতখানি সম্ভব উপরে গুটানো; ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার চুল—ঠিক যেন পুরণো আমের ডালে কাকের বাসা। বুদ্ধিমান পঞ্চুখুড়ো রাজুবালার মনের ভাবটা খানিকটা আঁচ করিলেন, বলিলেন,—'পা-টা ধুয়ে আসছি বৌমা। শুকনো রাস্তা দিয়েই বেশ ফিট্‌ফাট্ আসা যেত—তা বড় ঘুরা পথ হে; তাই জল-কাদায় একটু কষ্ট হ'লেও এলুম এই মাঠের পথেই।' রাজুবালা আর বাক্যব্যয় করিলেন না, পঞ্চুখুড়োও চট্‌পট্ করিয়া প্রাথমিক প্রস্তুতির পালা শেষ করিয়া পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। কালো রঙের শালগ্রাম

শিলাটি যখন পঞ্চুখুড়ো তাম্রকুণ্ডের ভিতরে স্থাপিত করিয়া পঞ্চ কষায় এবং পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইতেছিলেন রাজুবালা তখন লক্ষ্য করিলেন শালগ্রাম-শিলাটির অর্ধেকের বেশির ভাগ একখানি লালবস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আবৃত। রাজুবালা বলিলেন—'অভিষেকের সময়ও ঐ কাপড়টা জড়িয়ে রাখলেন কেন ঠাকুর মশাই ?' পঞ্চুখুড়ো তাঁহার অর্ধনিমীলিত নেত্রদ্বয়কে আরও নিবিড়ভাবে নিমীলিত করিয়া বলিলেন,—'বড় প্রত্যক্ষ শালগ্রামশিলা বৌমা, সর্বদাই একটু আবরণ রাখতে হয়'—বলিয়া তুলসী-চন্দনের উপরে শালগ্রামশিলা আসনে স্থাপিত করিয়া তাহাতে অনেক ফুল চাপাইয়া শালগ্রামশিলাটিকে একেবারে ঢাকিয়া দিলেন ; তারপরে তিনি একেবারে টান হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ যায়, খুড়ো আর চোখ মেলেন না ; রাজুবালাও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া কাছে বসিয়াছিলেন, মাঝখানে তিনি চোখ খুলিয়া দেখেন, একি আসনের ফুলগুলি যেন নড়িতেছে ; আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন—আবার তাকাইলেন, না ভুল ত নয়, ফুল নড়িতেছে—বেশ নড়িতেছে—। রাজুবালা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুর মশাই—ব্যাপার কি ? ফুলগুলো যে নড়ছে— !' চোখ খুলিয়াই সামনের দিকে তাকাইয়া খুড়ো ভক্তিবগলিত হইয়া বলিলেন,—'নারায়ণ—মধুসূদন—প্রত্যক্ষ হয়েছেন —ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন'— ! রাজুবালার সহসা কণ্ঠ শুকাইয়া গেল—হাত-পা থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'বলেন কি ঠাকুর, বলেন কি ?'

'বলেছি ঠিক,—ওই চেয়ে দেখছ না ফুলগুলো কি রকম নড়ছে ? আহা হা—ভক্তের ভগবান্—দয়াল ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন,—প্রত্যক্ষ—!'

আরও বিহ্বলকণ্ঠে রাজুবালা বলিলেন, 'এখন কি করি ঠাকুর, কি করি—?'

'দক্ষিণা দাও—দক্ষিণা,—ঠাকুরকে আমার দক্ষিণা দাও—। সোনা আছে ? সোনার মোহর ?

উত্তেজিত কণ্ঠে রাজুবালা বলিলেন, 'আছে, আছে'—বলিয়াই তিনি দৌড়াইয়া পাশের কক্ষে ঢুকিলেন—সরাৎ করিয়া লোহার সিন্ধুকটা খুলিয়া বহুদিনের সঞ্চিত সাতখানি মোহর বাহির করিয়া প্রায় দৌড়াইয়া আসিলেন। সেই সাতখানি মোহর পঞ্চুখুড়োর পায়ের কাছে রাখিয়া রাজুবালা প্রথমে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে টান হইয়া পড়িলেন। একটু পরেই চীৎকার করিয়া বাড়ির বুড়ী ঝিকে বলিলেন পাড়ার লোক সব ডাকিয়া আনিতে। বুড়ী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দৌড়িয়া ছুটিয়া গেল এবং চীৎকারে পাড়ার লোক জড়ো করিতে লাগিল। রাজুবালা প্রায় অচেতনের মত সাষ্টাঙ্গে হত্যা দিয়া পড়িয়া অস্ফুটস্বরে 'নারায়ণ, নারায়ণ' নাম জপিতে লাগিলেন।

দুইচারি মিনিটের ভিতরেই আট-দশজন লোক আসিয়া ঘরে জমা হইল, কেহ স্নান করিতেছিল, ভিজা কাপড়েই উপস্থিত ; কেহ খাইতে বসিয়াছিল, এঁটো হাতেই দৌড়িয়া আসিয়াছে ; কেহ ঠাকুরপূজায় বসিয়াছিল—ঠাকুর আসনে রাখিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত। সবাই বলিতেছে—'কি কি ব্যাপার কি ?' লোকজনের সাড়া পাইয়া রাজুবালা ধরমর করিয়া উঠিয়া বসিয়াই বলিল,—'দেখছ না, ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন—ঐযে নড়ছেন !'

সত্যই ত, ঠাকুর নড়িতেছেন—নড়িয়া নড়িয়া ঠাকুর এতক্ষণে ফুলের ভিতর হইতে অনেকখানি বাহিরে সরিয়া আসিয়াছেন। 'নারায়ণ-মধুসূদন' বলিয়া রাজুবালা আবার পড়িয়া যাইতেছিলেন, প্রতিবেশিনী রাখালের মা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

দীনু কবিরাজ বলিলেন, 'ভায়া, ব্যাপার কি ?'

তিনু ঘরামি বলিল,—'তাইত, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না।'

'দোখ কি ব্যাপার'—বলিয়া অল্পবয়সের রাখাল শালগ্রামশিলার দিকে আগাইয়া যাইতেই রাজুবালা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ছুঁস্‌নি হতভাগা, ছুঁস্‌নি'—

রাখাল তবুও আগাইয়া গেল, নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ কি রকম শালগ্রামশিলা—দেখি—' বলিয়াই সে শালগ্রামটি হাতে তুলিয়া জড়ান কাপড়খানি খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'এঁ্যা, এ যে মস্ত বড় এক শামুক—জল পেয়ে ন'ড়ে বেড়াচ্ছে—'

'এঁ্যা—বলিস্‌ কিরে হতভাগা' বলিয়া রাজুবালা উঠিয়া দাঁড়াইতেই রাখাল কালো বড় শামুকটি রাজুবালার একেবারে সামনে আনিয়া ধরিল। রাজুবালা এতক্ষণ লক্ষ্যই করেন নাই পঞ্চুখুড়ো ঘর হইতে কখন উধাও হইয়া গিয়াছেন; তিনি এদিক ওদিক তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'ওরে কোথায় গেলরে সর্ব্বনাশা পুরুত—আমার সাত-সাতখানা সোনার মোহর'—আর কিছু বলিতে না পারিয়া রাজুবালা এবারে সত্যসত্যই মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। 'ধর শালার বামুনকে—ধর'—বলিয়া পাড়ার লোক তক্‌খুনি চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কেহই পঞ্চুখুড়োর টিকিটিও আর দেখিতে পাইল না।

কথাটা থানার পুলিশের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছাইয়াছে শুনিয়া পঞ্চুখুড়ো তৎকালের জন্য একটু গা-ঢাকা দিলেন বটে, কিন্তু মাস ছয়েক পরে একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে তাঁহাকে যথারীতি একটি খালুই কোমরে বাঁধিয়া একখানি জাল হাতে খালপাড়ে যথারীতি ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল।

পঞ্চুখুড়োর স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন হয়। এক ছেলে, সে বড় হইয়া বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়িতেই গিয়া ঘর করিয়া আছে, ঘরে শুধু এক মেয়ে, বিশ-বাইশ বছর তাহার বয়স। মেয়ের বিবাহ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখে নাই কেহ কোন দিন পঞ্চুখুড়োকে

—মেয়েরই অদৃষ্ট বলিতে হইবে। মেয়ের পনর-ষোল বছর বয়স হইতেই সম্বন্ধ যোগাড় করিতে এবং মেয়ে দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন পঞ্চুখুড়ো, কিন্তু হয় কেহ মেয়ে পছন্দ করে না, নয় কেহ বেশি টাকা চায়। কিন্তু তবু সম্বন্ধ যোগাড় করিয়া মেয়ে দেখাইতে বিরাম ছিল না তাঁহার, পাড়া-প্রতিবেশী বলিত, মেয়ে দেখানর এক বাতিক হইয়াছে পঞ্চুখুড়োর। এই মেয়েকে লইয়াই শেষ পর্যন্ত এক মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিল পঞ্চুখুড়ো।

কিন্তু খুব বেশি দিন দুর্ভাবনায় ভুগিতে হইল না পঞ্চুখুড়োকে, একদিন কলেরাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিষ্কৃতি দিয়া গেল তাঁহাকে তাঁহার মেয়ে। সবাই ভাবিল, বৃদ্ধবয়সে এইবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে পঞ্চুখুড়ো; কিন্তু পরম বিস্ময়ে গ্রামবাসী দেখিতে পাইল, ঠিক তৃতীয় দিবসেই আবার কোমরে খালুই বাঁধিয়া, গামছা পরিধানে—পরণের কাপড়খানা মাথায় পাগড়ি করিয়া জালহাতে খালপাড়ে বাহির হইয়াছেন পঞ্চুখুড়ো। সবাই ভাবিল, লোকটা কি একেবারেই অমানুষ !

কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না বেঙ্গু তিলি ! একদিন সকালে খুড়ো খালে জাল বাহিতেছে, কাছে বসিয়া দেখিতেছে বেঙ্গু ! তারপরে সে একবার বলিয়াই ফেলিল,—'বড় শক্ত তোমার বুক খুড়োঠাকুর !'

'কেন রে, কেন রে' বলিয়া সাগ্রহে আগাইয়া আসেন খুড়ো।

বেঙ্গু বলিল,—'শেষের সম্বল ত ছিল তোমার ঐ মেয়েটা, আমরা ত দেখেছি তার জন্য তুমি কিই না করেছ—দিন-রাত 'মা' ছাড়া তোমার ডাকটি ছিল না ! সেই মেয়েটা অমনি ঠাস্ ক'রে ম'রে গেল, তোমাকে ত দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে দেখলুম না ঠাকুর !'

'কথাটা তুই যখন তুললি বেঙ্গু, তখন মনের কথাটা তোকে খু'লে বলি,—সকলকে ত আর সব কথা বলা যায় না !' বলিয়াই জালটা হাত

হইতে খুলিয়া বেঙ্গুর একান্ত কাছে আগাইয়া বসিল পঞ্চুখুড়ো। 'দেখ, এই মেয়েটার একটা বিয়ের জন্য কত চেষ্টা করেছি, দেখেছিস্ ত তোরা? করেছি কি করি নি,—বল তোরা।'

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে বেঙ্গু।

'আর মেয়েও ত তোরা দেখেছিস্—কেমন সাক্ষাৎ শ্যামা-মূর্তি!' আবার মাথা নাড়ে বেঙ্গু।

'কিন্তু হ'লে হবে কি, কারোর পছন্দ নেই আমার মেয়েকে, সবারই চাই স্বর্গের ফুট্‌ফুটে ডানা-কাটা পরী; তা আমি কোথায় গিয়ে পাব বল দেখি? আর তা না হ'লে ত দাও একডোল টাকা—তা-ই বা আমি কোথায় পাব? এক-একজনে ত এসে মেয়ে দেখে নাক সিঁটকে ঠোঁট উলটে চলে যেতেন, বা হয়ত লম্বা লম্বা টাকার ডাক ডেকে যেতেন সব নবাবপুত্তুরেরা। তারা সব চ'লে গেলে তারপরে মেয়েটাকে ত বুঝ-প্রবোধ একটা কিছু দিয়ে সামলাতে হবে? ঘরে ত আর লোক নেই—জানিস্‌ই—আমি ব'সে রাতের বেলা মেয়েটাকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বলতাম, দেখ পছন্দ ওদের তোকে খুব হয়েছে, কিন্তু ব্যাপার কি জানিস্, আমি এ ঘরে তোকে কিচ্ছুতে বিয়ে দেব না। আমি তন্ন তন্ন করে খোঁজ-খবর ক'রে জানতে পেরেছি অনেক কথা, ও ছেলেটার স্বভাব-চরিত্তির তেমন সুবিধের নয়। তখন বানিয়ে বানিয়ে ব'লে দিতুম অনেক কথা। কখনও বা দিয়েছি বরের দোষ, কখনো দিয়েছি ঘরের দোষ, কখনও বলেছি কুলের কলঙ্ক! কিন্তু বাবা, রোজ রোজ কত আর এমন ধারা বানিয়ে বলা যায় তুই-ই একবার ভেবে দেখ দেখি। এ-সব বলতে বলতে শেষটায় মেয়েটাও কেমন পাগল হ'য়ে যেত—আমিও কেমন পাগল হ'য়ে যেতুম। কিন্তু এও ত বোঝ, বাপ হ'য়ে চেষ্টা না ক'রেও ত আর ঘরে ব'সে থাকা যায় না! কিন্তু শেষের দিকে কেউ মেয়ে দেখতে এলেই আমার মনে হ'তে থাকত—অপছন্দ ত শালার

ব্যাটারা করবেই—তারপরে—আজকে আবার কি কথা মাকে বানিয়ে বলব! দুর্ভাবনায় আমার মাথাটা ছিঁড়ে পড়ত—শেষে আর কিছু বানিয়ে বলতেও পারতুম না, আবার সারারাত ঘুমোতেও পারতুম না। সে যে আমার কি যন্ত্রণা! যাক্ বাবা, এক দুশ্চিন্তা ত গেল! জানিস্ ত বেঙ্গু—মা যে আমার বড়·অভিমানিনী ছিল।' —বলিয়াই পঞ্চুখুড়ো হাসিয়া পড়িল, বেঙ্গু তিলি দেখিল, এইবারে এই হাসির সঙ্গে পঞ্চুখুড়োর দুই গাল বাহিয়া টপ্-টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল।

দৃষ্টিকোণ

আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম; স্কুলের যে-কয়জন শিক্ষক ছিলেন তাঁহারা খানিকটা যেন ষড়্‌যন্ত্রমূলক নীতি লইয়া নিজেদের আপোষে দুই দলে ভাগ করিয়া লইতেন, একটি হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ের দলে, অপরটি মৌলবী সাহেবের দলে। তারপরে উভয় দলই উভয়ের নিকটে উভয়ের কথা লাগাইয়া পড়াইয়া হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় এবং মৌলবী সাহেবকে কেবল উস্কাইতে থাকিতেন। ঠিক কাহার দলে যে কে ছিলেন তাঁহার কোনও স্থিরতা ছিল না, যেদিন যিনি যাঁহাকে উস্কাইবার সুযোগ-সুবিধা বেশি মনে করিতেন সেদিন তিনি সানন্দে এবং সাগ্রহে তাঁহার দলে ভিড়িয়া যাইতেন। এই উস্কানির ফল প্রকাশ পাইত স্কুল ছুটির পরে; দেখিতাম স্কুলের মাঠের এক কোণে নামাবলী-গায়ে দীর্ঘ-টিকি মাথায় পণ্ডিত মহাশয়কে সামনে রাখিয়া ঘাসের উপরে বসিয়া গিয়াছেন এক দল—আর কোট-পাজামা-পরা ফেজ-মাথায় মৌলবী সাহেবকে সামনে রাখিয়া অপর দল। এ-জাতীয় বিতর্ক-অধিবেশনগুলি শিক্ষক-মহাশয়েরা সঙ্ঘটিত করিয়া তুলিতেন সাধারণতঃ কোনও হাটবারে। স্কুলের পাশেই সরকারী খাল, তাহারই ঠিক ওপারে গ্রামের হাট; হাট বসিত দুই দিন, সোমবারে এবং বৃহস্পতিবারে—শিক্ষক মহাশয়েরা সাধারণতঃ স্কুলের পর হাট করিয়া সন্ধ্যায় একেবারে বাড়ি ফিরিতেন। স্কুল ছুটি হইত চারিটায়—হাট মিলিতে মিলিতে পাঁচটা; সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই ফাঁকটুকু মজার আমেজে ভরিয়া তুলবার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়াই এই বিতর্কের সঙ্ঘটনা।

যে-প্রসঙ্গে ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি সে-প্রসঙ্গে মুখ্য লক্ষণীয় বস্তু হইল এই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মৌলবী সাহেবের এই-জাতীয়

বিতর্ক কোনও দিনই কোনও সিদ্ধান্ত বা সমন্বয়ে পৌঁছিত না, পৌঁছিবার কথাও নহে। তাহার কারণ, বিতর্কের প্রথমে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া রাখিতেন যে হিন্দুধর্মই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মৌলবী সাহেব পাল্‌টা বলিয়া রাখিতেন যে মুসলমান ধর্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; তাহার পরে যখন উভয়েরই আত্মমত সমর্থনে বা পরমত নিরসনে কথা বলিবার সময় আসিত তখন কেহই কাহাকেও আশ-পাশের কোনও কথা বলিতে দিতে রাজি হইতেন না। দেখিতাম, আশপাশের কথা না বলিয়া কেহই মূল বক্তব্যে আসিয়া পৌঁছাইতে পারিতেন না, আর আশপাশের কথা কেহ তুলিলেই অন্যে তাহা অবান্তর বলিয়া শুনিতেই চাহিতেন না। ফলে উভয়েই পরস্পরের প্রতি ঘণ্টাখানেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক বাক্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত হইতেন—নির্দ্বন্দ্ব হইতে তাহাদিগকে কখনই দেখি নাই।

আজিকার দিনেও যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতামতের বিতর্ক দেখিতে পাই তখন সেই পণ্ডিতমহাশয় এবং মৌলবী সাহেবের মতদ্বৈধের কথাই অনেক সময় স্মরণ করিতে হয়। অর্থনৈতিক এবং তৎসহচরীকৃত রাজনৈতিক চেতনাই আজকাল আমাদের ভিতরে আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভ করিলেও এবং রাজনৈতিক বিরোধই সাধারণতঃ জমকালো হইয়া উঠিলেও, বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে, সাহিত্য এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের মতবিরোধ কম নহে, আদর্শের বৈষম্যজনিত বিতর্ক প্রায়ই দেখা যায়। বিরোধ-বিতর্ক অশ্রদ্ধার নহে, অকল্যাণেরও নহে; দ্বন্দ্বের দুই পদবিক্ষেপের ভিতর দিয়াই যে সমন্বয়রূপে অগ্রগতি—আমাদের বাইরের ইতিহাসেও—আমাদের অন্তর্জীবনেও, এ-কথাটা আজকাল প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাইতেছি, আমাদের মতদ্বন্দ্ব আমাদের মনকে কোনও সমন্বয়ের দিকে আগাইয়া দিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ আমাদিগকে এমন দুইটি সমান্তরাল রেখাপথে ঠেলিয়া দিতেছে, যেখানে

আমরা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চলার গর্জন নিক্ষেপ করিয়া কোনও দিন না-মিলিবার যাত্রাতেই মত্ত হইয়া উঠিতেছি।

সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে বহু মতদ্বৈধের কথা অবগত আছি। বাজারের কোলাহল যেমন সবই লেন-দেন হিসাব-নিকাশের বোঝা-পড়ার জন্য নহে, তদতিরিক্ত অনেকখানি থাকে বিশুদ্ধ কোলাহল—অর্থাৎ কোনও একটা কিছুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া কোলাহলের আনন্দেই কোলাহল, আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনেকখানি কোলাহল সেই-জাতীয়। কেনা-বেচা বিশেষ কিছু না করিলেও বাজারে আসিয়াছি এই সত্যটুকু অনুভব করিতেও যেমন কিছুটা পরিমাণ কোলাহলের দরকার, জীবনের অন্য পাঁচ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বা সেই পাঁচ ক্ষেত্রের অধিকন্তু সাহিত্যের জগতে যে প্রবেশ করিলাম এই সত্যটি অনুভব করিবার জন্যও আমাদের কিছুটা পরিমাণ তর্ককোলাহলের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু সত্যকারের মতান্তর এবং বিতর্কের অবকাশও রহিয়াছে অনেক। আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই যে মতান্তর, তাহার পরিণতি দেখিয়াছি একটা অবাঞ্ছিত ব্যবধানে সেই ব্যবধানের দুই পারে আমরা এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছি যেন—'দু'জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়।' সাম্প্রতিক বাঙলা-সাহিত্যের কবিতার ধারা যদি কেহও লক্ষ্য করিয়া থাকেন তবে দেখিতে পাইবেন, ব্যবধানের দুই পারে সত্য সত্যই যেন শিবির রচনা হইয়াছে—তাহার ভিতর হইতে একদল অপরদলকে ডাকিয়া গাল পাড়িতেছেন, কাব্যিক, রোম্যাণ্টিক, রাবীন্দ্রিক, পলাতক, ভাবাতুর, বুর্জোয়া বলিয়া; অপর দল অর্ধ-নিমীলিতনেত্রে বলিতেছেন,—কৃপাস্পদ, বালখিল্য, উদ্‌ভ্রান্ত, কামবৈকৃত, প্রচারপত্রসেবী! অবশ্য শিবির ঠিক স্পষ্টভাবে দুইটি নয়, শিবির একাধিক এবং সকলেই যে স্পষ্টতঃ একশিবিরনিষ্ঠ তাহাও নয়, অনেকেরই আবার একাধিক শিবিরে

গমনাগমন রহিয়াছে। কিন্তু সৌখীন কবিদের ছাড়িয়া দিলে, যাঁহাদের কবিকৃতির পিছনে খানিকটা অন্ততঃ আদর্শনিষ্ঠা রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি, একদল রবীন্দ্রপন্থী, আর একদল মার্ক্সপন্থী। রবীন্দ্রপন্থী কথাটিকে একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে; রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান যুগের ভারতীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠ ধারক বলিয়া মনে করি, সুতরাং রবীন্দ্রপন্থী শব্দের অর্থ শুধুমাত্র ভাববাদী রোম্যাণ্টিক নয়, ভারতীয় ভাববাদে বিশ্বাসীও বটে। এই যে পরস্পরবিরোধী ভাবধারা বা বিশ্বাস লইয়া প্রায় পরস্পরবিরোধী আঙ্গিকের (পরস্পরবিরোধী আঙ্গিক বলিতেছি এইজন্য যে, বর্তমানে কাব্য-কবিতায় যে-সকল আঙ্গিক ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সবটা না হইলেও অন্ততঃ কিছুটা একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া-জাত) অবলম্বনে বিভিন্ন রকমের কবিতা লেখা হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকেই বিচিত্র তর্কের সোরগোল শোনা যায়—একেরটা কেন যথার্থ কবিতা, আর অপরেরটা কেন যে শুধু কবিতা নয় তাহাই নয়,—কেন একেবারে কিছুই নয়! তর্ক জিনিসটা আসলে সহজাত আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিরই একটি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। বাঘের ডোরা ডোরা অস্তিত্বকে গায়-কুশলে বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে মাঝে মাঝেই শুভ্র নখরদন্তের বিস্তার করিতে হয়; আমাদের মনোময় সত্তাতেও অনেকেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ডোরা আছে, সেই মনোময় অস্তিত্বকে রক্ষা করিতেও আমাদিগকে চারিদিক হইতে মনোময় নখদন্তের বিস্তার করিতে হয়, তাহাই আমাদের তর্ক।

আমরা যাহা কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করি তাহার পক্ষ সমর্থনে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বা সাধারণ শিল্পের কতগুলি থিওরি সৃষ্টি করিয়া লই অথবা যে-সব থিওরি পূর্ব হইতে সৃষ্টি করা আছে সেই সব থিওরিকে সুযোগ-সুবিধামত কাজে লাগাইতে চেষ্টা করি। সাহিত্যিক বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজনে অনেকেই আমরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে নৈষ্টিক

হইবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ কোনও সাহিত্যিক সৃষ্টির মূল্য-নিরূপণে আমরা আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে সাহিত্যের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে দিতে নারাজ; সুতরাং এ-সকল বিষয়ে সেই পূর্বোক্ত পণ্ডিত মহাশয় বা মৌলবী সাহেবের মতন কোনও আশ-পাশের কথা শুনিতে আমাদের বিষম আপত্তি, সাহিত্যবোধ বা সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পবোধের দৃঢ় খোঁটায় মনকে বাঁধিয়া লইয়া তবে যাহা হোক কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের এই চেষ্টা সব সময়ই আমার নিকটে একটা ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যবোধ বা শিল্পবোধ কোনও মৌলিক বোধ নহে, মৌলিক বোধ আমাদের জীবনবোধ—সেইখান হইতেই সব কিছু উৎসারিত। মানুষের সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ এমন কি মানুষের ধর্মবোধও মূলতঃ এই জীবনবোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জীবনবোধই জীবনদর্শন, এই জীবনদর্শনই হইল মানুষের সর্বদর্শনের মূলে। মানুষের এই জীবনবোধ কোনও স্থাণু পদার্থ নহে, তাহার আবর্তন-প্রবাহে সে নিজের কেন্দ্রস্থলে একটি বোধকে আপনা হইতেই গড়িয়া লয়, তাহা হইলে আমাদের শ্রেয়োবোধ। এই শ্রেয়োবোধ-কেন্দ্রিক জীবনবোধই ঝলকে ঝলকে নিজেকে ছড়াইয়া দিতে থাকে সমাজবোধ, শিল্পবোধ, সাহিত্যবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, নীতিবোধ, ধর্মবোধ প্রভৃতি রূপে। জীবনের ক্ষেত্রে অতি অল্প লোকই এই সর্ববিধ বোধকে একটি সুসঙ্গতির ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ দেন,—প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষের একটি বিশেষ বোধ সহজাত কারণেই অথবা পরিবেশ বা অনুশীলন-পার্থক্যে সমগ্র জীবনবোধকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; ফলে কেহ বা হয়ত সব ছাড়িয়া কবি, কেহ বা সব ছাড়িয়া কর্মী, কেহ বা সব ছাড়িয়া চিন্তাপরায়ণ দার্শনিক, কেহ বা সব ছাড়িয়া মোক্ষ-পরায়ণ ধার্মিক। একদিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের

মধ্যে কাব্য, কর্ম, দর্শন, ধর্ম সবই একটা সুসঙ্গতিতে তাঁহার গভীর জীবনবোধকে অবিরোধে অভিব্যক্ত করিয়াছে, আবার একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখিব—তিনি সব ছাড়িয়া কবি—আর তাঁহার সেই কবিত্ব তাঁহার সমগ্র জীবনবোধেরই অখণ্ড প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিত্বকে ভাল করিয়া বুঝিব, অথচ সেই কবিত্বের আশপাশের কথা কিছুই বুঝিব না, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বা জীবনবোধের কোনও কিছুই বুঝিব না,—ইহা কখনও সম্ভব হয় না। রবীন্দ্র-কাব্যের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বিচার করিব—এই কথাটাই আমার কেমন বেসুরা বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ তাঁহার জীবনাদর্শ হইতে কিছুই পৃথক্ নয়; আবার সত্যিকারের যিনি মার্ক্সপন্থী কবি তাঁহার শিল্পাদর্শ মার্ক্সপন্থী জীবনাদর্শের উপরে গ্রথিত হইতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ বা জীবন-দর্শনে বিশ্বাস করিব, অথচ আধুনিকতার নাম করিয়া মার্ক্সপন্থী শিল্প রচনা করিব, ইহা সম্ভবই নয়; আবার মার্ক্সের জীবন-দর্শনে বিশ্বাস করিব, কিন্তু শাশ্বত সাহিত্যের কোনও স্বরূপের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে গিয়া রাবীন্দ্রিক ঢঙে সাহিত্য রচনা করিব, তাহাও অসম্ভব। সুতরাং এখানে সাহিত্যতত্ত্ব লইয়া রাশীকৃত নৈয়ায়িক তর্কের কোনও অর্থই হয় না। যিনি বিশ্বাস করেন বিশ্বের সব কিছুরই পশ্চাতে রহিয়াছে একটি আত্মপ্রকাশশীল স্বপ্নালু মন,—যিনি আবার প্রতিফলিত আমাদের সমগ্র জীবনজোড়া ব্যক্তিত্বের বিশেষ কেন্দ্রে, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সকল হওয়া ও করার অন্তর্যামীরূপে,—তাঁহার সকল জীবনবোধ কেন্দ্রে যে শ্রেয়োবোধকে গড়িয়া তুলিবে তাহা সেই এককে লইয়াই—সুতরাং তিনি তাঁহার যত শিল্পসৃষ্টিরূপ 'জীবন-পোড়ান হোম-অনল, প্রজ্বলিত করিবেন তাহা সেই একের আহুতিতেই সার্থক করিতে চাহিবেন, ইহাই ত একান্ত স্বাভাবিক। অন্তর্মুখীনতাই ত একের সাধনার পন্থা; সুতরাং এই

জাতীয় কবির মন বাহিরে বিচরণ করিতে করিতেই যে ক্ষণে ক্ষণে অন্তরে তন্ময়তা লাভ করিবে, কাব্য-থিওরির দ্বারা আমরা তাহার ব্যাঘাত ঘটাইব কি করিয়া? আবার যিনি সত্য সত্যই মন-প্রাণে জড়বাদী—অনিত্যবাদী—বৃহৎ মানবসমাজ এবং তাহার দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির ধারাকে অবলম্বন করিয়া যাঁহার জীবনবোধের কেন্দ্রে গড়িয়া উঠিয়াছে এক শ্রেয়োবোধ, বিশুদ্ধশিল্পবাদের জালে বাঁধিয়া তাঁহাকে টানিয়া ঠেলিয়া 'গন্ধর্বরষ্ঠ' করিয়া তুলিবার চেষ্টায় লাভ আছে কিছু? জগৎকে এবং জীবনকে সাহিত্যক্ষেত্রের বাহিরে আশেপাশে এক রকম করিয়া দেখিব—আর সাহিত্যক্ষেত্রের ভিতরে তাহাকে আইন-দুরস্ত করিয়া আর এক রকম করিয়া দেখিব—ইহা কখন সঙ্গতও নয়, সম্ভবও নয়। নৈষ্ঠিকতার তাগিদে যিনি যতখানি এই চেষ্টা করিতে যাইবেন তিনি অনিবার্যরূপে ততখানি ব্যভিচারী হইয়া উঠিবেন, ব্যভিচার দেখা দিবে প্রাণ ও প্রথার দ্বন্দ্বে।

সাহিত্যের কথা অবশ্য প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িল, উহা আমার মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে, মুখ্য বিষয় হইল ঐ পণ্ডিত-মৌলবী মনোবৃত্তির কথা। সাহিত্য হইতে ফিরিয়া প্রসঙ্গান্তরে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। আধুনিককালে সুযোগ-সুবিধা মত গান্ধীবাদের দুই-চারিটি কথা কাজে লাগাইয়া দিবার একদিকে যেমন একটা উৎসাহ দেখা যাইতেছে, আবার অন্যদিকে প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে গান্ধীবাদের দুই-চারিটি কথা টানিয়া আনিয়া সে সম্বন্ধে দু'পাঁচটি কড়া কথা শুনাইয়া দিবার লোভও অনেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। আগে অবশ্য খুব কথা শুনিতাম গান্ধীজীর চরকাবাদের বিরুদ্ধে। এখন চরকা আপনা-আপনই অনেকখানি মাচায় উঠিয়াছে—গর্জনকারী সিংহেরাও তাই যেন আবার খাঁচায় ফিরিয়াছেন। কিন্তু সমালোচনা পূর্বে যত শুনিতাম অধিকাংশই হইল চরকার সহিত বিংশ শতাব্দীর

কল-মিলের তুলনায়। এইখানেই আমার মৌলিক আপত্তি। প্রথমতঃ গান্ধীবাদিগণের নিকটে চরকার মূল্য শুধুমাত্র একটা উৎপাদনকারী যন্ত্র হিসাবে নয়, ইহার মূল্য গান্ধীবাদের একটা প্রতীকরূপে। কিন্তু সে প্রতীকধর্মের কথা ছাড়িয়াই দিতেছি। চরকার যে অর্থনৈতিক দিক রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধেই কথা বলিতেছি। কিন্তু তাহাই বা বলিবার উপায় কি? পরিচ্ছন্ন চিন্তাভিমানীর দল ইতিপূর্বেই তাঁহাদের সাবধানী তর্জনী ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া বলিতেছেন, খবরদার—ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাহিতে পারিবে না,—অর্থনীতির কথা বলিতে গিয়া আশপাশের রাশীকৃত অবান্তর কথার অবতারণা করিবে না যেন। কিন্তু এদিকে আমার আবার নির্ঘাত বিশ্বাস, শিবের গীত না গাহিয়া ধান যে মোটে ভানাই যায় না। বিশুদ্ধ অর্থনীতি বলিয়া দুনিয়ায় কোনও বস্তু আছে বলিয়াই যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। জীবন-নীতিই শিবের গীতি; তাহা না গাহিয়া অর্থ-নীতির ধান ভানিব কিরূপে? সোনারূপায় নির্মিত মুদ্রা বা কারেন্সি নোটের মূল্যতঃ কোনও নিরপেক্ষ মূল্য নয়, জীবনের মূল মূল্যবোধেরই একটা দ্রব্যাত্মক প্রকাশ অর্থনীতির অর্থে। এইজন্যই গান্ধীবাদের জীবনবোধের সব আশ-পাশের কথা না বলিয়া চরকার অর্থ কিছুতেই বোঝান যায় না। এই আশ-পাশের কথা সব যোগ করিলেই দেখিতে পাইব, কল-মিল যে জীবন-দর্শনের সহিত যুক্ত চরকা আদৌ সেই জীবন-দর্শনের সঙ্গেই যুক্ত নয়; চরকা যে জীবন-দর্শনের প্রতীক, কল-মিল তাহার ঠিক বিপরীত জীবন-দর্শনের প্রতীক; সুতরাং চরকা ও কল-মিলের ভিতরে কোনও তুলনামূলক বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। মনুষ্য-সমাজের সম্বন্ধে যে-কল্যাণের আদর্শ মনে রাখিয়া এবং সেই কল্যাণলাভের যে-পন্থায় বিশ্বাসী হইয়া আমরা কল-মিলকে আশ্রয় করি, গান্ধীবাদ তাহাকে চরম কল্যাণ বলিয়া বিশ্বাস করে না; সেই অকল্যাণের পথ হইতে চরকা মানুষকে যথার্থ কল্যাণের পথে ফিরাইয়া

আসিবে ইহাই গান্ধীবাদের বিশ্বাস। এ-ক্ষেত্রে যদি আঘাত করিতে হয় তবে সমগ্র গান্ধীবাদকেই আঘাত করিতে হইবে, চরকাবাদকে আঘাত করিবার কোনও অর্থ হয় না।

চরকার কথা বলিতে একটি বন্ধুর কথা মনে পড়িয়া গেল। সব লোকেরই যেমন বাহিরে না হইলেও ভিতরে একটা বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন থাকে যে দুনিয়ায় একটি লোক খালি 'প্র্যাকৃটিক্যাল'—এবং সে লোকটি 'আমি' —আমার বন্ধুরও শুধু সেই প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস নয়, একেবারে প্রকট রোগ ছিল। তাঁহার মতে, দুনিয়ার আর সব মানুষই কিঞ্চিদধিক 'ইম্‌প্রাক্‌টিক্যাল্'—তবে এই দোষের চরম নিদর্শনরূপে যে মানুষটিকে বিধাতা-পুরুষ ধরাতলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন তিনি হইলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অবশ্য চরকা প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল, এবং স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের বৃহৎকল্যাণের আদর্শে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। তিনি একটি সজোর মুষ্ট্যাঘাতে বলিলেন, "আজগুবি ভায়া, সব আজগুবি। এই ধর, তোমাকে ভদ্রসমাজে বেরতে হবে, তোমার স্বাভাবিকই ইচ্ছা হবে একটি গিলেকরা জামা গায় দিয়ে বেরও; তোমার গান্ধীজীর মতে তোমাকে তা হ'লে কি করতে হয়? নিজে জামাটিকে ধোপদুরস্ত ক'রে কাচ (তোমার গান্ধীজী আবার সাবান ব্যবহার করতে দেবেন ত, না আবার ক্ষার তৈরী ক'রে নিতে হ'বে?) তারপরে সারাদিন বসে তাকে গিলে কর, তারপরে বেরও; তবেই হয়েছে,—দিন তোমার এই জামা তৈরীতেই চ'লে যাবে, বেরতে আর হবে না।" বলিয়াই তিনি তাঁহার অকাট্য যুক্তির সারবত্তায় বেশখানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। গান্ধীজীত শুধু নিজের কাপড়, জামা নিজে কাচিয়া পরিতে বলেন নাই, সম্ভব হইলে নিজের কাপড়, জামা নিজে তৈয়ার করিয়াও লইতে বলিয়াছেন, ততদূর পর্য্যন্ত শুনিলে বন্ধুবর কি করিতেন জানি না। আমি তর্কে বিরত হইয়া প্রসঙ্গ

পরিবর্তন করিয়া লইলাম; কারণ গান্ধীবাদ এবং ফিন্‌ফিনে আদ্দির গিলে করা'-বাদ এই দুইটিই যে মূলে পরস্পর-বিরোধী এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার আগে অন্য পাঁচকরমের তর্ক করিয়া ত কোনও লাভ নাই। যাঁহাকে যথা-সম্ভব সাবলম্বী হইতে হইবে তাঁহাকে যথা-সম্ভব আড়ম্বরবর্জিত হইয়া দৈনন্দিন অভাবও অনেক কমাইয়া আনিতে হইবে, আর এই অভাবগুলি যথা-সম্ভব কমাইয়া ফেলিতে হইলেই তাঁহাকে তাঁহার জীবন-যাত্রাকেও যে অনেকখানিই বদলাইয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু উপরিউক্ত বন্ধুটির কথা ছাড়িয়াই দিতেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধীজীর চরকা-খদ্দরের বিরুদ্ধে নানা সময়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ্য যুক্তি ছিল চরকা-খদ্দর মানুষের সৌন্দর্যবোধেরই পরিপন্থী। এখানেও যে মতান্তর তাহাও আসলে একটি মৌলিক মতান্তর; আসলে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর মধ্যে মানস-প্রবণতার মোটামুটি কতকগুলি মিল থাকিলেও এবং উভয়েই উভয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকিলেও, তাঁহাদের মৌলিক জীবন-দর্শনের ভিতরে মস্তবড় ব্যবধান ছিল; জীবনদর্শনের ব্যবধানের ফলে উভয়ের সৌন্দর্যবোধও পৃথক ছিল। গান্ধীজী চরকা-খদ্দরকে মানুষের সৌন্দর্যবোধের পরিপন্থী জানিয়া শুধুমাত্র আর্থিক বা সামাজিক বা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য কোনওরূপে গলাধঃকরণ করিতে বলেন নাই; তাঁহার যাহা জীবন দর্শন সেই মতে চরকা-খদ্দর মানুষের সৌখীন সৌন্দর্যবোধকে না হইলেও বৃহত্তর সৌষমার উপরে প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যবোধকে বিকশিত করিয়া তোলে।

বৈদিক যাগ-যজ্ঞকে আমরা যেমন জীবনে সুপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি, চরকার সূত্র-যজ্ঞকে আমরা প্রায় সেই পর্য্যায়েই আনিয়া ফেলিতে পারিয়াছি, সুতরাং বিবাদ প্রায় আপনা

হইতেই নিভিয়া আসিয়াছে। একটু সক্রিয় ছিল মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ; সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ কিছু কিছু কড়া মন্তব্য শুনাইয়া দিতেছেন। একজন বলিয়াছেন যে, মহাত্মাজীর পরিকল্পিত এই বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরোধী, ইহা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বরঞ্চ পিছাইয়া দিবে। যে যে প্রসঙ্গে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার দোষ দেখাইয়াছেন তাহার সব প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া আমরা শুধু তাঁহার মূল দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি। তিনি যে কথা বলিয়াছেন সে-সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে তাঁহাকে গান্ধীজী প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটা পশ্চাদপসরণ-মূলক ব্যবস্থা না বলিয়া বলা উচিত ছিল যে গান্ধীবাদই হইল একটা পশ্চাদপসরণ-মূলক আদর্শ। কারণ গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনা তাঁহার জীবন-পরিকল্পনারই অঙ্গীভূত, একটিকে বাদ দিয়া আর একটিকে দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের তরফ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে চালু করিবার এখানে সেখানে যেটুকু চেষ্টা চলিতেছে তাহার ভিতরে একটা অসঙ্গতি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। কারণ গান্ধীজী যে জীবনবাদের উপরে বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন আমরা সে জীবনবাদে আস্থাসম্পন্ন নহি; তিনি যে বাস্তব-জীবনপদ্ধতির সহিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে মিলাইয়া লইতে বলিয়াছিলেন সেই জীবনপদ্ধতির সহিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে মিলাইয়া লইতে আমরা নারাজ; যে কেন্দ্রীভূত নাগরিক যান্ত্রিক সভ্যতা এবং জীবন যাত্রার তিনি বিরোধী ছিলেন সেই সভ্যতারই অঙ্গে আমরা যদি এখানে সেখানে একটু একটু বুনিয়াদী শিক্ষার রঙ ঝালাইয়া দিতে চাই তবে তাহার অসঙ্গতি ত চোখে আঘাত করিবেই।

আসলে শিক্ষাবিদ্ রূপে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার যাঁহারা সমালোচনা করেন শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা এবং গান্ধীজীর ধারণা

এক নহে। আমাদের কেন্দ্রাভিমুখ নাগরিক জীবনকে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া স্কুল-কলেজে পুঁথি-পত্রকে প্রধান উপজীব্য করিয়া যে শিক্ষার ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে গান্ধীজী তাহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার আদর্শ হইল, একটি মানুষের দেহে ও মনে যে শক্তি-সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহার সম্যক স্ফুরণে সাহায্য করিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভালভাবে উপযুক্ত করিয়া তোলা। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, গান্ধীবাদ কেন্দ্রীকরণের বিরোধী; যান্ত্রিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর কেন্দ্রীকরণের ফলে গ্রামগুলি শুকাইয়া গিয়া শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে। সমগ্র দেশবাসীর দেহমনের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইলে এই একমুখীন যাত্রার গতি ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং গ্রামীণ সভ্যতার উপরেই আমাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। আমরা যখন শিক্ষার কথা ভাবিব, তখন সমাজের উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় লোকের দেহমনের চাকচক্যের কথাই ভাবিব না, আমাদিগকে ভারতবর্ষের প্রায় সাতলক্ষ গ্রামবাসীদের কথাই মুখ্যতঃ ভাবিতে হইবে। আমাদের জাতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে এই সাতলক্ষ গ্রামের অধিবাসিগণ প্রত্যেকে কি করিয়া দেহমনের সম্যক অনুশীলনের দ্বারা একটি আত্মনির্ভরশীল তাজা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে সেই কথা ভাবিতে হইবে; গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দেশের এই কোটি কোটি শিশু-যুবককে মনে রাখিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের অন্যান্য শিক্ষাবিদ্ যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহারা মাঝে মাঝে এ-কথা সে-কথা কিছু কিছু বলিলেও বেশ বোঝা যায় তাঁহাদের মোটামুটি লক্ষ্য এবং চেষ্টা হইতেছে মানুষ গড়িবার বিরাট বিরাট যে কলগুলি দেশে ইতিমধ্যে চালু হইয়া গিয়াছে তাহাতে কিছু তৈল নিষিক্ত করিয়া তাহার গতিকে আরও কিছু মসৃণ এবং বেগবান্ করিয়া তোলা যায় কি প্রকারে এবং এই জাতীয় কলের সংখ্যা আরও

কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত করা যায় কি প্রকারে। প্রচলিত এই মূল দৃষ্টির পরিবর্তন না ঘটিলে পদে পদে বিরোধ ত অপরিহার্য। একই নিঃশ্বাসে কলিকতা বা বোম্বাইকে কি করিয়া রাতারাতি নিউইয়র্ক বা ওয়াসিংটনে পরিবর্তিত করিব এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে আবার বাপুজীর চরকা, বুনিয়াদী শিক্ষা এবং রামধুন গানকেও কি করিয়া বেমালুম চালাইয়া দিব, এই দুই বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়াইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন ?

আমি গান্ধীবাদের পক্ষে কোনও ওকালতি করিতে বসি নাই, বাদান্তরের নিন্দাও কাম্য নহে। যে কথা মুখ্য বক্তব্য তাহা গল্পচ্ছলে প্রারম্ভেই বলিয়াছি, ঐ পণ্ডিতি-মৌলভী মনোবৃত্তির পরিবর্তন। সত্যকারের মত যখনই যাহা কিছু প্রচারিত হইয়াছে তখন সেই মত ভূঁইফোঁড় হইয়া কখনও দেখা দেয় না, তাহার আশ-পাশে থাকে জীবন সম্বন্ধে সত্যদৃষ্টির একটি বিরাট পরিমণ্ডল; সেই সমগ্র পরিমণ্ডলেরই যদি পরিপোষণ বা বিরোধিতা করিয়া তাহাকে গ্রহণ বা বর্জন করি তবে আমরা বলিষ্ঠতার পরিচয় দিব; তাহা না করিয়া সেই বিরাট পরিমণ্ডলের এখানকার সেখানকার একটু রঙ-রেখা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিচারই করিব।

আমাদের ধর্ম ও জাতীয় চরিত্র

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাই, বাঙলাদেশে ধর্মের যেন একটা পুনরুজ্জীবন দেখা যাইতেছে। আমরাও লক্ষ্য করিতেছি, আমাদের ভিতরে অনেক সাধু-মহাত্মার আবির্ভাব ঘটিতেছে, অনেক মন্দির-আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছে, বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান এবং উৎসব-আনন্দও বাড়িয়াই চলিতেছে। নূতন যে সব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিতেছে আমরা তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই যে নূতন ভিড় জমাইয়া তুলিতেছি তাহা নহে, যাঁহাদের তিরোভাব ঘটিয়াছে—তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিকেও আমাদের চিত্তে জাগ্রত এবং জীবন্ত করিয়া তুলিবার নানাভাবে চেষ্টা করিতেছি। আমি এই সকল অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার-প্রভাবান্বিত হইয়া কোনও কথা বলিতেছি না, ইহাদের বিরুদ্ধে কোনও সহজাত বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধাও প্রকাশ করিতেছি না। ব্যক্তিজীবনে এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এবং প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দিলেও সমগ্র জাতীয় জীবনের দিক হইতে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, এ-সকল মঙ্গলকর্মই বটে।

কিন্তু তথাপি মনে কতকগুলি সংশয় এবং জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে। এই যে বাঙলাদেশে বিবিধ ধর্ম-আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন এবং নিত্য নূতন ব্যক্তি এবং প্রেরণার প্রাচুর্য—জাতীয় জীবনে তাহার কি ফল দেখিতে পাইতেছি? যে পর্যন্ত একটি বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি জাতির ভাগ্যবিধাতা ছিল সে-পর্যন্ত যত দোষ এক সার্বিক নন্দঘোষের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেদের পূর্বপুরুষগণের আধ্যাত্মিক জয়গানে মুখর ছিলাম। দায়িত্বভার নিজেদের স্কন্ধে চাপিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তারস্বরে বলিয়া উঠিলাম,—আমাদের চারিদিকে কতকগুলি মারাত্মক অভাব, কল-

কারখানার অভাব, শিল্পের অভাব; কিন্তু সবাই মিলিয়া মন দিলে এবং চেষ্টা করিলে এই সকল অভাব আর কতদিন থাকিতে পারে? বস্তুত এ-সকল জাতীয় জীবনের অভাব সম্পূর্ণ না হইলেও খানিকটা যে ঘুচিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না; তথাপি নিজেরা এ-কথা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছি—এবং প্রকাশ্যে এ-কথা স্বীকার করিতেও আরম্ভ করিয়াছি যে-জাতীয় জীবনে যেমন করিয়া আগাইবার কথা ছিল আমরা তেমন করিয়া আগাইতেছি না, এবং এই জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকরূপে যে জিনিসটির অভাব আমরা এখন সবচেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করিতেছি তাহা হইল আমাদের চরিত্রের অভাব। প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত যাহা দেখিতেছি এবং শুনিতেছি তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিলে বলিতে হয়,—সততা, উদারতা, বিশ্বাস প্রভৃতি শব্দগুলি যেন অশেষ কৃপাযোগ্য কতিপয় ভাল মানুষের জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছিল—যেখানে ভাল মানুষ শব্দের নিখাদ অর্থ হইল বোকা। সংসারের অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, বর্তমান সম্বন্ধে করিতকর্মা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদর্শী সকলের নিকটেই শুনিতে পাইতেছি, আজকালকার দিনে মানুষ হইতে হইলে বেশ একটু চালাক-চতুর হওয়া দরকার, আর এই চালাক-চতুর কথাটির অর্থও বেশ গভীর এবং ব্যাপক; তাহার বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া, মোটামুটিভাবে বলিতে পারি, অপরকে প্রবঞ্চিত করিয়া অপরের স্বার্থহানি করিয়া, অপরের প্রভূত পরিমাণ অকল্যাণের কারণ হইয়াও যদি কেহ নিজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং এই প্রতিষ্ঠার পথে সত্যমিথ্যা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভেদচিহ্নকে অসঙ্কোচে এবং অনায়াসে লুপ্ত করিয়া লইতে পারে তবেই সে জীবনের ক্ষেত্রে বেশ চালাক-চতুর লোক বলিয়া সমাজেও সহজেই একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া বসে। একথা বলা একান্ত বাড়াবাড়ি হইবে যে,

আমাদের মধ্যে এখন আর চরিত্রবান্ লোক নাই, সত্যের মর্যাদা নাই, বিশ্বাস সহানুভূতি প্রভৃতিগুণ নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সততার প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বাস প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় গুণের মহিমা হ্রাস পাইবার একটা ব্যাপক প্রবণতাকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই ত সংশয় জাগিতেছে, জিজ্ঞাসা জাগিতেছে—চারিদিকে যে ধর্মজাগরণের আড়ম্বর দেখিতেছি তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিতেছে ?

ধর্মকে আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে একটা ব্যক্তিগত জিনিষ বলিয়া মনে করি, তবেও আমরা বলিতে পরি, ব্যক্তি-চরিত্রের উন্নয়ন জাতীয় চরিত্রের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবেই। আসলে আমার মনে হইতেছে, আমাদের ধর্মকে আমরা ক্রমে ক্রমে যেন আমাদের চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া লইতেছি। চরিত্র যেন আমাদের ইহজীবনের বাস্তব সমাজঘটিত বস্তু—আর ধর্ম আমাদের বাস্তব জীবনের আওতার বহির্ভূত সম্পূর্ণ একটি আলাদা জীবনের বস্তু। তাই যখন দেখি, একটি লোক সারাদিন কৃষ্ণবাজারের সকলপ্রকার কৃষ্ণকর্ম সাধন করিয়া কৃষ্ণপদে মতি স্থির করিবার জন্য সন্ধ্যায় কোনও 'বাবা' বা 'মা'য়ের পদতলে অসীম প্রপত্তি লইয়া প্রশ্ন করেন,—"কৃষ্ণপদে আমার মতি স্থির হইবার উপায় কি,"—তখন চট্ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হই না—তাঁহাকে ভক্তি বলিয়া অশ্রদ্ধাও করি না ; মনে হয়, আমাদের ধর্মবোধ আমাদের জীবনবোধ হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, এ-জাতীয় একটি প্রশ্ন আমরা অতি সহজেই করিতে পারি।

আমার মনে হয়, আমাদের দেশে ধর্মকে মুখ্যভাবে একটা বস্তুগত সত্যের দৃষ্টিতেই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। আমরা যখনই কোন সাধন-ভজন, জপ-তপ, পুজা-অর্চার কথা ভাবি, তখন একটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই

তাহাদের কতগুলি ফল উৎপন্ন করিবার শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করিয়া লই। নাম জপ করিলে প্রেম হয়, ভক্তি হয়,—ভাব হয়, সমাধি হয়,—অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় বা পরকালে শান্তি-সুখ লাভ হয়; কিন্তু নাম-জপের দ্বারা একটা ব্রহ্ম-চৈতন্য বা বৃহতের চৈতন্য দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি এবং প্রসার লাভ হয় এবং সামগ্রিকভাবে চারিত্রিক উর্ধ্বায়ন সম্ভব হয়, এই কথাটাকে আমরা একান্তভাবে গৌণ করিয়া গ্রহণ করিতেই অভ্যস্ত। আমাদের গ্রাম্য-জীবনের একটি আত্মীয়ার কথা মনে পড়িতেছে,—তিনি একদিক হইতে একটি আদর্শ-ধার্মিকা রমণী ছিলেন; সকাল হইতে তিনি তাঁহার পূজার কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। প্রথমে ফুল তোলা, তারপরে দূর্বা তোলা, বিল্বপত্র সংগ্রহ করা, চন্দন ঘষা, পূজার বাসন-কোসন মার্জন করা—ইত্যাদি ইত্যাদি কাজেই তাঁহার বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত। তারপরে পূজার পালা,—সে কি পূজা! কত আসন, মুদ্রা, ধ্যান-জপ, মন্ত্র-তন্ত্র! এই সব সারিয়া অন্নগ্রহণ করিতে তাঁহার বেলা হেলিয়া যাইত। এসব ব্যাপারে তাঁহার সত্যই কোনও ভণ্ডামি ছিল বলিয়া মনে হয় না,—নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করি নাই তাঁহার কোনও দিনই। কিন্তু অন্তত পূরা দুই যুগকাল এইরূপ পূজা-অর্চায় অতিবাহিত করিবার পরও তিনি পাড়া-প্রতিবেশী কাহারও কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলে পারতপক্ষে কোনও ইষ্ট সাধনের উৎসাহ কোনওদিনই দেখান নাই। তাঁহার অধিকারে অনেক ফলের গাছ ছিল—খাইবার তেমন কেহই ছিল না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাড়ার কোনও ছেলে-মেয়ে তাঁহার কোনও একটি ফল স্পর্শ করিলে তিনি হাতে না পারিলেও তীক্ষ্ণ বচন-বাণের দ্বারা তাহার উর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ এবং নিম্নতন সপ্তপুরুষকে অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িতেন। এই ধর্ম পরকালে গিয়া তাঁহার কি কাজে লাগিবে না লাগিবে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহকালে এই ধর্মের সহিত তাঁহার জীবনের কোনও যোগ ছিল মনে

হয় না। ইহা একটি যান্ত্রিক পদ্ধতির অনুবর্তন মাত্র। বড় হইয়া বাঙালী জীবনের বৃহত্তর অংশের সহিত পরিচিত হইয়া আমার অনেক সময়ই মনে হইয়াছে, বাঙালাদেশের ধর্মের ক্ষেত্রে আমার এই আত্মীয়া একক নহেন, তিনিই যেন আমাদের সাধারণ ধর্ম-সমাজের প্রতিনিধি। কিন্তু আমার এই আত্মীয়া ত নিরক্ষরা গ্রাম্য-মহিলা; একটি প্রসিদ্ধ স্থানের একটি শিক্ষিত সাধুর গল্প শুনিয়াছি; তিনি নাকি তাঁহার ভক্ত-সমাজে বেশ গৌরবের সঙ্গে বসিয়া একদিন একটা অসীম নির্লিপ্তভাব দেখাইয়া বলিতেছিলেন,—"দেখ, আজ পথে আসিবার কালে পথের পাশে একটা রোগা মানুষ দেখিলাম, শ্বাস হইয়া ধুঁকিতেছে; আমার কাছে একটু জল চাহিল, আমার হাতের কমণ্ডলুতে জলও ছিল, কিন্তু আমি দেই নাই; কারণ দেখিলাম, ও ব্যাটা ত আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে জল খাইলেও মরিবে না খাইলেও মরিবে; মাঝখান হইতে আমি আমার কর্ম বাড়াইতে যাই কেন?" গল্পটি শুনিবামাত্র হয়ত একটা হৃদয়হীনতার চরম দৃষ্টান্ত আমাদের মনকে ঘৃণায় উত্তেজিত করিয়া তুলিবে; তথাপি আমাদের দেশে এই জাতীয় একটি সত্যকে আমার সহজভাবেই গ্রহণ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না; কারণ ধর্মকে আমরা আমাদের জীবনের ভাঁড়ার হইতে এমনিভাবে পুঁটুলি বাঁধিয়া ঊর্ধ্বে শিকায় তুলিয়া রাখিতে অভ্যস্ত যে, ধার্মিক হইতে হইলেই যে মানুষ হইতে হইবে, এমন একটা কথাকেও হয়ত আমরা বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করিয়া বসিতে পারি।

কিন্তু আমাদের দেশের যে ধর্মের আদর্শ তাহা বরাবরই এমনতর জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাহা বলিতে পারি না; বরং তাহার বিপরীত কথাই ত সর্বত্র দেখিতে পাই। বৈদিক ঋষিগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তাঁহারা যে বৃহতের সাধনা করিয়াছেন। দৃশ্যমান বিশ্বজীবনের মধ্যেই তাহাকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহারা যে মধুব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতির সত্যে তাঁহাদের দুগ্ধদানকারী গাভীটিকেও মধুমতী করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, সেই বৃহৎ সত্যের দ্বারাই ত জগতের যাহা কিছু সবকে আবাসিত করিয়া লইয়া সেই ব্রহ্মবুদ্ধি বা বৃহৎ-সত্তার অনুভূতি-রূপ ত্যাগের দ্বারাই সকল কিছুকে নির্লোভ হইয়া ভোগ করিতে বলিয়াছেন। ব্রহ্মানুভূতির ফলই ত একটা গভীর অদ্বয়-বোধ,—সমগ্র জীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া দেখা। উপনিষদে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যিনি সর্বভূতকে আত্মার মধ্যে দর্শন করেন এবং সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কখনও কোনও কিছু হইতে সঙ্কুচিত হন না,—কখনও কোনও কিছুকে ঘৃণা করেন না। তারপরে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে আসিয়া ত দেখিতে পাই ধর্ম বাস্তব জীবনের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। মহাভারতে ত ধর্ম কথাটিকে বহুস্থানেই এমন একটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, সেখানে ধর্ম বিশ্বাতীত একটি একক পুরুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ অপেক্ষা মানুষের সহিত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া কম অভিব্যক্ত নহে। গীতার ভিতর দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া—পরম সত্যের সহিত নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া কল্যাণকর কর্মের দ্বারা জীবনের উর্ধ্বায়নের কথাই ত নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন। সর্বভূতহিতে রত থাকা সেখানে ত ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। এই কল্যাণ-কর্ম হইতে নিজেকে সর্বভাবে বিযুক্ত রাখিয়া প্রতিমা-পটের পূজা-অর্চা, ভোগারতি বা নাম-জপের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটাইয়া রাখিবার আদর্শ গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্মতি লাভ করিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

ভারতবর্ষের ধর্ম সর্বত্র ভগবানকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্মের

সহিত পরবর্তী কালে অনেক দেব-দেবীর যোগ ঘটিয়াছে বটে এবং পরবর্তী কালে জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধদেব এবং বোধিসত্ত্বগণ বা জৈনধর্মের তীর্থঙ্করগণ অনেকখানি দেব-দেবতা, এমনকি ভগবানের স্থানও অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু মূলতঃ এই দুইটি ধর্মই ভগবানরূপ বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত কোনও শাশ্বত পরম-পুরুষের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল। আত্মা আছে কি না, ভগবান আছেন কি না এইসব প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব নীরব থাকিতেন। তবে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কিসের উপর? মানুষের জীবনে দুঃখ আছে—তাহার হৃদয়ে অনির্বাণ অগ্নিজালা রহিয়াছে—চিত্তকে সংযত শুদ্ধ শান্ত করিয়া, তাহাকে শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া কি করিয়া নিজে এই দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আর মহাকরুণায় বিগলিত হইয়া বিশ্বমানব—এমন কি বিশ্বজীবের সহিত অদ্বয়যোগে নিজেকে যুক্ত করিয়া বন্ধহীন কল্যাণকর্মের দ্বারা মানুষের জীবনকে—বিশ্বজীবের জীবনকে দুঃখ-মুক্ত করিতে পারা যায়। মহাজান বৌদ্ধধর্ম মতে নির্বাণ মানুষের কাম্য নয়,—যাহারা একক ভাবে নির্বাণের জন্য লোভী, তাঁহারা জীবনের মহৎ আদর্শ হইতে চ্যুত বলিয়া 'হীন'; নির্বাণলাভের উপযোগী হইয়াও নির্বাণকে পরিহার করিয়া অনন্তকাল জীবসমূহের কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া যাওয়া—মোহে-শোকে মুহ্যমান অন্ধকার জগতের বুকে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রজ্ঞালোকে দিকে দিকে ধর্মের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা—ইহাই ত ছিল বোধিসত্ত্বের আদর্শ। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে এই বুদ্ধদেবেরই বা কি গতি ঘটিয়াছে? তিনি যে বলিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি; তিনি যে শীলাচারের ধর্মের কথা বলিয়াছেন, তিনি যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা দ্বারা ব্রহ্ম-বিহারের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সসম্ভ্রমে শাস্ত্রে নিবদ্ধ রাখিয়া দিয়াছি; আর ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে তাঁহার সকল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য কাটিয়া ছাঁটিয়া তাঁহাকে যখন একবার "কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর" করিয়া আমাদের জাতীয় দেব-গারদ মন্দিরের মধ্যে ঢুকাইয়া লইতে পারিলাম, তখন আর আমাদিগকে পায় কে, তখন বিজয়োল্লাসে আমরা "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া জয়ধ্বনি তুলিয়া দিলাম। পৌরুষের শৌর্যবীর্যে মহিমান্বিত এবং মানবীয় গুণে বিভূষিত রামচন্দ্রকে আমরা এমনি করিয়া 'নবদূর্বাদলশ্যাম' করিয়া লইয়াছি; গীতার যোগযুক্তভাবে সর্বভূতহিতকর কর্মের মহিমাখ্যাপনকারী শ্রীকৃষ্ণকে সেই যে 'মদনমোহন' করিয়া একবার মন্দিরে ঢুকাইয়া লইয়াছি, তারপরে তিনি আজ হাজার বছর ধরিয়া বাঁশী বাজান ছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনে তেমন আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালাদেশ যেন আবার বিশেষ করিয়া অবতারদের দেশ; এখানে চোখে পড়িবার মতন যিনিই জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহাকেই সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বা আদ্যেশ্বরী ভগবতী না হইয়া উপায় নাই। এখানে মানুষের কোনও দিন মানুষভাবে বড় হইয়া উঠিবার নিয়ম নাই; সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে আজগুবি গল্পের সাহায্যে মাতৃগর্ভ হইতেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার বানাইয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের আর কিছুতেই সোয়াস্তি নাই। ইহার পিছনে বড় একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাহাকেও মানুষ রাখিয়া বড় করিয়া গ্রহণ করিতে গেলে জীবনে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মহৎকর্মের ভিতর দিয়া নিজেকে এবং জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু তদপেক্ষা আমাদের চিরাচরিত পথে অবতার বানাইয়া কাহাকেও একবার আমাদের সনাতন মন্দিরে যদি ঢুকাইয়া লইতে পারি, তবে ফুল-চন্দন-বিল্বপত্রের নীচে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া সকল হাঙ্গামাই চুকাইয়া দিতে পারি। আমাদের বাঙালী জাতির এই একটি

প্রবল সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষিগণ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁহারা জাতিকে নূতনভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে যখন লেখনী ধারণ করিলেন, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণকে আমরা যদি তাঁহাদের অবতারত্বের আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ পুরুষরূপে জনসমাজের সম্মুখে না ধরিতে পারি, জাতি তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে মহাপ্রেরণা লাভ করিতে পারিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রকে তাই সত্যকার একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষরূপে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, নবীন সেন তাঁহার সকল ভক্তির উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ-রূপেই ভগবান করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' প্রভৃতিও এই প্রেরণা লইয়াই রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্বত্রই দেখিতে পাই, দেবত্বকে মনুষ্যত্বের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে আবিষ্কার করিয়া মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। বর্তমান যুগে কি আমাদের মনে এই মানবতাবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং এইজন্যই কি সেই সনাতন অবতারবাদের দিকে আমরা আবার মরিয়া হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছি? মহৎ-চরিত্রকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিবার যে সক্রিয় দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা প্রাণপণে এড়াইয়া চলিবারই কি এই ফন্দি? মানুষকে জীবনে পূজা করিতে হইলে আমাদের জীবনের শ্রমবহুল এবং কষ্টবহুল কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারাই তাহা করিতে হয়; তাহার চেয়ে ভক্তি-গদগদচিত্তে তাঁহাকে ভগবান করিয়া তুলিতে পারিলে তাঁহার পূজা জিনিসটি অনেক সহজ হইয়া গিয়া আমাদের সকল অস্বস্তিকর দায়িত্বের লাঘব করে; তখন তাঁহার মর্মরমূর্তি বা প্রতিকৃতি গড়িয়া সেখানে ফুল-জল এবং ভোগারতির ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কর্তব্য মিটিয়া যায়। অনেক বাঙালী সন্তানকে লক্ষ্য

করিয়াছি, মাতৃদেবী যখন সশরীরে জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে যে শুধু অবজ্ঞাই করিয়াছেন তাহা নহে, কায়মনোবাক্যের দ্বারা তাঁহার যতখানি কষ্টের কারণ হওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কিছুই কসুর করেন নাই; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পচন্দনে ভূষিত করিয়া ধূপ-দীপের দ্বারা দীপ্ত করিয়া ভোগারতির দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন।

এই অবতারবাদের সহিতই অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত রহিয়াছে আমাদের সর্বনাশা অলৌকিকবাদ। মানুষ তাঁহার ইহলোকের চরিত্রবল, শৌর্যবীর্য, কর্মকুশলতা, মহানুভবতা প্রেম-পবিত্রতা দ্বারা—তাঁহার আজীবন কঠোর সাধনার দ্বারা যতই মহৎ হইয়া উঠুক না কেন, আমরা তাঁহার মহিমা আবিষ্কার করিতে পারি তখন, যখন তাঁহাকে অলৌকিক কাহিনীর পরস্পরবিরোধী রঙ মাখাইয়া এমন করিয়া তুলিতে পারি যে, তাঁহাকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার সাধ্যই না থাকে। অলৌকিকতার ধুস্তুর-বীচির সংযোগ না ঘটিলে আমাদের ধর্মের নেশা আর যেন কিছুতেই জমিয়া উঠে না। ইহাকে জাতিগত চারিত্রিক দুর্বলতা ছাড়া আর কি বলিব? দেশের সকল মহৎ ব্যক্তিগণকেই যদি একেবারে নাথ-সাহিত্যের 'ময়নামতীর গানের হাড়ী-সিদ্ধা' না করিয়া জাতির কাছে তাঁহাদিগকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে না পারি, তবে তাঁহাদিগকে এমনভাবে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই বা আমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? ঘরে ঘরে এইরূপ হাড়ীসিদ্ধার প্রতিকৃতি প্রচার করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে আমাদের কি লাভ হইবে? পরকাল সম্বন্ধে যাঁহারা নিশ্চিত-বিশ্বাসী এবং সেই সম্বন্ধেই যাঁহারা অতিরিক্ত উৎসাহী, তাঁহারা ইহাতে পরমলাভের সম্ভাবনা দেখিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা যাহারা ধর্মের ক্ষেত্রেও ইহকাল্ সম্বন্ধেই বেশী কুতূহলী ইহার ভিতরে আমাদের প্রলোভন কি?

আমাদের ধর্মকে আমরা যেন অতিমাত্রায় পরলোকের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের কর্মকে রাখিয়া দিয়াছি ইহকালের সকল প্রয়োজন এবং লাভ-লোকসানের জন্য, ধর্মকে রাখিয়াছি সম্পূর্ণই ওপারের সম্বলরূপে। ফলে আমাদের কর্মে আর ধর্মে কোথাও মিল হইতে পারিতেছে না ;—এবং এই কারণেই ধর্ম আমাদের জীবনগত নয়। এই কারণেই আমরা জীবনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অন্যায়, ছল, শঠতা, মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও সুযোগ-সুবিধা মত ঠাকুরঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া পূজা-অর্চা, জপ-ধ্যানে মগ্ন হইতে বিশেষ একটা বিরোধ অনুভব করি না। এমন লোকের অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই আছে যিনি কোনও প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই কোনদিন কোনও জ্বালাবোধ করেন নাই, কিন্তু জপ বিষয়ে তাঁহার নিষ্ঠা এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, তাঁহার জপের আসনে অন্য কেহ কোনওদিন ভুলক্রমে বসিয়া থাকিলে তিনি জপকালে সর্বগাত্রে অসহ্য জ্বালা বোধ করিতেন!

কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম কথাটার মূল তাৎপর্য ছিল কি? যাহা সমগ্র জীবনকে নীচে নামিয়া যাইতে দেয় না—উর্ধ্বে বিধৃত করিয়া রাখে—যাহা সর্বপ্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ত ধর্ম। মহৎ-কর্ম এবং মহৎ প্রেরণা দ্বারা নিজেদের চরিত্রকে দৃঢ় বনিয়াদের উপরে স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদিগকে কে ধরিয়া রাখিবে? নিরন্তর ধসিয়া ধসিয়া নীচে নামিতে থাকিব আর কতগুলি ফুস্‌মন্ত্রের দ্বারা হঠাৎ স্বর্গে উঠিয়া পরমাস্থিতি লাভ করিব, এমন অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে কেমন করিয়া বাসা বাঁধিল?

আমাদের শাস্ত্র ধর্মকে সর্বদাই ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ধর্মের সহিত এই ব্রহ্মের যোগ আমার নিকট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা ঈশ্বর-জাতীয় কোনও পরম-পুরুষকেই যে মানিয়া লইতে হইবে এমন কথা নাই, ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা বৃহতের দ্যোতক।

জীবনে যাহা ক্ষুদ্র তাহাই অধর্ম, যাহা বৃহৎ তাহাই ধর্ম। ধর্মের সমস্ত গুহাহিত তত্ত্বের খোঁজ না করিতে গিয়া সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি, যে-কর্ম আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করে—আমাদের সমগ্র জীবনকে বৃহতের পথে চালিত করে—তাহাই আমাদের ধর্ম, যে কর্ম আমাদের চিত্তকে নিত্য ক্ষুদ্রের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া সমগ্র জীবনকে ক্লিষ্ট করিয়া তোলে তাহাই মানুষের অধর্ম। ভগবান রূপ কোনও অধ্যাত্ম-পুরুষ-সত্তায় বিশ্বাস না করিয়াও যদি কেহ কল্যাণপূত কর্মের দ্বারাই জীবনকে বৃহতের মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন তবে তাহাই ধর্ম ; মন্দির-মস্‌জিদ-গীর্জার আড়ালে জীবন যদি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়া থাকে—তবে সারাজীবন অধর্মই হইয়াছে।

আমাদেরই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ ॥

এখানে দেখিতেছি,—এক কথায় যদি ধর্মের মূল তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয় তবে তাহা হইল এই যে, যাহা কিছু নিজের কাছে প্রতিকূল—অন্যের প্রতি সেই আচরণ কখনও করিও না। ধর্মকে এখানে সম্পূর্ণরূপে জীবনগত করিয়া দেখা হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধদেবও যে ধর্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন মূলে তাহার সহিত ভগবানের যোগ নাই, বরঞ্চ মহাকরুণার উপরে ঝোঁক দিয়া তিনি বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রে অনির্বাণ কুশল কর্মের মধ্যে ধর্মকে সার্থক করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইউরোপেরও বহু মনীষীর ধর্মমতের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ধর্মকে ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধজাত কোনও বস্তু না বলিয়া মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধজাত শ্রেয়োবোধের প্রকাশ ও নিরন্তর আত্মত্যাগী কল্যাণ কর্মের আচরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি ধর্মের ক্ষেত্রে সাধন-ভজন, পূজা-অর্চা, জপ-তপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোনও কথাই বলিতেছি না, ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহার কোনওটির বিরুদ্ধেই অশ্রদ্ধাও পোষণ করি না। আমার মুখ্য বক্তব্য এই, ধর্মকে আমারা জীবনগত করিয়া তুলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় চরিত্রের উপর তাহা কোনও প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। আমাদের ব্যবহারিক কর্মজীবন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ধর্মজীবন যেন দুইটি সমান্তরাল রেখাপথে আবর্তিত হইতেছে,—ইহা আমাদের জীবনে কল্যাণের নহে। শুধু তাহাই নয়, এ সংশয়ও আমার মনে দেখা দিয়াছে যে, জীবনের ধর্ম ও কর্মকে এই ভাবে দুইটি সমান্তরাল রেখায় আবর্তিত হইতে দিবার ফলে—এবং আমাদের সহজাত বৃত্তিবলে ধর্মকেই এই উভয়ের মধ্যে বড় করিয়া দেখিবার ফলে আমদের চরিত্রের মহৎ মানবীয় গুণগুলির মূল্যও আমাদের সমাজ-জীবনে হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি—এবং তদুপরি পোশাকী ধর্মের আবরণে মানুষের সাধারণ মানবীয় ধর্মের মূল্য আবৃত হইয়া যাইতেছে। আমাদের উচ্চকোটির মধ্যে আমাদের মানবধর্ম এমন করিয়া আবৃত হইয়া উঠিলেও আমাদের গ্রাম্য নগণ্য অশিক্ষিত চাষা-ভূষার মধ্যে কিন্তু এখনও তাহা সম্পূর্ণ বিরল হইয়া ওঠে নাই। আমি তাহারই দুইটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একবার কলিকাতা হইতে দেশে যাইতেছি; প্রথমে রেল—পরে ষ্টীমারঘাট হইতে আমাদের গ্রাম পাঁচ-ছয় মাইল দূরে—নৌকায় করিয়া যাইতে হয়। স্টীমার স্টেশন ঝাপুরঘাটে পৌঁছিবার কথা ছিল সন্ধ্যার অনেক আগে; কিন্তু পথে এমন ঝড়-তুফান দেখা দিল যে, স্টীমার পৌঁছিল আসিয়া সন্ধ্যার একটু পরে। তখন ঝড়ের দাপট থামিয়া গিয়াছে বটে, তবু ঘনমেঘে আকাশ ভরিয়া আছে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হইতেছে—মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ঝাপ্‌টা আসিতেছে। ঝাপুরঘাট

নামিয়া নৌকাঘাটায় নৌকার খোঁজে গেলাম ; দেখিলাম, এই ঝড়-বাদলে মাঝি-মাল্লারা নৌকা খুলিতে খুব তেমন উৎসাহী নয়,—যাহারা যাইতে রাজি তাহারাও অসম্ভব ভাড়া হাঁকিতেছে। এক পাশে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম একটি বৃদ্ধ মুসলমান মাঝি শিথিল পদবিক্ষেপে আগাইয়া আসিল এবং কম্পিত স্বরে বলিল, —"বাবু, আমার নায়ে যাইবেন ? আমি বুড়া মানুষ, সব পথ নৌকা বাহিয়া যাইতে পারিব না, আট-গণ্ডার পয়সা পাইলে আগরপুরের রাস্তায় তুলিয়া দিতে পারিব।" লোকটির প্রতি আমার দয়া হইল,—আম ভাবিলাম, আমার সঙ্গে যখন মালপত্র কিছুই নাই তখন আগরপুরে পৌছিলে ভাল রাস্তা মিলিবে, দু' মাইল আড়াই মাইল পথ আমি নিজেই পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতে পারিব। আমি বৃদ্ধের নৌকায় উঠিলাম ; আল্লা বিসমিল্লা স্মরণ করিয়া মাঝি নৌকা ছাড়িল। কিন্তু নৌকা ছাড়িলে কি হইবে ?—মাঝি নৌকা আগাইতে প্রায় কিছুই পারিতেছে না। বৈঠা বাহিয়া দশ হাত আগাইলে দমকা হাওয়া আসিয়া আবার পাঁচ হাত পিছাইয়া দেয়। গুড়ি গুড়ি বর্ষা পড়িতেছে—ছেঁড়া-গামছা মাথায় ভিজিয়া ভিজিয়া বৃদ্ধ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—হাতে বৈঠা বার বার শিথিল হইয়া গিয়া নৌকা বানচাল করিয়া দিতেছে। তদুপরি আবার লক্ষ্য করিলাম, নৌকার ছই মোটেই মজবুত নয়, চারিখানি বাঁশের কঞ্চি ভাঁজ করিয়া তাহার সঙ্গে একখানা ছেঁড়া হোগলা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বিষম প্রমাদ গণিলাম। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "বুড়ো, তুমি নৌকা বাইতে পার না, এ রকম রাত্রে তুমি তোমার নৌকায় যাত্রী তুলিয়াছ কেন ?" দেখিলাম, মাঝি খানিকটা অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলাম, নৌকার মধ্যে অনেক জল জমিয়াছে, পাটাতনের মধ্যে ঝপড়্ ঝপড়্ শব্দ হইতেছে। বাঁশের পাটাতন তুলিয়া দেখিলাম, ভাঙা গলুই হইতে গল্ গল্ করিয়া

জল উঠিতেছে। পাটাতনটা ফাঁক করিয়া একটি নারিকেলের বড় মালা দিয়া ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জল সিঁচিতে সিঁচিতে চিৎকার করিয়া উঠিলাম,—"আরে মাঝি—ভাঙা নায়ে ডুবাইয়াই মারিবে নাকি? কেন লইয়া আসিয়াছ তুমি এই নৌকা এমন দুর্দিনে কেরায়া বাইতে?" এইবারে মাঝি বৈঠার টান শিথিল করিয়া এবং নৌকার বেগ স্তিমিত করিয়া দিয়া বলিল, "হ কত্তা, কাজটা ভাল করি নাই; তবে কত্তা—সে একটা দুঃখের কথা।" মাঝির বলার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর মুহূর্তে আমার মন ভিজাইয়া দিল; আমি কণ্ঠের বিরক্তি এবং রুক্ষত্ব পরিহার করিয়া বলিলাম,—"কি দুঃখের কথা মাঝি?" মাঝি ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলিল, "বাবু আশমানে আল্লা একটা আছেন, সবই দেখেন, তাই ঘরে থাকতে পারি নাই।" আমি কুতূহলী হইয়া বলিলাম,—'কি ব্যাপার খুলেই বল না।" সে বলিল,—"বাবু, এ নাও আমার না, আমিও নেয়ে-মাঝি না; ভাঙা নাও—ঘাটে বাঁধা ছিল পড়শী আবদুল্লার, চেয়ে-চিন্তে নিয়ে এসেছি আজ একদিনের জন্য। আমি কত্তা বয়সের কালে ছিলাম হালুটে চাষা, বুড়া মানুষ—এখন কিছুই পারি না। আজ যে না নিয়ে বেরিয়েছি, এর একটা গোপন কথা আছে। কাল আমাদের মুসলমানের ইদ্, গত বছর ঠিক এমনই ইদের আগের দিন, ঘরে ছিল না একটি চা'ল, হাতে ছিল না একটি পয়সা। কি করি, কোনও উপায় না দেখে গুটি গুটি পা বাড়িয়ে গেলাম আকুব মিঞার বাড়ি—গায়-গতরে দিনমজুর খাটে আর দু' পয়সা কামাই করে। চাইলাম একটা টাকা ধার, দেবার তার ইচ্ছা ছিল না, তবু ফেরাতে পারল না আমাকে। বলল চাচা, পূরো একটা দিতে পারব না, তাহলে আমার চলবে না। এই এক টাকার নোট একখানা দিলাম চা'ল কিনে আট গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিও। টাকাটা নিয়ে চা'ল কিনতে গেলাম, গিয়ে দেখি বর্ষাবাদল দেখে আড়ৎদার চা'লের দাম বাড়িয়েছে দেড়গুণ, চ'ালের যা দাম তা'তে আট আনার

চা'লে চলবে না ক'টি প্রাণীর একদিনও। ইদের দিনে কাচ্চা-বাচ্চা আধপেটা থাকবে—এই চিন্তায় পাপ ঢুকল মাথায়; কিনলাম পুরো এক টাকারই চাল। চালের পুঁটুলি বাড়িতে রেখে দিয়ে ভূতের মতন গিয়ে আবার দাঁড়ালাম আকুব মিঞার দাওয়ায়—বললাম, আসতে পথে হারিয়ে গেছে আধুলিটা—অনেক খুঁজেও পেলাম না। শুনে আর রা কাড়ল না আকুব মিঞা—দুনিয়ায় কেউ জানল না কথাটা। তার ছ' মাস পরে পিলে জ্বরে মারা গেছে আকুব মিঞা—ঘরে রেখে গেছে তার কাচ্চা-বাচ্চা। বছর ঘুরে এসেছে—কাল আবার সেই ইদের দিন, তার কাচ্চা-বাচ্চার হাতে যদি ফিরিয়ে দিতে না পারি সেই আট গণ্ডা পয়সা—আল্লা কি তবে আমার উপরে আর দোয়া রাখবে?"—বলিয়া সহসা শিশুর মতন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া পড়িল বৃদ্ধ। শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল আমার সমস্ত দেহ-মন। ধর্মবোধ কতখানি গভীরভাবে বাসা বাঁধিয়া থাকিতে পারে জীবনবোধের মূলে—তাহার এত বড় জীবন্ত দৃষ্টান্ত জীবনে আর ক'টা দেখিয়াছি আজ তাহা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

আর একটা ঘটনা শুনিয়াছি সম্প্রতি এক সভামঞ্চে আমাদের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকটে। বর্ধমানের দিকের একটি চাষী তাহার মেয়ে বিবাহ দিয়াছে, মেয়ে তাহার বরের সহিত থাকে কলিকাতায়। কলিকাতায় জামায়ের হইল কঠিন অসুখ—মেয়েটি লেখা-পড়াও কিছু জানে না, পাড়ার কাহাকেও ধরিয়া বাপের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া দিল,—"বাবা, তোমার জামায়ের খুব অসুখ, আমি তাহার কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না, আমাদের খাওয়াও চলিতেছে না, তুমি এই পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিবে।" চাষী যে-ভাবে চিঠি পাইল প্রায় সেইভাবেই ছুটিল রেল স্টেশনে। স্টেশনে গিয়া দেখে, কলিকাতাগামী গাড়ি দাঁড়াইয়া,

ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। সে আর তাড়াতাড়িতে টিকেট কিনিতে পারিল না, কোনওরূপে দৌড়াইয়া গিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে গাড়ির লোকজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁরে, তুই টিকিট কিনিয়াছিস্ ?" সে বলিল,—"না"। "তবে ক্রু বা গার্ডকে বলিয়াছিস্ ?" সে বলিল—"না"। তখন সবাই বলিল,—"তোর যে তবে অনেক টাকা জরিমানা হইবে।" শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল, গরীব মানুষ—এত জরিমানা সে কোথা হইতে দিবে? গাড়ির সব লোককে সে তাহার কথা খুলিয়া বলিল; সকলেরই শুনিয়া দয়া হইল; তাহারা বলিল,—"তোর কোনও ভয় নাই—আমরা এতগুলি মানুষ আছি, তুই একটা মানুষ—যেমন করিয়া হোক—তোকে আমরা হাওড়া স্টেশনে ব্যবস্থা করিয়া দিব।" সত্য সত্যই তাহারা হাওড়ায় পৌঁছিয়া লোকটাকে একটা কুলী সাজাইয়া তাহার মাথায় কিছু জিনিসপত্র দিয়া ভিড়ের মধ্যে তাহাকে গেটের বাহির করিয়া দিল। সেখান হইতে লোকটি তাহার মেয়ের ঠিকানায় চলিয়া গেল। দিনের বেলা সে যা হোক জামায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে শুইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সারারাত তাহার চোখে কিছুতেই আর ঘুম আসে না। একদিকে তাহার দেহে বস্তির মশকের দংশন, অন্যদিকে তাহার অন্তরে নিরন্তন বিবেকের দংশন; সে শুধু ভাবিতেছে—জীবনে কোনও দিন আমি কাহাকেও ফাঁকি দিলাম না, শেষে বৃদ্ধ বয়সে আমি কোম্পানীকে এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া আসিলাম! এক রাত্রি তাহার এইভাবে অনিদ্রায় কাটে—দুই রাত্রি অনিদ্রায় কাটে—তিন রাত্রি অনিদ্রায় কাটে—কোম্পানীকে ফাঁকি দিবার কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তিন রাত্রি অনিদ্রার পরে তৃতীয় দিন শেষরাত্রে সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখিল, তাহার শিয়রে আসিয়া কে তাহাকে স্বপ্নে বলিতেছে,—তুই কি বোকা, টিকেট কাটিয়া আসিস্ নাই বলিয়া

তোর মনে এত দুঃখ কেন? ফিরিবার সময় দুইখানি টিকেট কাটিস্, একখানা টিকেট বাবুর হাতে দিবি, অপরখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবি।” ঘুম ভাঙিয়া সহসা সে জাগিয়া বসিল—তিনদিন পরে তাহার হৃদয়ের সব ভার নামিয়া গিয়াছে—সে যেন অন্ধকারের মধ্যে পথ পাইয়াছে। সেইদিনই সে হাওড়া স্টেশনে গিয়া দুইখানি টিকেট কাটিল, একখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল, অপরখানি দেখাইয়া সে শান্তমনে বাড়ি চলিয়া গেল।

এই যে মানুষের সহজ ধর্ম তাহাকে কি আমরা হারাইতে বসিয়াছি? দেবতা যদি আমাদের পরমশ্রেয়োবোধের ঘনীভূত মূর্তি হইয়া আমাদের ‘ধী’কে প্রচোদিত না করেন, আমাদের জীবন-চৈতন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া সমগ্র জীবনকে শ্রেয়ের পথে—বৃহতের পথে পরিচালিত না করেন, তবে সেই বরেণ্যভর্গহীন দেবতার উপাসনায় আমাদের কি লাভ হইবে? অতিমানবতাকে কি আমরা মানবতার সিঁড়ি বাদ দিয়াই লাভ করিব—না তাহাকে আস্তে আস্তে মানবতার বিরোধী করিয়া তুলিব। অতিমানবতা যদি মানবতার পরিপূর্তি না হইয়া বিরোধীই হইয়া ওঠে তবে সেই অতিমানবতাকে পরিত্যাগ করিয়া মানবতাকে আশ্রয় করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

আমি

আমার বসিবার ঘরে যখনই বাহির হইতে কোনও লোক আসে তখনই দেখিতে পাই, আমার চারি বৎসরের কন্যাটি আসিয়া আশপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। মাঝে মাঝে সে আমাদের কথার প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের রাশি রাশি কাজের এবং অকাজের কথা দ্বারা পাকে পাকে যে ব্যূহ রচনা করিতে থাকি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার ধৈর্য এবং সামর্থ্য তাহার শিশুমনের থাকে না; তাই কখনো সে তাহার 'ছবি ও ছড়া'র বইতে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করে, কখনও বা তাহার রান্নার সরঞ্জাম লইয়া ঘরের এককোণে স্থান করিয়া লয়, কখনও বা আমার পায়ের কাছে টেবিলের তলে তাহার পুতুলের সংসার জমাইয়া লয়। কিন্তু এটা লক্ষ্য করিয়াছি, যে-ব্যপদেশেই হোক না কেন, সে আমাদের আশেপাশেই থাকিতে চেষ্টা করে। লোকটি বা লোকগণ চলিয়া গেলে সে আমার একান্ত নিকটে আসিয়া আমার কানের চারিপাশটাও যতটা সম্ভব তাহার ছোট্ট দুইখানি হাত দিয়া ঘিরিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিত,—'বাবা ওরা কি বলল?'

আমি বলিতাম,—'পড়ার কথা বলল।'

'পড়ার কথা কি বলল?'

আমি বলিতাম,—'বলল, 'হাসি-খুসি' পড়তে তার খু-উ-ব ভাল লাগে; তার 'ছবিও ছড়া'র বইটার সব ছড়াগুলি তার মুখস্থ হ'য়ে গেছে —এক নিঃশ্বাসে সব শুনিয়ে দিতে পারে; আর তার জানোয়ারদের একটা ছবির বই আছে, তার ভিতরের জলহস্তীটা এমনভাবে হা ক'রে আছে যে দেখলেই ভয় হয় ওর মুখের কাছে একবার হাত দিলে আর রক্ষে নেই, একেবারে হাউম ক'রে গিলে ফেলবে।'

এসব কথা শুনিয়া সে খুশী বটে—একটু একটু হাসেও—কিন্তু খুব যেন মন ওঠে না। আবার জিজ্ঞাসা করে,—'বাবা আর কি বলল ?'

আমি বলিলাম,—'আর বলল কি, সেই ভদ্রলোকের একটি ছোট্ট মেয়ে আছে, সে মেয়েটি কক্‌খনো জামা গায় দিতে চায় না, চুল বাঁধতে চায় না, কক্‌খনো ঘরে থাকতে চায় না ;—খালি গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলো-চুলে সারা দিনে পাড়া ঘুরে বেড়ায়'—

গল্পটির ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারে,—সকৌতুকে বলে,—'তারপর—'

আমি বলিলাম,—'তারপর হ'ল কি, একদিন এই ভদ্রলোক তাঁর সেই মেয়েটিকে নিয়ে অযোধ্যায় বেড়াতে গেলেন'—

এই পর্যন্ত বলিতেই আমার মেয়ে আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, —'ও বুঝেছি, বুঝেছি'—

বস্তুতঃ আমার মেয়েটিকে লইয়া আমিই কিছুদিন পূর্বে অযোধ্যা বড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে বাঁদরের উৎপাতের কথা পূর্বেই অনেক শুনিয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাঁদরেরা মিলিয়াই যে একজন যাত্রীকে একটি দূর তীর্থস্থান হইতে সত্য সত্যই দুইদিনের মধ্যে একেবারে উৎপাতের দ্বারা উৎখাত করিয়া দিতে পারে অযোধ্যা নিজে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত এ-কথাটা এমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অযোধ্যায় গিয়া আমি প্রথমেই আমার মেয়েকে বাঁদরের ভয় দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, সে যেন কলিকাতার ন্যায় এখানেও এলোচুলে ঘুরিয়া না বেড়ায় ; কিন্তু সে আমার কথা অমান্য করিয়া একা একা খোলা ছাতে যাইতেই চারিদিক হইতে কতগুলি বাঁদর আসিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল এবং তন্মধ্যে একটিতে তাহার বগল হইতে জামাটি কাড়িয়া লইয়াছিল এবং অপরটিতে তাহার কাঁধে বসিয়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে কয়েকটি ঝাঁকি দিয়াছিল। অযোধ্যার সহিত তাহার এই

পরাজয় লজ্জা ও অপমানের স্মৃতি জড়িত আছে বলিয়া অযোধ্যার কথা আসিলেই সে আর অগ্রসর হইতে দেয় না—মুখ চাপিয়া ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তর এইখানেই শেষ হইতে পারে না, আবার প্রশ্ন হয়—'বাবা, ওরা আর কি বলল ?'

আমি আরও অনেক প্রসঙ্গের দ্বারা নানা টাল-বাহানা করিয়া শেষে বলি,—'ওরা বলল কি,—বাঃ, এই খুকু মেয়েটিত বড় ভাল !'

শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একগাল হাসিয়া সে লজ্জায় মুখ লুকাইবার জন্য অন্য ঘরে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়।

জানিতাম, এই কথাটির জন্যই তাহার সকল আশপাশে ঘুরিয়া বেড়ান—তাহার প্রশ্নমালা। পিতা ও কন্যার এই অভিনয় অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছে।

একদিন বসিয়া বসিয়া এই কথাগুলিই ভাবিতেছিলাম এবং বেশ মজা দেখিতেছিলাম,—কি করিয়া চারি বৎসরের একটি কন্যার মনে ভরা রহিয়াছে শুধু আত্মাদর !

এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় এক বন্ধু আসিল। একসময়ে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম, আসা-যাওয়াও ছিল, এখন কালে-ভদ্রে দেখা-সাক্ষাৎ। বন্ধু আসিয়া প্রথমেই জানাইয়া দিল, অনেকদিন আমার সঙ্গে দেখা নাই, —দেখার জন্য অনেকদিন হইতেই তাহার প্রাণ কেমন করিতেছিল— কিন্তু শত ইচ্ছা থাকিলেও আসিবার উপায় কি ! তাহার আপিসের কর্তা পকেটভরা মাইনে পাওয়া একটি নিরেট গোবেট—সুতরাং দশটা-পাঁচটার স্থলে দশটা-দশটা তাহার আপিস না করিলে আপিসের গণেশ মুহূর্তে উল্টাইবে। এবংবিধ ঘটনা-বিপাকের মধ্যে আজ একান্তভাবেই সে মরিয়া হইয়া আমার কাছে চলিয়া আসিয়াছে—শুধু সন্দর্শন—বিশুদ্ধ বন্ধু-সন্দর্শন—আর কিছুই নয়।

তারপর আরম্ভ হইল বর্তমান বাজারের অসঙ্গত চড়া দাম, শান্তিকামী নাগরিকগণের উপরে তাহার সাম্প্রতিক এবং সুদূরসম্ভাবী প্রভাব, সরকারি মহলের বিবিধ অসাধুতা—জওহরলালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মোক্ষম মোক্ষম চালে ভুল, 'এম-সি-সি'র খেলার ফল এবং বাঙলা সিনেমার বিষয়বস্তু এবং টেক্‌নিক উভয়-ক্ষেত্রের ভয়াবহ ক্রমাধোগামিতার কথা।

এ-পর্যন্ত একরকম চলিতেছিল মন্দ না; কিন্তু তারপরেই আসিয়া পড়িল বাঙলা সাময়িক-পত্রগুলির পরিচালক মণ্ডলীর স্বেচ্ছাচারিতার কথা—আর পুস্তক-প্রকাশকগণের বইয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্বাচন-বুদ্ধির একান্ত অভাব এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অর্থব্যবসায়ী দৃষ্টির অবাঞ্ছিত প্রাধান্যের কথা।

এ প্রসঙ্গগুলি আমাদের নিকট বড় পুরোনো হইয়া গিয়াছে—তাই উঠিতেই প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু লক্ষ্য করিলাম আমি তাহাদিগকে যত সযত্নে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছি বন্ধুবর ততই নানা প্রসঙ্গের অছিলায় ঠিক সেই প্রসঙ্গগুলি টানিয়া আনিবারই চেষ্টা করিতেছে।

সহসা মনে পড়িয়া গেল, তাইত,—কিছুদিন আগে যেন কোন্ পত্রিকায় আমার এই বন্ধুলিখিত একখানি গ্রন্থের সমালোচনা বা প্রশস্তি-লিপি পড়িয়াছিলাম,—তাহাতে ইহাও পড়িয়াছিলাম যে, গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সবই ইতঃপূর্বে একটি বিশেষ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কি বিপদ—লজ্জার মাথা খাইয়া বন্ধুর নিকটে আজ আমি কেমন করিয়া এ-কথা বলি যে আমিই সেই মূর্খ—আমিই সেই পতিত নরাধম যে এমন যুগান্তকারী একখানি গ্রন্থকে এখনও করিয়া পড়ে নাই—এবং গ্রন্থখানির মধ্যে যে যথার্থই বচন-শলাকা সংগ্রহ দ্বারা খোঁচা মারিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে সে

বিষয়ে এখনও অবহিত হয় নাই! প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা কাজ সারিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—'হ্যাঁ হে ভাই, বাজে কথায় যে আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলুম,—তোমার সেই বইটায় কিরকম সাড়া পাচ্ছ হে?'

শুনিয়াই বন্ধু এমন করিয়া একগাল হাসিয়া দিল যে দেখিয়া একমুহূর্তেই বুঝিতে আমার বাকি রহিল না, ঠিক এই কেন্দ্রবিন্দুটিতে আমাকে টানিয়া আনিবার জন্যই বন্ধু অমোর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল এবং অন্ততঃ অদ্যকার সন্ধ্যায় বন্ধুর শুভাগমনের শুধু মুখ্য নয়, একমাত্র কারণ ছিল ইহাই।

বন্ধু বলিল,—'কিরে, তুই জানলি কি ক'রে বইয়ের কথা, পড়েছিস্ নাকি?"

দ্বিতীয়াংশের উত্তরটি সযত্নে চাপিয়া গিয়া প্রথম অংশকে অবলম্বন করিয়াই বলিলাম,—'ও বইয়ের কথা না জেনে উপায় আছে? বাজারে যে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেছে।'

লজ্জিত হইবার ভান করিয়া বন্ধু বলিল,—'আরে যাঃ, তুই বাড়িয়ে বলছিস্।' বলিয়াই কিন্তু কোন্ কোন্ মনীষী বইখানি সম্বন্ধে কোথায় কি লিখিয়াছেন এবং ততোধিকভাবে লোকের কাছে কে কোথায় কি বলিয়াছেন তাহা প্রায় বিরাম-যতি শুদ্ধই অনর্গল মুখস্থ বলিতে লাগিল। তারপরে যে বন্ধুকে আর থামাইতেও পারি না, উঠাইতেও পারি না; কিন্তু দুইটাতেই যে আমার একেবারে আশু প্রয়োজন, কারণ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম আমার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যে একটি সভার পুরোভাগে গিয়া বসিবার অঙ্গীকার রহিয়াছে। অতি দুঃখসহকারে কথাটা বন্ধুকে জানাইতে হইল এবং অতি অনিচ্ছাসহকারে তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল। বন্ধু চলিয়া গেলে আমার শুধু একটি কবিতার একটি লাইনই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল—

"মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।"

যথাসময়ে সভার পুরোভাগে বসিয়া আছি, প্রধান অতিথির ভাষণ চলিতেছে ; পুরা চল্লিশ মিনিট চলিয়াছে, তিনি যে সকল প্রসঙ্গ আজিকার সভায় একান্তভাবেই উত্থাপিতব্য বলিয়া পূর্বাহ্নে আভাস দিয়া রাখিয়াছেন তাহা গুটাইয়া আনিতে আরও চল্লিশ মিনিটের কম হইবে না হিসাব করিয়া একটু দীর্ঘকালস্থায়ী একটা আসন করিয়া বসিয়া রহিলাম। বিষয় মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু বস্তুতঃ বাঙ্গালী যাহা ছিল, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে। এ-বিষয়ে বক্তা বহুপূর্ব হইতে কত সাবধানবাণী, কত ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সব বাণী সময়মত গ্রহণ করিলে বাঙ্গালী জাতি আজ শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয়—জগতের মধ্যে কি হইতে পারিত,—আর সেই বাণীতে যথাসময়ে মনোনিবেশ না করার ফলে যে কি 'মহতী বিনষ্ট' অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সত্যেরই আবৃত্তির পরে আবৃত্তি শুনিতে লাগিলাম উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরিত-প্লুত—সব স্বরে। এই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ের নিকটে কি চিঠি দিয়াছিলেন, ব্রেজিলের টড্ সাহেবের নিকট এ-বিষয়ে এক সময়ে তিনি কি মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ-বিষয়ে একদিন কি কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন, বালক সুভাষকে একদিন কিভাবে তাঁহার হাতের বুড়ো আঙ্গুল ধরিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিতে বলিয়াছিলেন, এসব কথাই তিনি বিস্তারিত জ্ঞাপন করিলেন। সেই এক বক্তৃতাই এতক্ষণ বসিয়া হইল এবং এমন অমোঘভাবে ফলপ্রসূ হইল যে বক্তৃতার পরে সভাপতির ভাষণ শুনিবার জন্য কোনও শ্রোতাই আর অবশিষ্ট রহিল না। সভা-ভঙ্গ করিয়া বাড়িতে ফিরিতেছিলাম—পথে পথে শুধু ভাবিতেছিলাম এ আমার হইল কি—আমি যে দুনিয়ায় যাহা কিছু দেখি—যাহা কিছু শুনি সকলই সেই—

'মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত !'

কিছুদিন ধরিয়া নিজের মনের মধ্যে এই একটা নূতন আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম যে আমার জীবনে একটা মহৎ আবিষ্কার ঘটিয়াছে ; বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন, 'মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে," এই কথাটি ইদানীং যেমন করিয়া আমি বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি এমন সুযোগ হয়ত আর অতি অল্প লোকেই পাইয়াছেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কিছুদিন এই লইয়াই ঈষৎ খোশ মেজাজে আলোচনা করিতাম, মানুষের অবোধত্ব সম্বন্ধে সহৃদয়ের সহানুভূতি লইয়া হাসিতাম। প্রসঙ্গক্রমে এ জিনিসটিও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম যে মানুষের এই আদিম দুর্বলতার কথা সম্বন্ধে আমি এতখানি সচেতন বলিয়াই নিজের বিষয়ে আমি কঠোর আত্মসমীক্ষক। বড় বড় পুরুষ-সিংহেরও এ-বিষয়ে যে সহজাত দুর্বলতা তাহা তাঁহাদিগকে পরোক্ষ জনসমাজে কতখানি হাস্যাস্পদ করিয়া তোলে তাহা যে ভগবান্ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেইখানেই ত নিজে বাঁচিয়া গিয়াছি !

কিন্তু মানুষের কি আর আত্মসুখে বাস করিবার উপায় আছে ? একদিন হাতে পড়িল ত পড়িল একখানি 'চণ্ডীতত্ত্ব'। তাহার যে অংশটি আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল তাহা আবার মহিষাসুর-তত্ত্ব। মানুষের ভিতরকার 'আমি'-টিই নাকি হইতেছে এই মহিষাসুর। আমাদের ভিতরকার শক্তিরূপিণী দেবী তাঁহার বিবেক খড়্গ দ্বারা যতই তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে চান, তত্ত্বদৃষ্টি-রূপ সূক্ষ্মাগ্র শূলের দ্বারা তাহাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া মারিতে চেষ্টা করুন না কেন, এ অসুর সহসা এত সহজে মরিবার নহে, সে নিরন্তর রূপ বদল করিয়া দেবীর দৃষ্টি এড়াইয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চায়। শলাকার আঘাতে কঠোর বেদনানুভূতির সহিত জ্ঞাননেত্র আর একবার খুলিয়া গেল ; চাহিয়া দেখিলাম, আর যাই কোথা,—চণ্ডীতত্ত্ব আমার সহিত চমৎকার মিলিয়া গিয়াছে। নিজের ভিতরকার সাধারণ অসুরের হাত হইতে

নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া এতদিনে যে মহিষাসুর বনিয়া উঠিয়াছি! আত্ম-সমীক্ষণের ক্রমসূক্ষ্মাগ্র দুইটি শৃঙ্গ নাড়িয়া দেবীকে ভয় দেখাইতেছি বটে, আস্ফালনের লাঙুল তাড়নায় নিজে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছি বটে—কিন্তু দেবীর চক্ষে বোধহয় এতদিনে ধরা পড়িয়া গিয়াছি। আমারও বোধহয় মানুষ পিছনে পিছনে হাসে।

মুশকিল হয় এইখানে, দুনিয়ার যত মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সবাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, 'আমি'-টি হইলাম নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থির কেন্দ্রবিন্দু; সুতরাং আর সবাই খালি ঘুরিতেছে, আমি শুধু অচল ধ্রুব। দুনিয়ার সকল লোক—তা তিনি জীবনের যে ক্ষেত্রেই যত বড় হোন না কেন—একটু না একটু ছিটগ্রস্ত—মাথার স্ক্রু বিধাতা পুরুষ ইচ্ছা করিয়া কিছু একটু ঢিলা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সবকিছুই নিখুঁতভাবে ঠিকঠাক ফিটফাট রহিয়াছে শুধু আমার ক্ষেত্রে।

জ্ঞানি-বিজ্ঞানীরা যত যুক্তি-তর্ক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্য বিঘোষিত করুন না কেন যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে না, পৃথিবীই সূর্যের চারিপাশে দিনেরাতে সংবৎসরে ঘুরিয়া মরিতেছে, আমরা এখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছি যে, সূর্যই ঘুরিয়া মরিতেছে, আমাদের পৃথিবী একেবারেই স্থির হইয়া আছে এবং তাহার ভিতরে আবার যে পর্যন্ত ট্রাম-বাস, রেল-স্টীমার, জাহাজ-উড়োজাহাজে না চড়িতেছি সে পর্যন্ত আমরা যে যাহার ঠায়-ঠিকানায় একেবারে নিশ্চল নির্বিকারভাবে আরাম কেদারায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু আমরা যে সকলেই নিরন্তর বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি তাহা আমাদিগকে কে জানাইয়া কে বুঝাইয়া দিবে? 'আমি'টি যে সদা ঘূর্ণায়মান তাহা বুঝিলে ত চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতিকে দিনেরাত্রে এমন করিয়া ঘূর্ণায়মান মনে করিতে পারিতাম না। সংসারে কে স্থির কে অস্থির ইহার মীমাংসা কে করিবে?

মনে আছে, আমাদের দেশে এক ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি সম্পূর্ণরূপেই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'। আমরা জানিতাম তিনি একটু অপ্রকৃতিস্থ ; আমরা তাই তাহাকে যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সাধ্য কি ? গ্রামের পথে চলিতে ফিরিতে তিনি অতর্কিতে কোথা হইতে হঠাৎ রীতিমত গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার যত প্রকার সংবাদ এবং সমস্যা একটি একটি করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়া নিজে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকিতেন। এই-এই আলোচনা এবং মন্তব্য প্রসঙ্গে যত মানুষের নাম উল্লিখিত হইত, সে মধু ধুপি হইতে মদনমোহন মালব্য যে বা যিনিই হোন, তাঁহার সম্বন্ধেই সাবধান করিয়া সঙ্গোপনে বলিতেন —'জান না, ও কিন্তু পাগল,—বদ্ধ পাগল।' একদিক হইতে তিনি ঠিকই বলিতেন। তিনি যদি একমাত্র প্রকৃতিস্থ মানুষের নমুনা হন (যে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্র কোন সংশয় ছিল না এবং আমাদেরও নিজের নিজের সম্বন্ধে কাহারই কোনও দিন কোনও সংশয় নাই) তবে অপরে যাহা কিছু করে বা বলে তাহা ত সবই সেই বিবেচনায় বেঠিক—অতএব তাহারা পাগল নয় ত কি ? কিন্তু হায়, দুনিয়ায় কে পাগল কে ঠিক একথা কে কাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিবে ? নানা হট্টগোলের মধ্যে 'আমি'-টিই কেন্দ্রবিন্দুতে অচঞ্চল এবং অবিনাশী হইয়া রহিল, বেচারা বাদ-বাকি সব কিছু নিরবধি কালে শুধু ঘুরিয়াই মরিতেছে।

বাঙলার সংস্কৃতি

সাম্প্রতিক কালে যে শব্দটি অত্যন্ত বহুল-প্রযুক্ত এবং অত্যন্ত শিথিল-প্রযুক্ত তাহা হইল 'সংস্কৃতি'। শব্দটি দ্বারা আমরা ঠিক কি মনে করি এবং কি মনে না করি সে বিষয়ে স্পষ্ট সচেতন না হইয়াই আমরা অনেক সময়ে যথেচ্ছভাবে ইহার ব্যবহার করিয়া যাইতেছি। ঘরে এবং বাইরে সংস্কৃতিক সম্মেলন বা অভিযানের রীতিমতন হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। এই সকল সম্মেলন এবং অভিযানের কার্যতালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, মুখ্যতঃ সেখানে চলে সাহিত্যের সহিত সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা প্রভৃতির পরিবেশন। আমি এ-জাতীয় অনুষ্ঠান-অভিযান সম্বন্ধে কোনওরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে চাহিতেছি না,—একটা জাতির সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি তাহার সংস্কৃতির পরিচয়ই বহন করে;—কিন্তু সংস্কৃতিকে এগুলির সঙ্গে ঠিক অভিন্ন করিয়া দেখা চলে না—সংস্কৃতি হইল জাতীয় জীবনের একটা সামগ্রিক পরিচয়—সে পরিচয় জাতির মানসধর্মের বৈশিষ্ট্যে। সেই বৈশিষ্ট্যই নানাভাবে প্রকাশ পায় আমাদের দার্শনিক মত, ধর্মানুষ্ঠান, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া।

সংস্কৃতি কথাটার একটা সার্থক প্রয়োগ দেখিতে পাই প্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যেখানে শিল্পকর্মের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।' শিল্পকর্ম সকলই হইল আত্ম-সংস্কৃতি; যিনি এই সব শিল্পকর্ম করেন তিনি নিজেকে ছন্দোময় করিয়া সংস্কার করেন। শিল্পকর্ম এবং অন্য যে প্রাত্যহিক সাধারণ কর্ম তাহার ভিতরে মুখ্য তফাৎ হইল এইখানে—সাধারণ কর্মের দ্বারা আমরা নিজেদের কখনও ছন্দোময় করিয়া তুলিতে

পারি না—সেই ছন্দোহীন আত্মাকে যে কর্ম ছন্দোময় করিয়া তোলে তাহাই হইল শিল্পকর্ম। নিজেদের আমরা যত ছন্দোময় করিয়া তুলিতে পারি ততই হই আমরা আত্ম-সংস্করণে সমর্থ। এই আত্ম-সংস্কারের অর্থ কি? এই আত্ম-সংস্কারের অর্থ আত্ম-উধ্বায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞের প্রসঙ্গেই এই শিল্পকর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যাগ-যজ্ঞেরও মূল সত্য মনে হয় একটি উধ্বায়ন। অগ্নির মধ্যে আমরা প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলাম এমন একটি পদার্থ—যাহার গতি কখনই নিম্নাভিমুখী নয়—সর্বদাই উধ্বে। সমগ্র জীবনের গতিকে উধ্বমুখী করিয়া লওয়া—ইহাই হইল আত্ম-সংস্করণের মূল সত্য। আমাদের অধুনা-প্রচলিত সংস্কৃতি কথাটিকেও আমি এই উধ্বায়নের আলোতেই গ্রহণ করিতে চাই।

এই আলোতে সংস্কৃতি কথাটাকে গ্রহণ করিলে দেখিতে পাই, একজন লোক তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তে নানারকমের কাজ করিয়া যাইতেছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিতেছে নানারকমের ফল; সে লাভ করে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, শক্তি, প্রতিপত্তি, যশ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু জীবনে এই সকল যাহার লাভ হইয়াছে তাহাকেই ঠিক আমরা সব সময় সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সংস্কৃতি হইল এই সকল কৃতি ও লাভের ভিতর দিয়া লব্ধ একটি মানসধর্ম—যে ধর্ম তাহাকে রম্যতা, সূক্ষ্মতা, স্নিগ্ধতা ও উপযোগিতা দ্বারা সামগ্রিক ভাবে উধ্বস্রোতে আপন্ন করিয়া দিয়াছে। মানুষের মানস-সংস্কার ব্যতীত যে কৃতি তাহা আর যাহাই হোক না কেন—সংস্কৃতি কিছুতেই নয়। এই জন্যই আমাদের সামাজিক জীবনে এ জিনিসটি আমরা প্রায়শঃই ঘটিতে দেখি, আমরা কাহারও সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করি,—লোকটির বিদ্যাবুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, মান-যশ যথেষ্টই আছে বটে, কিন্তু তাহার কোনও সংস্কৃতি নাই।

একটা জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। দীর্ঘ দিবসের ইতিহাসের আবর্তনের ভিতর দিয়া একটা জাতি অনেক কিছু করিতেছে—করার ভিতর দিয়া অনেক কিছু লাভ করিতেছে—কিন্তু বাহিরের সকল লাভ-লোকসানের ভিতর দিয়া জাতিগতভাবে তাহার মধ্যে কতগুলি মানস-প্রবণতা গড়িয়া উঠিতেছে—যে মানস-প্রবণতার মধ্যে যেমন আছে তাহার জাতি-হিসাবে বৈশিষ্ট্যের পরিচয়, তেমনই আছে তাহার উর্ধ্বায়নের সঙ্কেত। যে জাতির সমস্ত কৃতি-জনিত সমৃদ্ধির মধ্যে এই উর্ধ্বায়নের সংকেত নাই তাহার সকল শক্তি, ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তাঁহার কোন সংস্কৃতি নাই। আমাদের স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, গগন-চুম্বী প্রাসাদ আর বিদ্যুদ্‌গামী বিমান-বহরের প্রাচুর্যই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিমাপক হইতে পারে না—যদি না তাহার ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনে একটা কল্যাণময় স্থিরভাব একটু একটু করিয়া গড়িয়া উঠিয়া থাকে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তিজীবনে এবং জাতীয় জীবনে আমি এই উদ্‌গতি-প্রবণ চিত্ত-ধর্মের উপরেই জোর দিতে চাই—ধর্মে, সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে এই চিত্তধর্মেরই বিচিত্র প্রকাশ।

সংস্কৃতি এমন গূঢ় এবং ব্যাপক বলিয়াই তাহার প্রভাব দেখা দেয় আমাদের জীবনে সবচেয়ে গভীর করিয়া। জাতীয় জীবনের গূঢ়মূল হইতে ইহা ব্যক্তিজীবনের উপরে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এই জন্য দেখিতে পাই আমাদের শিক্ষা বা আমাদের ধর্মবোধকে উগ্র করিয়া করিয়াও আমরা সংস্কৃতির প্রভাবকে সর্বদা বাধা দিতে পারি না। আমি পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চল সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ গল্পের উল্লেখ করিয়া কথাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাই। বহুদিন পূর্ব হইতেই পূর্ববঙ্গেও কোনও কোনও অঞ্চলে বর্ণহিন্দুগণের ব্যবহারে বিদ্বিষ্ট হইয়া এবং আরও অন্যান্য অনেক লাভের আশায় বহুসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। ইহারই একটি

অঞ্চল সম্বন্ধে গল্প আছে, মিশনারী পাদ্রীগণ সেই অঞ্চলের লোকজনকে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করিয়া সেখানে তাহাদের জন্য ভাল চার্চঘর তুলিয়া দিলেন, এবং সেখানে রবিবারে রবিবারে প্রার্থনা-পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন। ত্রাণকর্তা যিশুর কৃপায় নবদীক্ষিত জনগণের কতদূর কি উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য পাদ্রীসাহেব সেই অঞ্চলে কিছুদিন পরে আবার পদার্পণ করিলেন। তিনি আসিয়া ত একেবারে হতবাক্,—দেখেন সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা চার্চের কাছে আসিয়া শাঁখ বাজাইয়া হুলুধ্বনি করিয়া চলিয়া গেল—সন্ধ্যার পরে পুরুষেরা খোল-ঢোল-করতাল বাজাইয়া হরির গান করিয়া গেল—দেখিয়া শুনিয়া সাহেব ত রাগে লাল,—বলিলেন, 'চার্চে বসিয়া তোমাদের এ-সব কি হইতেছে?' স্থানীয় অধিবাসীরা জবাব দিল,—'কেন সাহেব, খ্রীষ্টান হইয়াছি বলিয়া কি বাপ-দাদার ধর্মও সব ছাড়িয়াছি?' এই 'বাপ-দাদা'র ধর্ম কথাটি লক্ষ্য করিতে হইবে, এই বাপ-দাদার ধর্মটি আর কিছুই নয়—ইহা হইল একটা সামাজিক ঐতিহ্যসূত্রেলব্ধ চিত্তে গভীরবদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব। এই যে সন্ধ্যাবেলায় ধর্মগৃহের প্রাঙ্গণে শাঁখ বাজান, হুলুধ্বনি করা—বা সন্ধ্যারতি, নামকীর্তন প্রভৃতি ইহার মধ্যে বহুদিনের লব্ধ এমন একটি বিশেষ চিত্ত-প্রবণতা রহিয়াছে যাহা ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা রূপান্তরিত হইয়া যাইতে চাহে না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়িতেছে মাদ্রাজ-উপকূলের জেলেদের কথা। আজ এই জেলেরা প্রায় সবই খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলবর্তী একটা বিরাট অঞ্চলে এক সময়ে সৌরধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল মনে হয়—সেই সৌরধর্মেরই একটি প্রধান অবশেষ এই সব অঞ্চলের 'রথযাত্রা'র উৎসব; মাদ্রাজের উপকূলবাসী জেলেরা এখন খ্রীষ্টান হইলেও তাহারা এই 'রথযাত্রা'র উৎসবকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই—তাহারা এখনও এই উৎসব সাড়ম্বরেই পালন করিয়া থাকে, তবে খ্রীষ্টান বলিয়া রথে আর

কৃষ্ণ, সুভদ্রা, বলরামকে বসাইতে পারে না—সেখানে বসায় যিশুখ্রীষ্ট এবং ভার্জিন মেরীকে—অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠান এক রকমই রহিয়া গিয়াছে।

অশিক্ষিত জনগণের কথা বাদ দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথাই বলিতেছি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেপরোয়া খ্রীষ্টান হইয়া গেলেন—দেহ-মনে, সাজ-সজ্জায়, আচারে-বিচারে এবং আহারে-বিহারে বিদেশী হইয়া যাইবার জন্য তিনি কি না করিয়াছেন। কিন্তু সেই আপোষহীন সাহেব ইউরোপে বসিয়াই যখন ইটালীয় সাহিত্যের আদর্শে সনেট রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার বিষয়বস্তু কি ছিল? তিনি কবিতা লিখিলেন 'আশ্বিন মাস' সম্বন্ধে—এবং সেই শারদীয়া বঙ্গের স্মরণে 'পূর্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি, আনিছে হে বারিধারা আজি এ নয়নে?' তিনি 'নিশাকালের নদীতীরে বটবৃক্ষের শিবমন্দির' সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিলেন কেন? তিনি 'ঈশ্বরী পাটনী' 'বিজয়া দশমী' 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' সম্বন্ধে কবিতা লিখলেন কেন? ইহাই হইল ব্যক্তিজীবনের উপরে গভীরভাবে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব। এই সকল দৃশ্য—এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠান আমাদের বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সহিত এমনভাবে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে যে জাতীয় মানসধর্মের টানা-পরেনের মধ্যেই তাহা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া হ্যাট-কোট পরিয়াই দুই দিনে তাহাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ' কাব্য যেখানে শেষ করিলেন—

> করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষদল এবে
> ফিরিয়া লঙ্কার পানে আর্দ্রঅশ্রুনীরে—
> বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে।
> সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে!

তখন বার বারই মনে হইয়াছে, একজন বাঙালী কবি ছাড়া এই উপসংহার আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না—অন্য কোনও ভারত-

বাসীর পক্ষেও নয়—কারণ, দেবীপূজা ভারবর্ষের অন্যত্রও থাকিতে পারে—কিন্তু শারদীয়া উমা মায়ের আগমন-বিসর্জন লইয়া বাঙালী-চিত্তের যে গভীর আনন্দ-বেদনা—ইহা ভারতের অন্যত্র দুর্লভ। এই দশমী-দিনের বিসর্জনকে লইয়া বাঙালী-চিত্তের যে করুণ সজলতা—ইহা ধর্মের প্রভাব নয়—ইহা জাতীয় সংস্কৃতিরই গূঢ় প্রভাব।

আর একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ—আর বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ—যুক্তির যুগ। এই যুগে বাস করিয়া আমাদের মধ্যে এখনও কয়জনে বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক গৃহেরই অধিষ্ঠাত্রী একজন শ্রী এবং সম্পদ্-রূপিণী দেবী রহিয়াছেন—এবং তিনি ছোট্ট একখানি কাঠের আসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি পল্লব-পুষ্প শোভিত সিন্দূরের পুত্তলাঙ্কিত ধাতুনির্মিত ঘটের উপরে নিশিদিন অচল-প্রতিষ্ঠ! কিন্তু আজও যখন সকালবেলা স্নানান্তে শুচিশুভ্র সীমন্তিনীরা তেমনিই জলভরা ঘট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমাদের দেখিতে ভাল লাগে,—সন্ধ্যায় সেই ঘটের কাছে যখন ধূপ-দীপ জ্বালিয়া দিয়া তাঁহারা গলায় আঁচল জড়াইয়া গড় করিয়া যান—তাহা আমাদের চিত্তে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য বিকীর্ণ করিয়া দেয়। ইহার কারণ ধর্মবোধ নয়—ইহার কারণ সংস্কৃতি—বহুদিনের আবর্তিত একটা বিশেষ জীবন-ধারা হইতে উদ্ভূত একটা বিশেষ মানসিক সংগঠন।

এই যে একটা বিশেষ পরিবেশের ভিতরে জাতীয় জীবনধারার কতগুলি বিশেষ খাতে আবর্তন এবং তাহার ভিতর দিয়া জাতিগত-ভাবেই একটা বিশেষ মানসিক সংগঠন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই জিনিসটিই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই বিশেষ মানসিক সংগঠনে কত দিক হইতে যে কত জিনিস প্রভাব বিস্তার করে তাহা সহসা বুঝিয়া উঠা শক্ত। আমার বিশ্বাস, একটা দেশের ভৌগোলিক চরিত্রও এই এই মানসিক সংগঠনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি একটি বিশেষ

দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। বাঙলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, নদী পারাপাররূপ কর্মটি তাই আমাদের জীবনচর্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কতগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ঘর হইতে কর্মব্যপদেশে বাহির হইতে হইলেই আমাদিগকে নৌকায় নদী পার হইতে হয়—কর্মের শেষে দিবসান্তে আবার নদী পার হইয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এই যে উদ্দামস্রোতশীলা নদী—তাহা বহুদিন হইতেই আমাদের চেতনাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—ঘনীভূত করিয়াছে ও বহুদিন হইতেই তাই এই নদীর অবিরাম চলাকে বিশ্বসংসারের অবিরাম চলার সহিত যুক্ত করিয়া দেখিয়াছি। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথই যে শুধু উদ্দামপ্রবাহিণী, উত্তালতরঙ্গা পদ্মার প্রভাবে বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন—'শুধু ধাও—শুধু ধাও, শুধু শুধু বেগে ধাও,—উদ্দাম উধাও';—তাহা নহে, হাজার বৎসর পূর্বেও বাঙালী কবি কবিতা লিখিয়াছেন—

'ভবণই গহণ গম্ভীরবেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চীখিল মাঝে ণ থাহী॥'

চর্যাপদগুলির মধ্যে দার্শনিকতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব—সাধনতত্ত্ব—যাহা কিছু সকলের কথা বলিতে গিয়াই দেখি কবিদের কেবল উপমা—নদীর—খাল-বিখালের—নৌকার—পারাপারের। খেয়াঘাটের মেয়ে পাটনীর ছবিটিও বাদ যায় নাই—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত হইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা॥

গঙ্গা যমুনার মাঝ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে নৌকা; সে নৌকা চালাইয়া যাইতেছে মতঙ্গকন্যা পাটনী—তাহাকে পার করিতে দেখিলে মনে হয়, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছোট নৌকা লইয়া সে বুঝি ডুবিয়াই গেল; কিন্তু তাহা

নয়, আশ্চর্য নিপুণতা সেই পারের পাটনীর—লীলাচ্ছলেই যেন সে দেয় পার করিয়া। পারে যাইবার তাগিদ যাহার সে শুধুই হাঁকিয়া চলিয়াছে,—বাহিয়া চল ডোম্বি, বাহিয়া চল গো,—পথেই যে হইয়া গেল অনেক বেলা; সদ্‌গুরুর পাদপ্রসাদে যাইতে হইবে জিনপুরে।

ইহার পরে বৈষ্ণব সাহিত্যে আসিয়া দেখি শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস লইয়া কি মধুর লীলা বিস্তার। শ্রীকৃষ্ণের যে খেয়াঘাটের মাঝি সাজিয়া গোপিনীদের সঙ্গে এত বিচিত্রলীলা ইহা বাঙলার কবিগণ কোথা হইতে পাইয়াছেন? ভাগবতাদি পুরাণে ত এই লীলা নাই। কিন্তু ভাগবতে না থাকিলে কি হয়, বাঙলার যাঁহারা মধ্যযুগে ভাগবতের অনুবাদ করিলেন তাঁহারা কত ফলাও করিয়া এই নৌকা বিলাসের বর্ণনা করিলেন; বড়ু চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের ত কথাই নাই! তারপরে মণ্ডনচাতুর্যের কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যেও আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সকল সাহিত্য-কৃতির মধ্যেও বাঙলাদেশের মানুষের মনে যাহা সবচেয়ে বেশি দাগ কাটিল তাহাও একটি খেয়া-ঘাটে ঈশ্বরী পাটনীর 'একা কূলবধূকে' খেয়া পার করিবার দৃশ্য। আমাদের যুগে আসিয়া দেখি, 'খেয়া' যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ের কাব্যসামগ্রী তাহা নহে—এই খেয়ার দৃশ্য—তাহাকে অবলম্বন করিয়া কত সূক্ষ্ম করুণ অনুভূতি—কত দার্শনিক চিন্তা কতবার কতরকমে ভিড় করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে। সূর্য তাহার সারাদিনের চলা এবং কাজ শেষ করিয়া সম্মুখের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এইবারের মত আত্ম-নিমজ্জনের জন্য প্রস্তুত—চলাপথের দিকে চাহিয়া থাকা সেই সূর্যের ম্লান রশ্মি দিক্‌চক্রবালকে পাণ্ডুর করিয়া দিয়াছে—নদীর কালো জলে মলিন রাঙা ছায়া ফেলিয়াছে—ঠিক এই সময়ে দিনের চলা এবং কাজ শেষ করিয়া আপন নিবাসে ফিরিয়া যাইবার আগ্রহ লইয়া খেয়াঘাটে যাত্রীর দৃশ্য বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীর মনে একটি করুণ বিধুর

বৈরাগ্যের রঙ ধরাইয়া দিয়াছে—তাহার সহিত মিলিয়া গিয়াছে একটা অধ্যাত্ম অনুভূতির স্পন্দন—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বাঙালীর মনে জাতিগতভাবেই একটা দার্শনিক বুদ্ধি—একটা ধর্মচেতনা—জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, শুধু বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথই কবিতা লিখিলেন না,—'ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কেরে দিনশেষের শেষখেয়ায়,'—সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার গাছপালা ঢাকা মন্দির-প্রাঙ্গণ, বাঙালার মাঠ-ঘাট হইতে বাঙালী-মনের একটা করুণ সুর ভাসিয়া আসিতে শোনা যায়—

দয়াল দিনত গেল সন্ধ্যা হ'ল—
পার কর আমারে !
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা
ডাকিহে তোমারে।
শুনি কড়ি নাই যার—
তুমি তারে কর পার—
আমি দীন ভিখারী নাইক কড়ি
দেখ ঝুলি ঝেড়ে !

সংস্কৃতি এবং বাঙালার সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথার আলোচনা করিলাম—এবারে ঐতিহাসিক ক্রমে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। ইতিহাসকে একবার অবলম্বন করিলেই আলোচনার বিস্তার সুদীর্ঘ হইবার কথা; আমরা বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়া বাঙলার বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির রূপ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটি তথ্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব।

সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাণ্ড জাহাজের পিছনে বাঙলার সংস্কৃতিকে সর্বদাই একটি গাধাবোটের ন্যায় বাঁধিয়া দিলে বাঙলা সংস্কৃতির নিজস্ব প্রকৃতি এবং হাজার হাজার বছর ধরিয়া তাহার বিচিত্র গতিপথের আঁকবাঁকগুলি আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। বৈদিক আর্য সংস্কৃতি তাহার প্রাথমিক রূপ লইয়া বাঙলা দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। গুপ্তযুগের প্রারম্ভ হইতে রাজনৈতিক কারণে বাঙলাদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের যোগ যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, এই আর্য-সংস্কৃতি ততই একটু একটু করিয়া বাঙলাদেশে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এই গুপ্ত যুগের পূর্বেই বৈদিক সংস্কৃতি তাহার প্রাথমিক রূপ হইতে পরিবর্তিত হইয়া একটা মিশ্র হিন্দু-সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইজন্য দেখিতে পাই আদিশূরের কিংবদন্তী—গুপ্তসাম্রাজ্যের অনেক পরেও বাঙলাদেশে যাগ-যজ্ঞ করাইতে বৈদিক ব্রাহ্মণের আমদানি করিতে হইয়াছে বাঙলার বাহির হইতে। দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠী অধ্যুষিত বাঙলাদেশের যে সমাজ-মানস তাহার উপরে এই মিশ্র সংস্কৃতি আরও মিশ্রণের সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু এই মিশ্রণ শুধু পরস্পরবিরোধী কতগুলি উপাদানের সংঘর্ষ নহে—এই মিশ্রণের মধ্যে একটা একীভবনের প্রবণতা ছিল। এই একীভবনের প্রবণতা আসে কোথা হইতে? ইহার পশ্চাতে ছিল জনগণের একটি প্রাণের উত্তাপ। জাতির প্রাণধর্ম যদি একান্ত ভাবে শিথিল এবং শীতল না হয়—তাহার মধ্যে যদি থাকে গতিচাঞ্চল্যপূর্ণ একটি উত্তাপ, তাহা হইলে সেই প্রাণধর্মের উত্তাপ বিভিন্ন মূল হইতে প্রাপ্ত অসমজাতীয় অনেক উপাদানকে জীবনপাত্রে গলাইয়া লইয়া সমজাতীয় করিয়া লয়—এই প্রক্রিয়াই হইল জনপ্রিয় সমন্বয় প্রক্রিয়া। এই যুগের আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে এই সমন্বয় প্রক্রিয়াটাই বেশিভাবে চোখে পড়ে। সেই জনপ্রিয় সমন্বয়-প্রক্রিয়ারই একটি

ব্যাপক এবং স্পষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাইয়াছি পালযুগে—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্ম তখন নানা ভাবে বাঙলাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামে বাঙালীর চিন্তা-চর্যা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই বৌদ্ধধর্মের রূপ কি? তথা কথিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে চিন্তা-চর্যায় ইহার পার্থক্য কতটুকু; এই সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে এবং তাহার আশপাশে যে বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—যে দেব-দেবী এবং তাহার পূজাপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে—যে দোঁহা ও গানে দর্শন ও সাধনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতটুকু বা বৌদ্ধ—কতটুকুই বা ব্রাহ্মণ্য আদর্শের হিন্দু? বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলির মধ্যে যে বহুসংখ্যক দেবদেবীর সন্ধান পাইলাম তাহাদিগকে ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের মধ্যে খুঁজিয়া পাই কি? আসলে ইহা হিন্দু বা বৌদ্ধ কিছুই নয়—বিভিন্ন মূল হইতে সংগৃহীত উপাদান বাঙলীর মনের মধ্যে গিয়া প্রাণযাত্রার প্রবাহেই একটা সমজাতীয়ত্ব লাভ করিয়াছে—এ সকল ধর্ম-চর্যা সেই জনপ্রিয় সমন্বয়-প্রক্রিয়া দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল বাঙলাদেশের বৌদ্ধ সাধককবিগণ যখন গান রচনা করিলেন যে, একজন পরম আনন্দময় অশরীরী লুকাইয়া আছেন এই শরীরের মধ্যে, যে তাঁহাকে জানে সেই হয় মুক্ত; এই দেহের ঘরেই অবস্থান করিতেছেন আমাদের পরম পতি—পণ্ডিত প্রতিবেশিগণের নিকটে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করা বৃথা—তখন বাঙালীর এই সত্যদৃষ্টিকে কাহার সহিত যুক্ত করিয়া দেখিব? ইহা তৎকালীন বাঙালীর অনুভূতির সহিত বহুদিনের বহু মূল হইতে প্রাপ্ত বহু উপাদানেরই একটা আশ্চর্য সমন্বয়। তৎকালীন রাজশক্তিও কোন উগ্রপন্থী ছিল না—তাই এই সমন্বয়-প্রবাহে রাজশক্তি আনুকূল্য ব্যতীত প্রাতিকূল্য কখনই করে নাই।

পালরাজত্বের অবসানে দেখা দিল সেনরাজত্ব। সেনবংশ বাঙলা দেশের পক্ষে একটি বহিরাগত রাজশক্তি। সেই বহিরাগত রাজশক্তি

বাঙলার বাহিরে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বোধ হয় বাঙলার জল-মাটিতে কিছুটা নূতন জীবনদানের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সে চেষ্টারও কোথাও কোনও উগ্রতা ছিল মনে হয় না। সেনরা রাজসভায় সংস্কৃত-চর্চার উৎসাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সংস্কৃত-চর্চার অবলম্বন ছিল যে বৈষ্ণবধর্ম তাহা বাঙলাদেশেরই রাধা-কৃষ্ণের বৈষ্ণবধর্ম—প্রকাশ-ভঙ্গিতে তাহা প্রাকৃতঘেঁষা—জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যেই আছে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তবে এই সেনরাজত্বের আমলে কর্মকাণ্ডপ্রধান ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ধারক কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও লিখিত হইয়াছিল, এই তথ্যেরও যে একটা বিশেষ ইঙ্গিত ছিল সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

সেনরাজত্বের অবসান অতিশয় আকস্মিকভাবে এবং নাটকীয়ভাবে, মুস্লিম-বিজয়েই এই বিপর্যয়। মুস্লিমগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত হইল বটে—কিন্তু দেড়শত বৎসরের মধ্যে নাম করিবার মতন কোনও মুস্লিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল না ; সুতরাং দেখা দিল সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসরের একটা অরাজকতার অন্ধকার যুগ। সেই প্রাথমিক রূঢ় আঘাত এবং পরবর্তী স্বৈরাচার ও ব্যাপক অব্যবস্থা জাতির জীবনে আনিয়া দিল একটা সামগ্রিক ক্লৈব্য এবং অক্ষমতা। মুস্লিম-বিজয়ের পরে বাঙালী জাতি 'কমঠ-বৃত্তি' গ্রহণ করিল বলিয়া যে কথা আছে, সে কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তৎকালীন এই 'কমঠ-বৃত্তি' দেখা দিয়াছিল জাতীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে—সেই জন্যই তাহা মধ্যবাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একটি সর্বাতিশায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধ্যযুগের আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় লইতে হইলে তাই সর্বপ্রথমে এই 'কমঠ-বৃত্তি' কথাটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

সেই যুগে বাঙালীর এই সামগ্রিক 'কমঠ-বৃত্তি' গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল জাতীয় আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনে। আত্ম-রক্ষা জীব-

মাত্রেরই একটি মৌলিক সহজাত বৃত্তি; কিন্তু ক্ষেত্র এবং পাত্রভেদে এই বৃত্তি-প্রণোদিত কর্মপদ্ধতি দেখা দেয় দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে। একটি ব্যাঘ্রকে যদি আক্রমণ এবং আঘাত করা যায় তবে সে আত্ম-শক্তিতে দৃঢ় প্রত্যয়বান্ বলিয়া আত্মরক্ষারই চেষ্টা করিবে প্রত্যাক্রমণ এবং প্রত্যাঘাতের দ্বারায়। তাই তখন সে তাহার আত্মদেহে লুক্কায়িত নখ-দন্তকেই বিস্তারিত করিয়া আত্ম-প্রসারণের দ্বারা আত্ম-রক্ষণের প্রয়াস পাইবে। কিন্তু একটি কমঠ যদি ঠিক একই ভাবে কোনও প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত হয়—সে দেখিবে প্রত্যাক্রমণের দ্বারা তাহার আত্ম-রক্ষার সম্ভাবনা নাই—তখন সে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিবে তাহার কঠিন খোলসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংহরণের দ্বারা। অতর্কিত মুস্লিমবিজয় এবং শুধু রাষ্ট্রজীবনে নয়, সকল সমাজজীবনে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বাঙালী জাতিরও যেন এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আত্ম-শক্তিতে সে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল—সেই ক্লৈব্যকে লইয়া স্বৈরাচারী বিদেশী শক্তিকে অনুরূপ প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া আত্ম-রক্ষার সম্ভাবনা সে কোনও দিকেই দেখিতে পাইল না,—অথচ সহজাত-বৃত্তিবশেই আত্ম-রক্ষা তাহাকে করিতেই হইবে—সুতরাং জাতি আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল শুধু বিবিধপ্রকারে আত্ম-সংহরণের পথে।

এই যে আত্ম-সংহরণের দ্বারা আত্ম-রক্ষার চেষ্টা তাহারই ইতিহাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে আমাদের মধ্যবাঙলার মঙ্গল-কাব্যগুলির ভিতরে। দৈবশক্তি দিয়া জীবনের চারিপাশে একটি কঠিন খোলসের সৃষ্টি করিয়া লইলাম—এবং তাহার কাছে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়া হাত-পা যতখানি পারি গুটাইয়া লইলাম। পশুর ন্যায় দল বাঁধিয়া দেবীর নিকট 'গোহারি' গাহিয়া বেড়াইলাম—আত্ম-শক্তিতে জাগ্রত হইয়া নিজেকে খ্যাপন এবং স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলাম না। নিজে যে প্রবল স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তর্জনী হেলন করিতে সাহস করিলাম

না তাহাকে অধিকতর ক্রূর স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা নিগৃহীত করিবার বাসনায় নানা দেব-দেবীর সৃষ্টি করিয়া মনে মনে একটা ক্লীবের সান্ত্বনা লাভ করিতে লাগিলাম।

ইহা ত গেল মুখ্যভাবে নিম্নকোটির জনগণের কথা; উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে কোন্ প্রবণতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল? নবদ্বীপের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক জীবনকে আমরা যদি মোটামুটিভাবে তৎকালীন বাঙলার সংস্কৃতির প্রতিভূ বলিয়া গ্রহণ করি তবে কি কি দেখিতে পাই? তৎকালীন উচ্চকোটির জনগণের চিন্তা ও দিনচর্যা কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছিল? প্রাণহীন, আশাহীন, সিদ্ধান্তহীন শুষ্ক তর্কের পথে। 'নব্য-ন্যায়' এই যুগের বাঙালীর সর্বাপেক্ষা গর্বের বস্তু। 'নব্য-ন্যায়ের' প্রতি কোনও রূপে অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়াও বলিতে পারি, 'নব্য-ন্যায়' আমাদিগকে চিন্তাজালের একটা সীমিত পরিধির মধ্যে বিস্ময়কর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরিভ্রমণের সুযোগ দিল বটে, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনকে সম্প্রসারিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল কি? ন্যায়ের কাজ চিত্তকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সূক্ষ্ম পথে নিত্য নূতন সত্যকে আবিষ্কার করিতে সাহায্য করা; বাঙলাদেশের তৎ-কালীন ন্যায়চর্চা আমাদিগকে কোনও নূতন জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল কি? বাঙলাদেশের তৎকালীন এই ব্যাপক ন্যায়চর্চা কি তবে সেই কমঠ-বৃত্তিরই একটা প্রচ্ছন্ন রূপ?

সেই যুগে উচ্চকোটির বাঙালী বেশিভাবে আর চর্চা করিয়াছিল ব্যাকরণের। ব্যাকরণ-চর্চার কি উদ্দেশ্য? ভাষার বিশুদ্ধি-সাধন—ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির উপলব্ধি। এই শব্দ-বিশুদ্ধি-সাধন ও শব্দ-শক্তির উপলব্ধি কিসের জন্য—তাহা দ্বারা নূতন কিছু সৃষ্টির জন্য ত? আমাদের মধ্যযুগের ব্যাকরণ চর্চা কিন্তু সর্ববিধ সাহিত্যিক সৃষ্টিবিরহিত বিশুদ্ধ চর্চা। আমরা ন্যায়ের জন্যই বসিয়া বসিয়া ন্যায়ের

চর্চা করিয়াছি—জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিবার সঙ্গে তাহার যেন কোনও যোগ ছিল না; তেমনই আবার ব্যাকরণের জন্যেই বিশুদ্ধ ব্যাকরণের চর্চা করিয়াছি—কোনও প্রকার সৃষ্টিকার্যের সহিত তাহার কোনও যোগ ছিল না।

এই যুগে আর বাড়িয়া উঠিল আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। এই স্মৃতিশাস্ত্রেরও কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অপ্রত্যাশিত বৈদেশিক আঘাতের কবল হইতে জাতিকে রক্ষা করা। কিন্তু কোন্ পথে? মুখ্যতঃ বিধি-নিষেধের বন্ধনের পথে—আত্ম-সঙ্কোচনের পথে। জাতি যখন অনাচারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—তখন তাহাকে আবার সদাচারের কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া টানিয়া রাখা চলে কিনা। আমি এই সকল চেষ্টাকেই ব্যাপকভাবে একটা কমঠ-বৃত্তিরই রূপান্তর বলিতে চাই। জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে নিত্য নূতন প্রেরণা না জোগাইয়া শুধু আচার-বিচার তর্কজালে নিজেকে নিষ্ফলা করিয়া রাখা।

এই আত্ম-সংহরণের পথ হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া একটা আত্ম-প্রসারণের পথের ইঙ্গিত দিলেন—এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি কূটতার্কিক নাস্তিকগণের মধ্যে জীবন্ত 'কৃষ্ণ-চৈতন্য' রূপে দেখা দিলেন—তর্কতাপিত সংশয় অবিশ্বাসের শুষ্কতাকে প্রত্যক্ষানুভূতির অমৃতসিঞ্চনে স্নিগ্ধ করিয়া দিলেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-বিধি বাঙলার জলবায়ুতে কখনই জীবন্তধর্ম রূপে দেখা দিতে পারে নাই, মুস্লিমবিজয়ের পর আঘাতটা আবার যখন উচ্চকোটির উপরেই দেখা দিল বেশি করিয়া তখন বৈদিক যাগ-যজ্ঞ বা কর্মকাণ্ডের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা আর ছিল না; মহাপ্রভু তাই যুগোপযোগী এবং জাতির পক্ষে সহজগ্রহণোপযোগী নূতন যজ্ঞ-বিধির প্রচার করিলেন; স্বাভাবিক নৃত্য-গীতি-প্রিয়

বাঙালী জাতির মধ্যে তিনি কীর্তনরূপ নাম-যজ্ঞের প্রবর্তন করিলেন। আমাদের সেই মিলিত নৃত্যগীত সবই রহিল—শুধু তাহার সহিত আমরা একটা নূতন 'কৃষ্ণ-চৈতন্য' বা ভগবৎ-চৈতন্য যুক্ত করিয়া লইলাম। উচ্চ-কোটির লোক শুধু ন্যায়ের চর্চায় কাল অতিবাহিত না করিয়া নূতন করিয়া বৈষ্ণবদর্শন গড়িয়া তুলিতে মনোনিবেশ করিলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা কমিয়া গিয়া নূতন প্রেরণায় সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেখা দিল, আর বাঙলা গীতি-কবিতায় ত দেশ ভরিয়া গেল।

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা-সংস্কৃতির মোড় ফিরিবার আরও একটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। চৈতন্যদেবকে আমরা আমাদের মধ্যে পাইলাম একটি দেব-মানবরূপে। ইহাতে মানুষের মহিমাকে নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। দেবতা যখন স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হইলেন—তখন আমাদের দৃষ্টিও নূতন করিয়া মর্ত্যধাম এবং তাহার বুকে মানব-লীলার দিকে আকর্ষিত হইল। বৈষ্ণবভক্তগণ যখন অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিলেন, 'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা'—তখন নরলীলার একটা নূতন মূল্য আবিষ্কৃত হইল। তাই এই যুগের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে সকল মানুষকেই যেমন ঠেলিয়া-ঠাসিয়া দৈবের দাস করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইল, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তেমনই আবার শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দকে নররূপেই দেবত্বমণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইল। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের একটি গোপন ধারারও উল্লেখ করা যাইতে পারে—বৈষ্ণব-সহজিয়া ধারা—যে ধারায় স্বরূপকে রূপের মধ্যেই; অপ্রাকৃতকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাধা-প্রেমলীলাকে মর্ত্যের নর-নারীর প্রেম-লীলার মধ্যেই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল।

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সপ্তদশ শতক পর্যন্ত একটা সাড়া জাগাইয়া রাখিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা প্রায় স্তিমিত হইয়া আসিল। রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন শৈথিল্য, অত্যাচার,

অব্যবস্থা—তেমনি আর্থিক অবস্থার চরম দুর্গতি—সর্বধ্বংসী দুর্ভিক্ষ—মহামারী। ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে নূতন করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য আবার দেখা দিল প্রচণ্ড আঘাত—সে আঘাত রূপ-পরিগ্রহ করিল পলাসির যুদ্ধে—ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ে। কিছুদিন চলিল একটা মলিন ডামাডোলের অবস্থা—কিন্তু সমস্ত জিনিস একটা স্পষ্ট রূপপরিগ্রহ করিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে—স্পষ্টভাবে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে।

এবারেও আঘাত আসিল শুধু রাজনৈতিক জীবন নয়—সামগ্রিক জীবনে; ইংরেজ একটি জাগ্রত প্রাণবন্ত জাতি—তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বিজয় শীঘ্রই রূপ গ্রহণ করিল প্রকাণ্ড একটা সাংস্কৃতিক বিজয়ে,—ফলে প্রকাণ্ড ওলট-পালট দেখা দিতে লাগিল আমাদের জীবনধারা এবং আমাদের চিন্তাধারা উভয় ক্ষেত্রেই। ইউরোপের দূত হিসাবে ইংরেজ আসিয়া আমাদের দেহ-মনে যখন আঘাত করিতে লাগিল তখন তাহাকে উপেক্ষা করা গেল না এই কারণে যে তাহার যে শুধু রাজশক্তির ভার ছিল তাহা নহে, তাহার মধ্যে যুক্তির ধারও ছিল! কিন্তু আশা, আনন্দ ও গর্বের কথা হইল এই, এবার এই আঘাতের মুখে জাতি আর নিজের ক্লৈব্যত্বকেই বড় করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া আত্ম-সংহরণ এবং আত্ম-সংকোচনের পথে আত্ম-রক্ষণের উপায় সন্ধান করিল না, জাতি স্বীয় বীর্যে নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়া চিন্তায় ও চেষ্টায় দিকে দিকে আত্ম-প্রসারণের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙালী জাতির নবজাগরণ। রাজা রামমোহন রায়কে আমরা লাভ করিয়াছিলাম এই সর্বাঙ্গীণ নব-জাগরণের অগ্রদূতরূপে। ইউরোপ আমাদের যেখানে যেখানে আঘাত করিতে লাগিল সেই আঘাতের বেদনা আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম আমাদের ধর্মের চিন্তা ও আচরণে—আমাদের সামাজিক আচার-বিচার প্রথা-পদ্ধতিতে। এই ক্ষেত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অবহিত হইয়া উঠিলাম

এই কারণে যে আমরা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারিতে-ছিলাম আমাদের দুর্বলতা।

আমরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া সহসা যেন নিজেদের খোলসের বাহিরে চলিয়া আসিলাম, এবং আসিয়া দেখিলাম, বিজ্ঞান দুনিয়ার রূপটাও বদলাইয়া তুলিয়াছে—মানুষের চিন্তার ভোলও প্রায় বদলাইয়া দিয়াছে,—আর দর্শনও তাহার 'স্বতঃসিদ্ধ সত্যে'র বিশ্বাস ছাড়িয়া আপ্তবাণীর মোহ ছাড়িয়া নির্মল বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আমরা ধর্মের নামে কতগুলি চিরাচরিত সংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস—কতগুলি ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা-অর্চা, উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-পদ্ধতির মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকি কি করিয়া? খ্রীষ্টান মিশনারীগণ আমাদের পৌরাণিক বিশ্বাসের হাস্যকর অযৌক্তিক দিক্‌গুলিকে যখন খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া চোখের সামনে ধরিতে লাগিলেন তখন বোঝা গেল, শুধুমাত্র যুক্তি-তর্কের দ্বারা এইগুলিকে সমর্থন করিয়া জাতির মধ্যে ইহাদের প্রভাবকেই স্থায়ী করিবার চেষ্টা জাতির পক্ষে কল্যাণের হইবে না। রাজা রামমোহন তাই তখন পৌত্তলিকধর্মের বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বেদান্তধর্মকে, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে জাতির সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। রামমোহন রায় জানিতেন, বাঙলাদেশ উপনিষদের দেশ নয়—বেদান্তবাদের দেশ নয়—বাঙলাদেশ তন্ত্রের দেশ—বহু শতাব্দী ধরিয়া তন্ত্র-চিন্তা বাঙালীর ধর্মীয় মনোবৃত্তি-গুলিকে এক বিশেষ ধাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে; রামমোহন তাই তাঁহার ব্রহ্মবাদকে স্থাপনের জন্য উপনিষদকে অবলম্বন করিলেন—ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রহ্ম-সূত্রের বাঙলা-ভাষ্যের অবতারণা করিলেন,—আবার এই সকলকে বাঙালীর ধাতস্থ করিয়া তুলিবার জন্য তন্ত্রকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। এই

ব্রহ্মবাদের সহিত রামমোহন যুক্ত করিয়া দিলেন নূতন পৃথিবীর মানবতা-বাদ, ধর্মসংস্কারের প্রায় অঙ্গীভূতভাবেই তাই দেখা দিল সমাজ-সংস্কার! সতীদাহকে রামমোহন রায় এই সামাজিক কুসংস্কার এবং কুব্যবস্থার একটা প্রতীকভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী তৎকালীন সমাজের সংস্কারকে কতখানি বড় করিয়া দেখিয়া-ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন তাহারই প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। সমাজ-জীবনকে মানবতানিষ্ঠ এবং যুক্তিনিষ্ঠ উভয়ই করিতে হইবে; ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই উভয় নিষ্ঠাই সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে আত্ম-প্রসারণের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমরা বাহির হইতে ভাল কোনও জিনিস গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করি নাই—ইহাই তৎকালীন জাতির চিন্তানায়ক এবং কর্মনায়কগণের পরম শুভ বুদ্ধি। তাই ইউরোপীয় মিশনারীগণ যখন আমাদের বাঙলা গদ্যভাষা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, আমরা আত্মাভিমানমূঢ় হইয়া তাহাকে বাধা না দিয়া পূর্ণ সহযোগিতাই করিলাম। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের চিত্তের প্রসার ঘটাইবে বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজেরাই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগাইয়া গিয়াছিলাম; ইংরেজী সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনকে একদিন আমরা দুই হাতে মাথায় তুলিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করি নাই। এই সকলের ভিতর দিয়া আমরা নিজেদের প্রাণশক্তিরই পরিচয় দিয়াছি, এবং যতখানি প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছি ততখানিই আমরা জাতি-হিসাবে লাভবান্ হইয়াছি ও হইতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিশেষ উপাদান যুক্ত হইতে দেখি—তাহা হইল আমাদের জাতীয়তা-বোধ। মানুষের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ গড়িয়া ওঠে

একটা বৃহৎ মানব-সমাজের মধ্যে কতগুলি গভীর ঐক্যবোধের ভিতর দিয়া। আমাদের ভিতরে যে রাষ্ট্রবন্ধনের ভিতর দিয়া এক রকমের একটা ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠিতেছিল—তাহার ভিতর দিয়াই যেন আমরা সচেতন হইয়া উঠিতেছিলাম—আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে কি অনৈক্য। তাই আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের দুইটি দিক দেখা দিল—এক দিকে দেখা দিল রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা—একটা প্রবল স্বাধীনতা-স্পৃহা; রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যে আমরা আমাদের জাতীয়তাবোধের এই দিকটিকেই বড় করিয়া দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধের যে আর একটি সংগঠনের দিক রহিয়াছে—সর্ববিধ ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়া জাতিকে সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ ও উন্নত করিয়া তুলিবার ধ্যানদৃষ্টি—তাহা গভীর ভাবে দেখা দিয়াছিল জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে এই ঐক্যবোধ এবং সমন্বয়-বোধ। নবীনচন্দ্র সেনের সকল ভাবোচ্ছ্বাসের পিছনেও এই জাতিগঠনের তাগিদ এবং সেই জাতিগঠনের জন্য ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। (নবীনচন্দ্রবর্ণিত নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের 'মহাভারতে'র পরিকল্পনার মধ্যেই ব্যক্ত এই জাতীয়তার পরিকল্পনা।)

সর্বাতিশয়ী মানবতাবোধের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সকল দেবতাই বাঙালীর জীবনে পরিপূর্ণ মানবতার মহিমোজ্জ্বল মূর্তিতে দেখা দিতে লাগিলেন,—বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইহা প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন সূচিত করিয়াছিল; শুধু একটা দৃষ্টির পরিবর্তনই নয়—সেই দৃষ্টির পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মানুষের মূল্যবোধের একটা বিরাট পরিবর্তন। এই নূতন দৃষ্টিকে চিন্তাশীল বাঙালী সকলেই যে সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। উনবিংশ শতাব্দীর

বুদ্ধিবাদের যুগ বলিয়া অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আবার রাতারাতি আমাদের ধসলাগা পুরাতন ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচরণকেই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই 'সনাতনী' বিরোধিতা এক সময়ে বেশ তীব্ররূপে এবং সংগঠিতরূপেই দেখা দিয়াছিল।

আসলে মনে হয় জাতি একটা গভীরতর সমন্বয় চাহিতেছিল,—নূতন ভাবধারা যেন বাঙলার জলমাটির সঙ্গে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সহজভাবে বর্ধিত হইতেছিল না। এই প্রার্থিত সমন্বয়ই দেখা দিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া। একজন আমাদের অনেক দিনের বোধি—তাহার পদমূলে দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রখরতম বুদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর সংশয় তর্ক অবিশ্বাস লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল বুদ্ধি—তাহাকে গরমিলের আবরণে ছাঁদিয়া রাখিবার অসার সান্ত্বনার মধুবাক্যে ঢাকিয়া রাখিবার কাহারও সাধ্য ছিল না; অতি পরিচ্ছন্ন এবং তীক্ষ্ণ তাহার প্রশ্ন—অদম্য তাহার জিজ্ঞাসা। মীমাংসা মিলিয়া গেল বোধিমূলে—প্রত্যক্ষানুভূতির আনন্দ-নিঃসংশতায়। বুদ্ধি সংগ্রহ করিল অফুরন্ত প্রেরণা—সে প্রেরণা সাড়া তুলিল শুধু বাঙালীর মনের মধ্যে নয়—বাহিরের দুনিয়ায়ও।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটা জিনিস অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হয়—তিনিও প্রচার করিলেন বেদান্তের বাণী—কিন্তু তাহার অবলম্বন দক্ষিণেশ্বরের কালী। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্তের বাণীই বজ্রগম্ভীর স্বরে নূতন করিয়া প্রচার করিলেন দেশ ও বিদেশে—কিন্তু পটভূমিকায় রহিলেন একটি কালী-সাধক ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। এই অদ্ভুত যোগ বাঙালীর মানসিক সংগঠনের দিক হইতে প্রয়োজন ছিল। 'বাঙালীর মত কেহ মা বলিয়া ডাকিতে পারে নাই'—এ কথাটা নিতান্তই উচ্ছ্বাসের কথা নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা একটা

আশ্চর্য ঐতিহাসিক সত্য। বাঙালীর সমাজ-জীবনের মধ্যেই এমন কিছু রহিয়াছে যাহাতে 'মা'কেই সে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রে সর্ব-প্রধান করিয়া পাইয়াছে; তাই বাঙালী দেবতাকে বহুদিন হইতে 'মা' করিয়া লইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণও আশ্চর্যভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সেই বুদ্ধিগ্রাহ্য বেদান্তধর্মকে বাঙালীর চিরপরিচিতা 'মা'য়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। সেই 'মাতৃ-বোধ' আবার অপূর্ব পরিণতি লাভ করিল 'মানুষ'বোধের মধ্যে—মায়ের ভিতর দিয়াই মানুষ! এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—সিংহবিক্রমে ডাকিয়া বলিলেন,—বেদান্তের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হও—আর ধর্মে প্রতিষ্ঠা অর্থ জীবনে প্রতিষ্ঠা—নিজের জীবনে উঠিয়া জাগিয়া বরণীয় লাভ করিয়া বৃহৎ হইয়া ওঠো। এই জীবন-গত বেদান্ত মানুষকে কি শিক্ষা দিবে?—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' সেই জীবন-নিষ্ঠা—সেই জীবে ব্রহ্মবোধ—ইহাই বাঙালীর জীবনকে ধারণ করিয়া রাখুক—তাহার চিত্তপ্রবণতাকে নিত্য মঙ্গলের পথে প্রচোদিত করুক।